ফ্যাক্টস্ এন্ড ডকুমেন্টস্

# বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

ফ্যাক্টস্ এন্ড ডকুমেন্টস্

'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ইতিহাসের বরপুত্র। ইতিহাস তাঁকে সৃষ্টি করেছে, তিনিও সময়ের অনিবার্যতায় ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে, নির্দেশে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের।

বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে শাণিত করা ধর্মনিরপেক্ষতা ও শোষণমুক্তির অঙ্গীকারে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। সে লক্ষ্যে দুঃখী, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তিনি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই পদক্ষেপকে তিনি অভিহিত করেছিলেন 'দ্বিতীয় বিপ্লব'। দ্বিতীয় বিপ্লবের বৈপ্লবিক কর্মসূচি নস্যাতে দেশি-বিদেশি শোষকগোষ্ঠী প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বাধীনতাবিরোধী চক্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে দেশকে পুনরায় দেশে পাকিস্তানী ভাবধারা ও ব্যবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ফলে দেশে আজ গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্র, শোষণমুক্তির পরিবর্তে লুটেরাতন্ত্র, দুর্নীতি এবং দুর্বৃত্তায়ন ও জঙ্গীবাদ জাতীয় জীবনকে বিপর্যস্ত, এমনকি বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার ঘৃণ্য ব্লু-প্রিন্ট নিয়ে উক্ত চক্র অপ্রতিহতভাবে অগ্রসর হচ্ছে। বইটিতে সেই বৈরী সময়ের চিত্র যেমন পাওয়া যাবে তেমনি দেশে বিরাজমান অবস্থায় করণীয় কী হতে পারে তা পাঠকদের পথ-বিকল্পের অন্বেষায় উজ্জীবিত করবে।

প্রচ্ছদ • ধ্রুব এষ
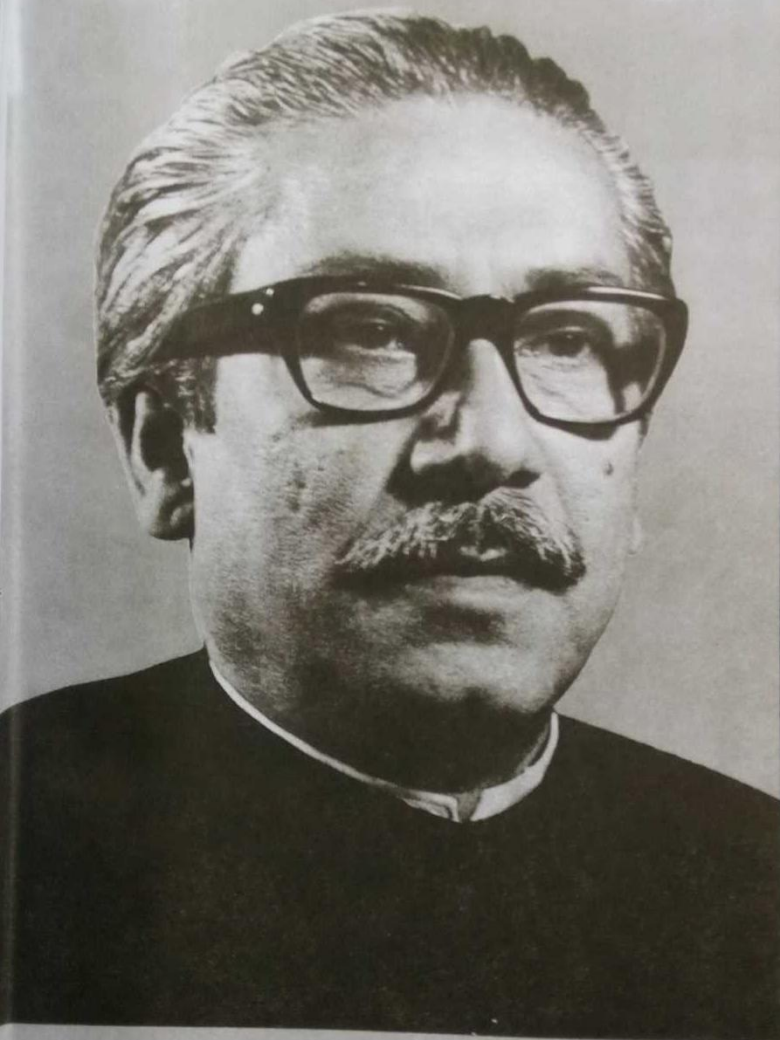
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জন্ম: ১৭ মার্চ, ১৯২০
শাহাদৎবরণ : ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫

# প্রসঙ্গ কথা

১. সমকালীন ইতিহাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। তাঁর হত্যাকাণ্ডের ক্যানভাসও বহু বিস্তৃত, বিচিত্র চক্রান্তের জটিলতায় আচ্ছন্ন। সেই চক্রান্ত প্রকাশ্যত : আগরতলা মামলার শুরু থেকে। ষড়যন্ত্রের চেহারা জাতিক, আন্তর্জাতিক, স্বদেশ সীমার বাইরে। চিত্র কখনও কুটিল, ঋজু ও নিমগ্ন নিষ্ঠুরতায় বিদীর্ণ।

২. বইটির নাম থেকেই প্রতীয়মান হবে এটি সেই জটিল ও কুটিল ষড়যন্ত্রের ও চক্রান্তের আপাতঃ অন্ধকারকে ছুঁড়ে দেবার প্রয়াস—সত্য সূর্য উদ্‌ঘাটন করার সাহসী পদচারণা। ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন দিককে কৌণিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করার বিনীত প্রয়াস বিধৃত। ঘটনা ও তথ্য কখনও কখনও বিচ্ছিন্ন মনে হলেও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

৩. ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্টের পর হতে অহর্নিশ যন্ত্রণার দহনে দগ্ধ এবং অস্থির অনুসন্ধিৎসায় প্রাপ্ত রেফারেন্স, ডকুমেন্টস্, নোট ও সাক্ষাৎকারে সংগৃহীত ফ্যাক্টস্ ও তথ্য গবেষণায় প্রায় এক দশক উৎকণ্ঠিত অতিক্রমণের ফলশ্রুতিতে বর্তমান বইয়ের কলেবর। সংগ্রহ আরো স্ফীত—যা মুদ্রণ সাধ্যাতীত।

৪. বঙ্গবন্ধু সংগ্রামী জীবনের ঋদ্ধ অভিজ্ঞতায় এবং রক্তাক্ত উপলব্ধিতে যখন কার্যিক অর্থেই কৃষক-শ্রমিক, দুঃখী শোষিত শ্রেণীর পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিলেন তখনই তাঁকে হত্যা করা হলো। পেন্টাগণের হ্যারল্ড সন্ডার্স, সি. আই এর জর্জ গ্রিফিন ও ফিলিপ চেরির সংগে যুক্ত সামরিক বাহিনীর একাংশ, সি. আই. এর ট্রেনিং প্রাপ্ত জাদরেল অফিসার, কূটনৈতিক, বিশ্বাসঘাতক রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বিভ্রান্ত বাম হঠকারী শক্তির বিচ্ছিন্ন ও সম্মিলিত চক্রান্তে ও ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন।

৫. পুস্তকটির ভিত্তি যেহেতু তথ্য ভিত্তিক, বিধায় তথ্যগত ভুল থাকা বিচিত্র নয়—সহৃদয় পাঠক বা বইয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তথ্য বা ঘটনা সম্পর্কিত ভুল সত্যতা ও যুক্তির যাচাইয়ে ও প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণ হলে সংশোধনের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি থাকলো।

৬. দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই কারো প্রতি অনুরুক্তি বা বিদ্বিষ্টি হয়ে বইটি লিখিনি। মতাদর্শের ঊর্ধ্বে থেকে সত্য-নিষ্ঠায় দৃঢ় থাকতে চেয়েছি। ঘটনার সংশ্লিষ্টতায় ব্যক্তি-নির্লিপ্ততার অঙ্গীকার ঘোষণা করছি।

৭. বইটির প্রথম সংস্করণের আকর্ষিক ব্যাপকতা ও দ্রুত নিঃশেষণ অবাক করা গর্ব! তদানিন্তন ডি এফ আই চিফ ব্রিগেডিয়ার (অব.) রউফের কথকতা, ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল (অব.) শাফায়াত জামিলের উদ্ধৃত কিছু তথ্য বঙ্গবন্ধু হত্যা-অনুসন্ধানে নতুন মাত্রা নির্দেশক। একই সাথে এ্যান্থনী মাসকারেনহাসের কিছু ভুল, কিছু উদ্দেশ্য

প্রণোদিত এবং কিছু সত্যনিষ্ঠতা আঙ্গিকতার নতুন অধ্যায় ও প্রসঙ্গ : যা পাঠকের দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতার অনিবার্যতায় নিয়ে যাবে। পুরো একাদশ অধ্যায় নবতর সংযোজন। তদানীন্তন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) কে, এম, সফিউল্লাহর সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু হত্যা-চক্রান্তে তদানীন্তন ডেপুটি সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানের জড়িত থাকার কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখিত।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল (অব.) কে. এম. সফিউল্লাহ ও তদানীন্তন ঢাকা বিগ্রেড কমান্ডার কর্নেল (অব.) শাফায়েত জামিলের সাক্ষাৎকার বিতর্ক সংযোজিত হয়েছে।

৮. এ সংস্করণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের বিচার ও বিচারের রায় কার্যকর সংক্রান্ত চক্রান্তের নবতর আর্বত বইটিকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছে। এ ছাড়াও বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি. আই.-এ সম্পর্কিত ছিলো এ সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক লরেন্স লিফশুলজ একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন– যা বইটিকে আরো তথ্যনিষ্ট করেছে।

৯. পুস্তকটির রচনায় বহুজন তথ্যাদি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ করে লন্ডন প্রবাসী জনাব আব্দুল মতিন, ডা. এস. এ. মালেক, শেখ সেলিম, কর্নেল (অব.) শওকত আলি, কর্নেল (অব.) শাফায়েত জামিল, ক্যাপ্টেন (অব.) জাহাঙ্গীর ওসমান, ক্যাপ্টেন (অব.) আমির খসরু প্রমুখের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইটির বর্ধিত ও পরিমার্জিত মুদ্রণে ও নন্দিত সৌকর্যের জন্য চারুলিপি প্রকাশন-এর সত্ত্বাধীকারী হুমায়ূন কবীরকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

ফেব্রুয়ারি ২০০৮

## সূচিপত্র

পরিশিষ্ট :

## প্রথম অধ্যায়

### এ ই  দে শে তে  জ ন্ম  আ মা র ...

১. নিপীড়িত। শোষিত। হাজার হাজার গ্রাম।।
নীরব। নিস্তব্ধ।।
মানুষের কণ্ঠ রোধ করে দেয়া হয়েছে।
তীক্ষ্ণ সঙ্গীন। রাইফেল। সবুট সন্ত্রাস।।
শুধু মাত্র সিপাহসালার আইয়ুবের দম্ভোক্তি।
অস্ত্রের আঘাতে অধিকার আন্দোলন স্তব্ধ করা হবে।
বাঙালির অধিকার, বাঁচার অধিকার।
ছ' দফা। ছ'দফার বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ।
সশস্ত্র সামরিক জান্তা আর
নিরস্ত্র জনতার যুদ্ধ। অস্ত্রের ভাষা আর আপোষহীন বজ্রকণ্ঠ।
একদিকে শেখ মুজিব।
অন্যদিকে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব।
একদিকে অস্ত্র। হুমকি। রক্তচক্ষু। সন্ত্রাস। ক্ষমতার দম্ভ। দাপট।
অন্যদিকে আদর্শ। লড়াই। আপোষহীন লড়াকু জংগী ঐক্য।
রাজপথ উত্তাল। বজ্রমুষ্টি। মিছিল।
মুজিবের কণ্ঠে বাঙালি জাতিসত্তার জয়ধ্বনি।

* * *

মহানায়ক মুজিব গ্রেফতার।
এক ডজন মামলা। অত্যাচার। নিপীড়ন।
জনতা পিছু হটে। আইয়ুব-মোনায়েম আন্দোলনের ভাঁটা দেখে উল্লসিত।
মুজিবকে শেষ করে দাও
এইতো সময়!
গভর্নর মোনায়েম খানের গর্জন মুজিবকে ফাঁসিতে লট্‌কাবো।

* * *

১.১ চারদিকে এমনি এক আপাত: অসহায় অবস্থার অন্ধকার। শেষ সূর্যের

দিনলিপির অন্তিম প্রার্থনা রাত্রির অন্ধকারে তলিয়ে আছে। সগর্জন জলপাই রঙের মিলিটারি ভ্যান ধীরে এসে দাঁড়ালো ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের সামনে। সঙ্গীন উঁচিয়ে সৈন্যরা নেমে আসে জেল গেটের সামনে। সারিবদ্ধ। প্রস্তুত।
নিরাপত্তা আইনে বন্দি এক. নিঃসঙ্গ।
নিঃসঙ্গতা এক পলকহীন প্রহরীর মতো লোহার গারদে লেপটে আছে।
দিন যায়। রাত আসে। মাস। বছর। এমনি
করে দুটো বছর চলে গেল।
জেলার এল। অপ্রত্যাশিত।
বলল বন্দি এই তোমার মুক্তি পরোয়ানা।
বন্দি দেখল। ভাবল—
এত রাতে মুক্তির আদেশ! বন্দির চোখে
অবিশ্বাসের কালো ছায়া!
মুক্তিপত্র হাতে জেল গেটে এসে দাঁড়ালেন—
বিশাল বাংলার দীপ্যমান শ্যামল চেহারার শরীর
ও আত্মার মানুষটি!
সঙ্গীনধারী সৈন্যরা এসে চারপাশ তাঁর ঘিরে দাঁড়ায়।
অন্ধকার রাত। চারিদিকে শুধু ঝকঝকে
সঙ্গীদের ঝিলিক। রাত জাগা ভয়ার্ত পাখির আর্তনাদ!
তুমি আবার বন্দি হলে। চল আমাদের সাথে।
কেন? কোথায়? কতদূরে নিয়ে যাবে?
কোন্ লৌহ প্রাচীরের অন্তরালে?
—জবাব মেলে না।
জলপাই রংয়ের গাড়ির সামনে জেল গেটের পথের মাঝে বন্দির ছোট্ট অনুরোধ—
এক মুহূর্ত সময় দাও আমায়।
তারপর কারাগারের সামনে এক মুঠি ধূলি তুলে কপালে স্পর্শ করে দুইহাত বাড়িয়ে দেয় বন্দি–মুজিব—
দেশ। জনতা। বিধাতার উদ্দেশ্যে—
'এই দেশেতে জন্ম আমার
যেন এই দেশেতেই মরি।'
কারাগারের ফটক সশব্দ কান্নায় বন্ধ হলো।
মিলিটারি ভ্যান ছুটে চলে। কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট।
যবনিকা উঠল।

মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্র। ওকে ফাঁসি দাও। গুলি করো।
চক্রান্তের বাইরের রূপ আগরতলা মামলা।[১]
উদ্দেশ্য মুজিব–হত্যা।
সেই থেকে আমরণ তাঁর সামনে, পেছনে, এপাশে ওপাশে একটি বুলেট, এক ঝাঁক বুলেট মৃত্যুর ছায়া হয়ে তাড়া করে ফিরেছে বার বার।

*   *   *

১.২ বাঙালি ভাবল : একি জঘন্য ষড়যন্ত্র!
বাঙালি দেখল : একি দুঃশাসন!
বাঙালি বুঝল : শেখ মুজিব মানে বাঙালির অধিকার। বাংলার স্বাধীনতা। বাংলার মুক্তি। বাঙালির স্বপ্নে, চেতনায়, আঘাতে সংগ্রাম। আন্দোলনে রক্ত বহ্নিতে শেখ মুজিব আর বাঙালি–বাংলাদেশ এক অবিভাজ্য অভিন্ন।
মুজিব মানেই বাংলাদেশ
অত্যাচারিত মুজিব আর তার দুঃখিনী বাংলা!
দেখে শুনে বুঝে বাঙালি গর্জে উঠল—
দুঃশাসন হটাও।
ছাত্র এল। এল শিক্ষক। জনতা।
চাষি। মজুর মুটে সবাই এল—নেমে এল
রাজপথ। হটাও আইয়ুব শাহী।
কবর খোঁড়ো মোনায়েম খাঁর।
ঘেরাও করো লাট ভবন। সেনা ছাউনি।
ছিনিয়ে আনো মুজিবকে।
সকল রাজবন্দিদের।
আইয়ুবের বড় সাধ ছিল—
মোনায়েমের প্রতিজ্ঞা ছিল—
মুজিবকে ফাঁসিতে, গুলিতে হত্যা করার।
তাদের সাধ আর প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ রইল।
সংগ্রামী জনতা ছিনিয়ে আনলো মুজিবকে।
রক্ত দিয়ে। প্রাণ দিয়ে। বড্ড বেশি ভালোবাসা দিয়ে।
আগরতলা মামলা প্রত্যাহৃত হলো।
মুজিব বেরিয়ে এলেন স্বাপ্নিক সূর্যের প্রখরতা আর প্রগাঢ়তা নিয়ে।
আইয়ুবের বিদায় ঘন্টা বেজে উঠলো!
মুজিব হত্যার প্রথম পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো।

*   *   *

২. শুরু হয় মুজিব হত্যার দ্বিতীয় পর্যায়।

সে ৫ ঞ্চ গভীর চক্রান্তের নাটকীয় ইতিহাস——

নতুন ভাবে। নতুন কৌশলে। ঘটনার আবরণে—ঘনঘটার নেপথ্যে। উনসত্তুরের প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থানে জেনারেল আইয়ুব বিদায় নিল। এল জেনারেল ইয়াহিয়া।

সামরিক শাসন জারী হলো। ২৬শে মার্চ ১৯৬৯। জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রদত্ত ভাষণের মূল কথা হলো–শাসনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা ও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা।[২]

২.১ সেই উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সনের ১লা জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির বাঁচার দাবী ছয় দফা নিয়ে সারা বাংলার এক প্রান্তর থেকে অন্য প্রান্তরে দুর্বার বেগে ছুটে চলেছেন। গ্রাম থেকে শহরে। গঞ্জে। নগরে। বন্দরে।

২.২ এমনি এক দিন...

১৯৭০ সাল। ২৬শে মার্চ। বঙ্গবন্ধু যাচ্ছেন মফঃস্বলে এক নির্বাচনী সমাবেশে বক্তৃতা করতে। গাড়ি চলছে খট খট আওয়াজ তুলে। গাড়ির পেছনের সিটে এক অবাঙালি সাংবাদিক উপবিষ্ট। তিনি করাচীর একটি পত্রিকার ঢাকাস্থ নির্বাচনী রিপোর্টার। চলতি কিছু ঘটনার কথা উত্থাপন করে তিনি শেখ মুজিবকে উস্কে দিলেন এবং সংগোপনে নিজের ক্যাসেট রেকর্ডারের বোতাম টিপে নিলেন। সে টেপকৃত বাণীর মধ্যে মূল কথা ছিল, এখানে আমি যা চাইবো তাতে কেউ 'না' বলতে পারবে না। এমন কি ইয়াহিয়া খানও আমার দাবীকে উপেক্ষা করতে পারবেন না।[৩]

২.৩ ১৯৭০ সালের ৩০শে মার্চ ইয়াহিয়া খান আইনগত কাঠামো আদেশ (এল. এফ. ও) ঘোষণা করেন।[৪] ঐ আইনগত কাঠামোর আদেশে ভাবী শাসনতন্ত্রের মূল নীতিগুলো কি হতে হবে তা নির্দেশ করে দেয়া হয়েছে। ইসলাম, জাতীয় সংহতি, জাতীয় স্বার্থ, অখণ্ডতা ইত্যাদির পাকাপোক্ত ব্যবস্থা রাখার সুস্পষ্ট বিধান এতে সন্নিবেশিত ছিল। শুধু তাই নয়, এল.এফ.ও-র ২৫ এবং ২৭ ধারায় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ যাই গ্রহণ করুক না কেন—তা প্রেসিডেন্ট ভেটো দিয়ে বাতিল করে দেবার অধিকারী ছিলেন। ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হলে জাতীয় পরিষদকে বাতিল করে দেয়া হবে। এল. এফ. ও–র মূল কথা ছিল, পাকিস্তানে ২৩ বছর ধরে চলে আসা অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রাখার; অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজি, সামরিক–

বেসামরিক আমলাচক্র তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার অস্ত্র।

২.৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন।[৫]

তিনি বাঙালিকে এসব চক্রান্তের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। এ সম্পর্কে সিদ্দিক সালিক বলেন–শেখ মুজিবের দাবীগুলো কি ছিল? ইয়াহিয়া খানের গোয়েন্দা বাহিনীর সংগৃহীত আরেকটি টেপ থেকে সূত্রটি পাওয়া যায়। বিষয়টি 'লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক' সম্পর্কিত। এটা ছিল শাসনতন্ত্রের বহিরঙ্গ চিত্র। এই আদেশ বিখ্যাত ছয় দফা বাস্তবায়নের ব্যাপারে মুজিবের হাত বেঁধে ফেলল। এল. এফ. ওর উপর তিনি তার মতামত একান্ত নির্ভরতার সাথে বলেছিলেন তাঁর সিনিয়র সহকর্মীদের কাছে। তিনি আঁচ করতে পারেননি যে, তার কথাগুলো ইয়াহিয়া খানের জন্য টেপ হয়ে যাচ্ছে। রেকর্ডকৃত টেপে মুজিব বলেন—

আমার লক্ষ্য বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঐ এল. এফ. ও টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর আমাকে চ্যালেঞ্জ করবে কে?[৬] যখন এই টেপ ইয়াহিয়া খানকে শোনানো হলো, তিনি বললেন : যদি মুজিব বিশ্বাসঘাতকতা করে তা হলে আমিও তাকে দেখে নেবো।[৭]

২.৫ এখানে স্বভাবতই দুটি প্রশ্ন থেকে যায়—

এক. বঙ্গবন্ধুর সিনিয়র সহযোগীদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে ছিলেন, যিনি পাক গোয়েন্দা বাহিনীর এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন এবং বঙ্গবন্ধুর গোপন কথা—পরামর্শ টেপ করে পাচার করেছিলেন?

অন্য প্রশ্নটি হলো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এহেন উদ্দেশ্য জ্ঞাত হবার পরেও জেনারেল ইয়াহিয়া খান নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্মত ছিলেন কেন?

২.৬ এর পেছনে ষড়যন্ত্রমূলক কৌশল কাজ করেছিল। ঐ সময়ে যে চক্রটি পাকিস্তানের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত নিতেন তাদের ভেতরে ছিলেন– জেনারেল ইয়াহিয়া খান, চিফ অব আর্মি স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান, প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল স্টাফ জেনারেল পীরজাদা, চিফ অব দি জেনারেল স্টাফ লে. জেনারেল গুল হাসান, ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি কমিটির প্রধান মেজর জেনারেল উমর, ইন্টার সার্ভিস ইনটেলিজেন্সের ডিরেক্টর জেনারেল আকবর খান এবং বেসামরিক দুইজন হলেন সিভিল ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর রিজভী ও প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, আমলা এম, এম, আহমদ। এ ছাড়াও লে. জেনারেল আতিকুর রহমান, লে. জেনারেল রাখমান গুল, এয়ার মার্শাল রহীম খান, ভাইস এ্যাডমিরাল মুজাফফর হাসান প্রমুখ ছিলেন আরেক চক্রে।[৮]

সামরিক বেসামরিক এই আমলা চক্র বুঝেছিল পুরনো কায়দায় ক্ষমতা

আপাতত কুক্ষিগত রাখা যাচ্ছে না। সামরিক বাহিনীর এ সব জঙ্গী জেনারেলদের মাথায় এও ঢোকানো হয় যে, নির্বাচন দিলে কেউ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। বিভিন্ন দল বিভিন্ন মত নিয়ে আসবে, ১২০ দিনে শাসনতন্ত্র তৈরি হবে না। অতএব আসল ক্ষমতা করায়ত্ত থাকবে এ সব চক্রের হাতেই।

২.৭ এর সঙ্গে তারা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সামরিক-বেসামরিক গোয়েন্দা বাহিনী প্রদত্ত সম্ভাব্য নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে রিপোর্ট বিবেচনা করেছিলেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও সামরিক জান্তার একটা বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে, দেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে কোনো রাজনৈতিক দল বা গ্রুপই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না।[৯]

সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর গোড়ার দিকের রিপোর্ট ছিল যে, আওয়ামী লীগ ২০টি, কাইয়ুম মুসলিম লীগ ৭০টি, দৌলতানা ৪০টি, ভুট্টো ২০টি, এবং ওয়ালী খানের ন্যাপ ৩৫টি আসন পাবে।[১০]

১৯৭০ সালের অক্টোবরের গোড়ার দিকে ইয়াহিয়া সরকারের বেসামরিক গোয়েন্দাগিরির দায়িত্বে নিয়োজিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী সরদার আব্দুর রব নিশতার ভেবেছিলেন যে, জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্দিষ্ট আসনের ৬০% ভাগ পর্যন্ত পেতে পারে আওয়ামী লীগ।[১১]

নির্বাচনের মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীগণ নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে ধারণা করেছিলেন, আওয়ামী লীগ ৮০, কাইয়ুম মুসলিম লীগ ৭০, দৌলতানা ৪০, ওয়ালী খানের ন্যাপ ৩৫, ভুট্টোর পি.পি.পি. ২৫।[১২]

তদানীন্তন যোগাযোগ মন্ত্রী ও বেসামরিক শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা ড. জি, ডব্লিউ চৌধুরী ১৯৭০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর লন্ডনস্থ পাকিস্তান সোসাইটিতে প্রদত্ত ভাষণ ও প্রশ্নের উত্তর দান কালে বলেছিলেন ঃ পূর্ব পাকিস্তান থেকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আবির্ভাবের সম্ভাবনা নেই।[১৩]

২.৮ নির্বাচনের পূর্বে ইসলাম পছন্দ[১৪] দলগুলোর স্বপক্ষে পাকিস্তানী বেতার থেকে প্রচার করা হয়েছিল।[১৫]

শুধু তাই নয়, বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, সামরিক সরকার পূর্ব বাংলায় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়েছিল।[১৬]

২.৯ কিন্তু সামরিক জান্তার সর্বপ্রকার গণনা ও ধারণা এবং প্রদত্ত রিপোর্ট ভুল প্রমাণিত হলো। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সর্বমোট ৩১৩ সদস্য সংখ্যা বিশিষ্ট আসনে আওয়ামী লীগ এককভাবে ১৬৭টি আসন লাভে সমর্থ হয়।[১৭]

২.১০ আওয়ামী লীগের এই বিজয় ছিল ঐতিহাসিক। প্রদত্ত ভোটের ৭২.৫৭ ভাগ আওয়ামী লীগ লাভ করতে সক্ষম হয়।[১৮]

কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙালির এই বিজয়কে পাক শাসক চক্র কোনো সময়েই মেনে নিতে পারেনি। আওয়ামী লীগের এই ঐতিহাসিক বিজয়কে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে নির্বাচনী ফলাফলের উপর পর্যালোচনা করার জন্য ঐদিনই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে কয়েক দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[১৯]

১৯৭০ সনের ২৭শে নভেম্বর ঢাকার গভর্নর ভবনের সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে জেনারেল ইয়াহিয়া বলেন : যদি নির্বাচনের পর তারা (রাজনৈতিক দল) আইনগত কাঠামো আদেশকে অস্বীকার করে তাহলে আমি ধরে নেব যে তারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেনি। সামরিক আইন আছে এবং থাকবে।[২০]

এ সব থেকে বোঝা যায়, নির্বাচনের পূর্বেই জেনারেল ইয়াহিয়া ও সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রস্তুত ছিল না এবং নির্বাচনী ফলাফল দেখে তারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ক্ষমতা ছাড়া যাবে না।[২১]

নির্বাচনী ফলাফল দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা জেনারেলদের ইয়াহিয়া খান এই বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আওয়ামী লীগ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সমঝোতায় না আসলে ক্ষমতা হস্তান্তরতো নয়ই বরং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন যে কোনো অজুহাতে বন্ধ রাখবেন।[২২]

শুধু তাই নয়, "ছয় দফা বাংলার জনগণের। এই ম্যান্ডেট– এর সঙ্গে আপোষ নয়" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এই দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য ও মনোভাব সম্পর্কে তখন ঢাকায় অবস্থানরত জেনারেল ইয়াহিয়া খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন আমাদের উপর এ সব 'ব্লাক বাস্টারদের' শাসন করতে দেয়া হবে না।[২৩]

২.১১ সামরিক জান্তার এই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি রাজনৈতিক অঙ্গনেও চক্রান্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। চক্রান্ত ও ঘটনাসমূহ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায়। ইয়াহিয়া খান ও সামরিক চক্র চেয়েছিলেন শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে উৎখাত করতে ও এই লক্ষ্যে ভুট্টোকে দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব–সংঘর্ষ লাগিয়ে অধিবেশন স্থগিত ও সামরিক শাসন অব্যাহত রাখতে। আর ভুট্টো চেয়েছিলেন সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগসাজসে তার ক্ষমতা প্রাপ্তির পথকে প্রশস্ত করতে।

২.১২ এ সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানে তদানীন্তন দখলদার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী তার জবানবন্দিতে বলেছেন "আমি জানিনা যে, বেসামরিক সরকার গঠনের ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানের

চিন্তা-ভাবনা কি ছিল? তবে এটা সত্য যে, তার চার পার্শ্বে যে সব ক্ষমতালিপ্সু লোক জড়ো হয়েছিল, তারা এর বিরোধিতা করেছিল। তারা আশংকা করেছিল যে, এতে করে তাদের ইজারদারী খতম হয়ে যাবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে তারা মিঃ ভুট্টোকে ক্ষমতায় বসানোর পরিকল্পনা সফল করতে পারবে না। জেনারেল ইয়াকুবের অযোগ্যতা ও নিষ্ক্রিয়তায় উৎসাহিত হয়ে শেখ মুজিব সামরিক সরকারের বিকল্প একটি সরকার গঠন করে ফেলেন। এই কারণেই বাঙালিরা সেনাবাহিনীর মোকবিলা করার জন্য ময়দানে নেমে আসার সাহস পায়। এরপর জেনারেল টিক্কা খান তাঁর দুই জন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর পরামর্শে যে নিষ্ঠুর পন্থায় শক্তি প্রয়োগ করেন, তা বাঙালিদেরকে বহু দূরে ঠেলে দেয় এবং সেখান থেকে তাদের ফিরে আসা আর সম্ভবপর ছিল না। ফলে স্বভাবতই তারা পশ্চিম পাকিস্তানের শত্রু বনে যায়। এটা ছিল একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ফসল যারা এই ঘৃণ্য অপকর্মের হোতা,তারা ছিল ভুট্টোর সঙ্গে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত। এর একটি মৌখিক প্রমাণ এই যে, ক্ষমতা লাভের পর ভুট্টো এদেরকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করেন।"[২৪]

৩. জাতীয় পরিষদে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করায় পাক জেনারেলদের সঙ্গে আঁতাত করে ভুট্টো গোলমাল শুরু করেন। ১৯৭০ সনের ২০শে ডিসেম্বর তিনি ঘোষণা করেন যে, তার দলকে বাদ দিয়ে শাসনতন্ত্র রচনা ও কেন্দ্রে সরকার গঠন হতে পারে না। তিনি বলেন ক্ষমতায় যাবার জন্য তিনি আরো পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে রাজী নন। তিনি বলেন, ক্ষমতার ভাগ তাকে দিতেই হবে—কেননা পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ।[২৫]

পাকিস্তানের রাজনৈতিক গগনে ষড়যন্ত্রের এই ভয়াবহ অবস্থার প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অত্যন্ত ধীরস্থির, সৌম্য এবং বিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়কোচিত আচরণে ও বক্তব্যে বাঙালি জাতিকে আরো দৃঢ় সুসংগঠিত করার কাজে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহের সম্মিলিত এই সকল কূট ও ষড়যন্ত্রমূলক প্রয়াসকে তিনি দুঃসাহসিক সেনানায়কের মতো পরাভূত করে চললেন। বাঙালি জাতির মানস প্রস্তুতিকে স্বাধীনতার সর্বশেষ চেতনার স্তরে উন্নীত করার যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। সামরিক জান্তা ও ভুট্টোর এ সব কার্যকলাপ ও বক্তব্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করেন। শাসক গোষ্ঠীকে সাবধান করে দিয়ে তিনি বললেন, "রক্তচক্ষু দেখাইয়া বাঙালিকে স্তব্ধ করা যাবে না।"[২৬]

৩.১ ফৌজী চক্র ও ভুট্টো চক্র পরিবেশকে আরো উত্তপ্ত ও যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টির

উদ্দেশ্যে ৩০শে জানুয়ারি ভারতীয় বিমান সংস্থার একটি ফোকার ফ্রেন্ডশিপ বিমান ছিনতাই করে লাহোরে নামায়। ৩১শে জানুয়ারি ভুট্টো ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে ছিনতাইকারীদের অভিনন্দন জানান এবং ছিনতাইকারীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দানের দাবী জানান।[২৭]

ভারতের পুনঃ পুনঃ দাবী সত্ত্বেও ২রা ফেব্রুয়ারি ডিনামাইট দিয়ে বিমানটি উড়িয়ে দেয় তারা। ফলে ভারত ৩রা ফেব্রুয়ারি থেকে তার আকাশ সীমানার উপর দিয়ে পাকিস্তানী সামরিক ও বেসামরিক বিমান চলাচল বন্ধ করে দেয়।[২৮]

বিমান ছিনতাই-এর ঘটনার প্রেক্ষাপটে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৫ই ফেব্রুয়ারি বললেন দেশের পরিস্থিতি ভয়াবহ। এই অজুহাতে ব্যাপক হারে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ও অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশে অনা শুরু হয়।[২৯]

বঙ্গবন্ধু এই ঘটনাকে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টির অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানোর অপচেষ্টার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী করে দিয়ে বলেন, এই ঘটনাকে সরকার ও পি.পি.পি ক্ষমতা কুক্ষীগত রাখার গূঢ় চক্রান্ত সফল করার জন্য ব্যবহার করছে।[৩০]

৩.২ বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতির দৃঢ়তার মুখে ১৩ই ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে ৩রা মার্চ তারিখে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ভুট্টো পেশোয়ারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ভারতের শত্রুতা ও ছয়দফা না মানার ফলে ঢাকায় তাদের অবস্থা ডবল জিম্মির শামিল। সে জন্য তার দাবী ছয়দফা আপোষ করতে হবে।[৩১]

১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি বললেন, পরিষদ 'কসাই খানা' হবে।[৩২] ১৮ই ফেব্রুয়ারি তিনি বললেন, পাকিস্তানে তিনটি শক্তি-কেন্দ্র রয়েছে- আওয়ামী লীগ, পি.পি.পি ও সামরিক বাহিনী। এখন আওয়ামী লীগকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা কি একা যাবে, না অন্যদের সঙ্গে সমঝোতায় আসবে।[৩৩]

২১ ফেব্রুয়ারি জেনারেল ইয়াহিয়া খান বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির অজুহাতে তার বেসামরিক মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেন। প্রদেশসমূহের সামরিক গভর্নর ও জেনারেলদের সঙ্গে সভা করেন। এরপর হতেই সমগ্র প্রদেশকে সেনাবাহিনীর পুনঃ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩৪]

৩.৩ ১৬ই ফেব্রুয়ারি ভুট্টো করাচীতে প্রেসিডেন্ট ভবনে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভুট্টো দাবী করলেন, হয় পরিষদ অধিবেশন

পিছিয়ে দিতে হবে নয় ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময়সীমা তুলে নিতে হবে।[৩৫] তার দুইদিন পর লাহোরের জনসভায় ভুট্টো ঘোষণা করলেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের প্রতিবাদে তার দল খাইবারপাস থেকে করাচী পর্যন্ত হরতাল পালন করবে এবং তিনি হুমকি প্রদান করেন এই বলে যে তাঁর দলের কোনো সদস্য পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত থাকলে তাকে হত্যা করা হবে।[৩৬]

ভুট্টোর এই হুমকি সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৩৬ জন পরিষদ সদস্য অধিবেশনে যোগদানের জন্য টিকেট ক্রয় করেন।[৩৭]

শুধু তাই নয়, কাইয়ুম মুসলীম লীগের ও পি.পি.পির সদস্যগণ দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঢাকায় আসার জন্য প্রস্তুতি নেয়। পাকিস্তানের ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠবন্ধু মেঃ জেনারেল ওমর ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্যের অধিবেশনে যোগদান না করার জন্য চাপ প্রদান করতে থাকে।[৩৮]

৩.৪ ২৮শে ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার লে. জে. এস.জি. এম পীরজাদা পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আহসানকে টেলিফোনে বললেন ৩রা মার্চের আহুত পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। পীরজাদার ইচ্ছানুসারে সন্ধ্যা সাতটায় গভর্নর হাউসে ভাইস অ্যাডমিরাল এস. এম. আহসান শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্টের ইচ্ছার কথা অবহিত করালেন। আশ্চর্যের বিষয়, মুজিব কোনো উদ্বেগই প্রকাশ করলেন না বরং যুক্তি সহকারে বললেন মার্চ–এ অধিবেশন পুনঃ আহবান করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। এপ্রিল হলে বড্ড অসুবিধা হবে এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য পরিষদ স্থগিত হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। ঐ দিন সন্ধ্যায় শেখ মুজিবের প্রতিক্রিয়া রাওয়ালপিন্ডিতে জানানো হয় এবং বলা হয় এই ঘোষণায় যেন পার্লামেন্ট বসবার নতুন তারিখ থাকে। এর জবাবে রাওয়ালপিন্ডি ঠাণ্ডাভাবে শুধু বলে পাঠায় 'ইয়োর মেসেজ ফুললী আন্ডারস্টুড'। এক গভীর ষড়যন্ত্রের আবর্তে সেদিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আবর্তিত হয়েছিল তারই প্রমাণ—প্রেসিডেন্টের ১লা মার্চের ভাষণ।[৩৯]

সিদ্দিক সালিক লিখেছেন পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সম্পর্কে শেখ মুজিব পূর্বেই অবগত ছিলেন বলে তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রকাশের জন্য বেশ সময় পেয়েছিলেন। ঘোষণার আধা ঘণ্টার মধ্যে ক্রুদ্ধ জনতা বাঁশের লাঠি, লোহার রড এবং আপত্তিকর শ্লোগানে রাস্তায় নেমে আসে।

স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলার প্যান্ডেলে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়।[৪০]

৩.৫ শেখ মুজিব এ পরিস্থিতিতে হোটেল পূর্বানীতে আয়োজিত জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন 'উই ক্যান্ নট লেট ইট গো আনচ্যালেঞ্জড। তিনি ২রা মার্চ ঢাকায় পূর্ণ হরতাল এবং ৩রা মার্চ সারা বাংলাদেশে হরতাল আহ্বান করেন এবং সরকারকে চিন্তা করার জন্য তিন দিনের সময় প্রদান করে বঙ্গবন্ধু বলেন আগামী ৭ই মার্চে জনসভায় তিনি তাঁর পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করবেন।

এ প্রসঙ্গে সিদ্দিক সালিক লিখেছেন : জনগণের সামনে কঠিন মনোভাব দেখানোর পর শেখ মুজিব গভর্মেন্ট হাউসে এসে বললেন এখনো সময় আছে যদি অধিবেশন বসার নতুন তারিখ প্রদান করা হয় তবে জনগণের ক্রোধ প্রশমিত করা যাবে। তার পরে হলে 'ইট উইল বি টু লেট'। ঢাকায় মুখ্য সামরিক কর্মকর্তাগণ এ লক্ষ্যে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে শেষ রাতে জেনারেল পীরজাদা জেনারেল ইয়াকুবকে অ্যাডমিরাল আহসানের নিকট থেকে ক্ষমতা অধিগ্রহণের কথা ফোনে জানালেন।[৪১]

৩.৬ এরপর শেখ মুজিব ষড়যন্ত্র বিষয়ক কথিত ধারণায় বদ্ধমূল হলেন। এ প্রসঙ্গে আসগর খানের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একান্ত এক আলোচনায় তিনি বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি কিরূপ নেবে এবং অচলাবস্থার অবসান কিভাবে সম্ভব? উত্তরে শেখ মুজিব বলেছিলেন, পরিস্থিতি অত্যন্ত সহজ। ইয়াহিয়া খান প্রথম ঢাকা আসবেন, এম, এম আহমদ (প্লানিং কমিশনের প্রধান) তাকে অনুসরণ করবেন। ভুট্টো আসবেন তারপর। ইয়াহিয়া খান সামরিক অভিযানের আদেশ দেবেন এবং তারপরই পাকিস্তানের শেষ।[৪২]

বঙ্গবন্ধু চলতি খেলার সকল দরজা বন্ধ করে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন এবং 'সেট্ আউট্ আপন দ্য ওয়ার পাথ।'[৪৩]

৪. সামরিক সরকারকে উৎখাত করো—শুরু হলো অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন। সমগ্র বাঙালি জাতি শেখ মুজিবের ইঙ্গিতে, আদেশে এবং নির্দেশে উদ্বেলিত ও একতাবদ্ধ হলো। ২রা মার্চের রাতে কার্ফু জারী করা হলো। সেনাবাহিনীকে পথে নামানো হলো। সেনাবাহিনী ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষে ঐ রাতে ছয় ব্যক্তি নিহত হন।

৪.১ পরের দিন এই নিহত ব্যক্তিদের সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু অনলবর্ষী বক্তৃতা করেন এবং এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সকল স্তরের জনগণকে এবং সরকারি কর্মচারীদের 'অবৈধ সরকার'–এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার এবং

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একমাত্র বৈধ ক্ষমতার উৎস হিসেবে স্বীকৃতির আহবান জনান।[৪৪]

ঐ দিন এ রকম বিবৃতি মার্শাল ল হেডকোয়াটারে পৌঁছলে জেনারেল ইয়াকুব রাত সাড়ে এগারো হতে চল্লিশ মিনিট ধরে শেখ সাহেবকে উক্ত বিবৃতি তুলে নেয়া বা সুর নরম করার জন্য বহুভাবে অনুরোধ করেন, কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন। এ প্রেক্ষিতে জেনারেল ইয়াকুব মিনি ওয়ার কাউন্সিল ডাকলেন এবং প্রদেশের সর্বত্র সেনাবাহিনীকে সতর্ক রাখার নির্দেশ দিলেন।[৪৫]

৪.২ দেশের অবস্থা দ্রুত পরিবর্তনের দিকে এগুতে থাকে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা, যশোহর, সিলেট, রংপুর প্রত্যেক জায়গায় সেনাবাহিনীর সাথে জনতার সংঘর্ষ চলতে থাকে।

অবস্থা পরিদৃষ্টে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১০ তারিখে গোল টেবিল বৈঠক ডাকার কথা ঘোষণা করলে মুজিব তা প্রত্যাখান করে বললেন ঃ এটি একটি নিষ্ঠুর তামাশা।[৪৬]

৪.৩ ৩রা মার্চ বহু হতাহত হয়। মুজিব বললেন ঃ সেনাবাহিনী তুলে নিতে হবে। আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব আমার।

সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হলো। প্রকৃত প্রস্তাবে শেখ মুজিব দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন। আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রাজধানীর সর্বত্র চেকপোস্ট বসায় এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তুলে নেয়।

৪.৪ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ

রেসকোর্স ময়াদনে লাখো জনতার ভীড়।

মুজিব আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।

৬ই মার্চ রাত।

চিন্তামগ্ন মুজিব।

দেশ। জাতি। ভবিষ্যৎ।

টেলিফোন বেজে উঠল।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কথা বললেন।

অনুরোধ জানালেন হঠাৎ কিছু না করার।

বললেন ঃ আপনার আশা-আকাঙ্খা আর জনগণের প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকারকে পুরোপুরি সম্মান করা হবে—যা ছয় দফার চেয়ে বেশি।[৪৭]

৪.৫ ৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ২৫শে মার্চ অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেন।

৪.৬ ৭ই মার্চ সকালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

জি ডাব্লুউ চৌধুরী ফারল্যান্ড মুজিবের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বলেন, ফারল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের পলিসি তুলে ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদী (স্বাধীনতা) এই খেলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে শেখ মুজিবকে কোনো প্রকার সাহায্য না পাবার কথা পরিষ্কার করে বলেন।[৪৮]

৪.৭ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এদের কারো কথা শুনলেন না। বাঙালি জাতির স্বাধীনতার কথা তিনি ঘোষণা করলেন। সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের রূপরেখা তিনি ৭ই মার্চের ঐ জনসভায় ঘোষণা করলেন।

বললেন ঃ আমি হুকুম দিতে না পারলেও তোমরা যুদ্ধ করবে। আর গোলামী নয়—স্বাধীনতা। মুক্তির সংগ্রামে সবাই এগিয়ে আসো।[৪৯]

৪.৮ জেনারেল ইয়াকুবকে সরিয়ে টিক্কা খান এল, কিন্তু শপথ নিতে পারল না। হাইকোর্টের বিচারকগণ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। টিক্কা খান গভর্নর হতে পারল না।

৫. এমনি অবস্থায় ১৫ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন তিনি বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্ব নিচ্ছেন এবং বেসামরিক জনজীবন পরিচালনার জন্য ৩১টি নির্দেশ জারী করেন। তিনি সেনাবাহিনীর চলাচল প্রতিহত করার জন্য সংগ্রামী জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

৫.১ একই সাথে তিন প্রাক্তন সেনাবাহিনী, ছাত্র বিগ্রেড সংগঠিত করেন এবং কর্ণেল (অবঃ) ওসমানীকে ডিফ্যাক্টো কমান্ডার ইন চীফ নিযুক্ত করেন। মুজিবের নির্দেশে কর্নেল (অবঃ) ওসমানী পুলিশ, ইপিআর, ইস্টবেঙ্গল ব্যাটালিয়ানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে থাকেন।[৫০]

৬. ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসেন। মুজিব পূর্বেই এই 'অতিথিকে' বিড়ম্বনা হতে বাঁচানোর জন্য ফার্মগেটের চেক পয়েন্ট তুলে নেন। প্রকাশ্যে জনতার সামনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বাংলাদেশের একজন অতিথি হিসেবে তিনি স্বাগত জানান।

৬.১ ১৬ই তারিখে মুজিব ইয়াহিয়া একান্ত আলোচনা এবং ১৭ই মার্চ আনুষ্ঠানিক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা শুরু হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় জেনারেল টিক্কা খানকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বললেন ঃ মুজিব সঠিক আচরণ করছে না। তুমি তৈরি হও।[৫১]

শুরু হয়ে যায় সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি। মেজর জেনারেল ফরমান আলী ও মেজর জেনারেল খাদিম রাজা ১৮ই মার্চ 'অপারেশন সার্চ লাইট' চূড়ান্ত করে। ২০শে মার্চ জেনারেল হামিদ ও লেঃ জেঃ টিক্কা খান প্ল্যানটি অনুমোদন করে।[৫২]

৬.২ এদিকে মুজিব অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে প্রদেশগুলোতে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব পেশ করে। এমন অবস্থায় ভুট্টো এল ২১শে মার্চ। মুজিবের প্রস্তাব ভুট্টো প্রত্যাখ্যান

করলো। ২৪শে মার্চ বঙ্গবন্ধু নতুন প্রস্তাব পেশ করেন যা হলো শাসনতান্ত্রিকভাবে পাকিস্তানকে বিভক্ত করা।[৫৩]

৬.৩ ২৩শে মার্চ বাংলার স্বাধীনতার পতাকা ঢাকায় সর্বত্র শোভিত হলো। মুজিবের বাড়িতে, গাড়িতে পতাকা উড়ল। ভুট্টো-ইয়াহিয়া ২৪শে মার্চ বৈঠকে পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষায় আর্মি একশনের বিষয়ে একমত হলেন, কিন্তু মুখে বলতে থাকেন আলোচনা চলছে। তাজুদ্দিন বললেন ঃ আমাদের আর কিছু বলার নাই।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত 'মেহমানগণ' বিশেষ বিমান ব্যবস্থায় চলে যেতে থাকে।

৭. মেঃ জেনারেল ফরমান ও মেঃ জেনারেল খাদিম দুটি হেলিকপ্টারে ঢাকার বাইরে বিগ্রেড কমান্ডারদের নিকট এ্যাকশনের জন্য নির্দেশ পাঠাতে থাকেন।

৭.১ সন্ধ্যা সাতটায় রহস্যজনক ও প্রচণ্ড গোপনীয়তায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন—যা সাথে সাথে উইং কমান্ডার এ. কে. খন্দকার বঙ্গবন্ধুকে জানিয়ে দেন।

দিনের আলো নিভে এল।

শুরু হলো নিকষ কালো বিভীষিকাময় রাত।

৭.২ সন্ধ্যা সাতটায় ইয়াহিয়া খান পূর্ব নির্ধারিত ভাষণ না দিয়ে চলে যাবার সংবাদে শেখ মুজিব নেতাদের বললেন ঃ তোমরা আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যাও।

সিদ্ধান্ত নিলেন। ঘোষণা করলেন বাংলার স্বাধীনতা।

৭.৩ যখন প্রথম গুলির শব্দ হলো, তখন পাকিস্তান রেডিওর ওয়েভ লেন্থের পাশে শেখ মুজিবের ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এল—মনে হলো এটি পূর্ব রেকর্ড কৃত। শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রূপে ঘোষণা করেন।[৫৪]

৭.৪ ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু বললেন ঃ

"পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিত পিলখানার ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করছে। ঢাকা চট্টগ্রামের রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছে। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্ত বিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল

রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপোষ নাই, জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।'

৭.৫ লে. ক. জেড এ. খান এবং কোম্পানি কমান্ডার মেজর বেলাল পঞ্চাশ জন কমান্ডো সৈন্যকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে প্রবেশ করে। গোলাগুলির ভেতর বঙ্গবন্ধু বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'থামাও গুলি। কি চাও তোমরা?" তাঁকে গ্রেফতার করে সেকেন্ড ক্যাপিটালে (শেরেবাংলা নগর) নিয়ে যাওয়া হলো। পর দিন তাঁকে ফ্লাগ স্টাফ হাউসে রাখা হলো এবং তিন দিন পর ঐখান থেকে সরাসরি করাচী পাঠিয়ে দেয়া হলো।[৫৫]

৭.৬ ২৬শে মার্চ।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভাষণ দিলেন। বললেন, শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলন ছিল দেশদ্রোহিতামূলক। সে এবং তাঁর দল তিন সপ্তাহব্যাপী আইনানুগ কর্তৃপক্ষকে অস্বীকার করেছে। তারা পাকিস্তানী পতাকা ও জাতির পিতার ছবির অবমাননা করে এবং সমান্তরাল (বিকল্প) সরকার পরিচালনা করেছে। তারা গণ্ডগোল, সন্ত্রাস ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করেছে। সে যে ঘোষণাসমূহের প্রস্তাব করেছিল তা ছিল শুধুমাত্র ফাঁদ। তার জানা ছিল সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে এগুলো শুধুমাত্র কাগুজে ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, প্রকৃতপক্ষে তখন সে পূর্ণভাবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করত। তাঁর ঔদ্ধত্য, একগুয়েমিতা এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন উপলব্ধির আচরণ একটি শর্তই পূরণ করে আর তা হলো ঐ ব্যক্তি (মুজিব) ও তাঁর দল পাকিস্তানের শত্রু। এবং তারা পূর্ব পাকিস্তানকে সার্বিকভাবে পাকিস্তান হতে পৃথক করতে চায়। এই অপরাধ 'উইল নট্ গো আনপানিশড্'।[৫৬]

৮. বঙ্গোপসাগরের লোনা জলে ঝড়ো হাওয়া।

বাংলার আকাশে ঘন কালো মেঘ

—শ্যামল হৃদয় রক্তে লাল।

পদ্মা যমুনার সবুজ প্রান্তর ছড়িয়ে দুইহাজার কিলোমিটার দূরে লায়ালপুরের এক নির্জন নিঃসঙ্গ সেলে বন্দি শেখ মুজিব।

৮.১ ৩রা আগস্ট, ১৯৭১।

পাকিস্তান টেলিভিশন কেন্দ্রে জেনারেল ইয়াহিয়ার ছবি-সাক্ষাৎকার প্রচারিত হলো।

ইয়াহিয়া খান বললেন, শেখ মুজিবের বিচার হবে—কেননা তিনি পূর্ব

পাকিস্তানকে আলাদা করতে চেয়েছিলেন। সে দেশদ্রোহী ও প্রকাশ্য বিদ্রোহী।

৮.২ ৯ই আগস্ট, ১৯৭১।
সরকারি প্রেসনোটে বলা হলো, শেখ মুজিবকে বিশেষ সামরিক আদালতে বিচার করা হবে। কেননা সে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। প্রেসনোটে আরো বলা হলো, বিচার ১১ই আগস্ট শুরু হবে, বিচার ক্যামেরায় হবে এবং কার্যধারা গোপন থাকবে।

৮.৩ ১০ই আগস্ট, ১৯৭১।
জাতিসংঘ সেক্রেটারি জেনারেল-এর বিবৃতির জবাবে পাকিস্তান সরকার পাল্টা এক বিবৃতিতে বললেন ঃ শেখ মুজিবের বিচার পাকিস্তানী সীমানার বাইরে প্রভাব ফেলবে বলে মনে হয় না।

৮.৪ ৩০ আগস্ট, ১৯৭১।
পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত আগা শাহী জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্টকে জানান যে, আগামী দুই সপ্তাহের ভেতর শেখ মুজিবের বিচার সমাপ্ত হবে।

৮.৫ ৩১শে আগস্ট, ১৯৭১।
বন থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে[৫৭]
বলা হয়, অবশ্যই শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেয়া হবে। বিশেষ সামরিক আদালতে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি শফি ইতিমধ্যে জ্ঞাত হয়েছেন যে, শেখ মুজিবকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হবে।

৮.৬ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।
প্যারিসের লা ফিগারো পত্রিকায় প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বললেন, মুজিব পাকিস্তানের শত্রু।

৮.৭ ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।
প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দপ্তর থেকে জারীকৃত এক প্রেসনোটে বলা হয় যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য বিশেষ সামরিক আদালতে আগস্ট ১১ তারিখ থেকে শেখ মুজিবের বিচার শুরু হয়েছে। আসামী শেখ মুজিবের পক্ষে রাষ্ট্র এ.কে. ব্রোহীকে আইনজীবী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। এ পর্যন্ত বিশ জনের সাক্ষ্য গৃহীত হয়েছে। বিচার কার্য চলছে। যথাসময়ে জনসাধারণকে মামলার অগ্রগতি অবগত করানো হবে।

৮.৮ ২০শে অক্টোবর, ১৯৭১।
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ফ্রান্সের ল ম্যান্ড পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, যেখানে রাষ্ট্রের সংহতি বিপন্ন হবার হুমকির প্রশ্ন জড়িত সেখানে বিচার কার্য এভাবে পরিচালনা অস্বাভাবিক নয়। তিনি বলেন, আমি একজন (মুজিব) বিদ্রোহীর সঙ্গে কথা বলতে পারি না।

৮.৯ ৮ই নভেম্বর, ১৯৭১।

নিউজ উইক পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খান বলেন, শেখ মুজিব স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করে। আমার নিকট বিদ্রোহীদের দমন ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প নেই। তার সঙ্গে কিভাবে আমি কথা বলতে পারি যার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও সেনাবাহিনীর অনুগত্য বিপন্ন করার অভিযোগ রয়েছে। আমি প্রথমে তাঁকে গুলি করে তারপর বিচার করছি না। আমি তাঁকে ছাড়তে পারি না।

৮.১০ ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্টের উর্দু পত্রিকা ইমরোজ-এর বরাত দিয়ে লাহোর থেকে রয়টার জানায় যে, শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত সমাপ্ত হয়েছে এবং তা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট শীঘ্রই পেশ করা হচ্ছে।

৮.১১ ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

করাচী হতে এ. এফ. পির সংবাদদাতা তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্রের বরাত দিয়ে জানায় যে শেখ মুজিবের বিচার এখনো চলছে। লায়ালপুরে শেখ মুজিবের যেখানে বিচার কার্য চলছে সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা গত মাস থেকে আরো কঠোর ও জোরদার করা হয়েছে।

৮.১২ ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১।

ইউ.পি. আই ইসলামাবাদ থেকে জানায় যে সরকারি মুখপাত্র বলেছে যে বিচার কার্য সমাপ্ত হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত রায় প্রদত্ত হয়নি। মুখপাত্র আরো বলেছে যে শীঘ্র রায় ঘোষিত হবে অথবা এ মাসের শেষ পর্যায়েও তা হতে পারে।

৮.১৩ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৭১।

প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় শেখ মুজিবুর রহমানকে কারগার হতে সরিয়ে একটি গৃহে আটক করা হয়েছে।

৮.১৪ ২৫শে মার্চের রাতে গ্রেফতার হওয়া থেকে শুরু করে ইয়াহিয়া খানের তথাকথিত বিচার সম্পর্কে শেখ মুজিবের সাক্ষাৎকারটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[৫৮]

ডেভিড ফ্রস্ট : ওরা ঠিক কখন আপনাকে গ্রেফতার করে? সময়টা কি রাত দেড়টা?

শেখ মুজিব : ঘটনার সূত্রপাত মেশিনগানের বৃষ্টি দিয়ে। আমার বাড়ির চারিদিকে অবিরাম আগ্নেয় বৃষ্টি ...

ফ্রস্ট : পাক বাহিনী যখন আপনার বাড়িতে পৌছে তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

শেখ মুজিব : আমি শোবার ঘরে বসেছিলাম। চারদিক থেকে অগ্নিবৃষ্টি হতে থাকে। আগুনের ফুলকির মতো জানালা দিয়ে গুলি ঢুকে ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যায়।

ফ্রস্ট : তাহলেতো ঘরের সব কিছুই বিনষ্ট হয়?

শেখ মুজিব : তাতো স্বাভাবিক। আমি আমার পরিবারের সাথে ছিলাম। হঠাৎ একটা বুলেট এসে আমার শোবার ঘরে ঢোকে ...

ফ্রস্ট : পাকিস্তান বাহিনী কোন পথে এখানে ঢোকে?

শেখ মুজিব : এমনিতো সারা বাড়ি ঘিরে রেখেছিল। তারপর ঘরের জানালা লক্ষ্য করে অবিরাম গুলিবর্ষণ চলছিল। এই অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীকে সন্তানদের কাছে থাকতে বলি এবং এদের রেখে ঐ ঘর পরিত্যাগ করি।

ফ্রস্ট : আসার পথে আপনার স্ত্রী কি আপনাকে কিছু বলেছিলেন?

শেখ মুজিব : না। ঘটনার অকস্মিকতায় সে হতবাক। আমি শুধু তাকে বিদায় চুম্বন দেই। তারপর কপাটের অর্গল খুলে বের হয়ে এসে গুলি থামাতে বলি, "আমি এখানে, তোমরা গুলি বন্ধ কর। আমি জানতে চাই কিসের জন্য এবং কেনই বা গোলাগুলি করছ?" আমার কথা তাদের কানে যেতেই আরো বিপুল উদ্যোগে অগ্নিবান নিক্ষেপ হতে থাকে এবং কয়েক জন এসে আমাকে ঘিরে ফেলে। আমার উপর বেয়নেট ধরে। একজন অফিসার আমাকে চেপে ধরে বলেন, "একে মেরো না"।

ফ্রস্ট : মাত্র একজন অফিসার?

শেখ মুজিব : মাত্র একজন। আমার পিঠে এবং সামনে উভয় দিকে অস্ত্র দিয়ে গুতোতে থাকে এবং তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী এদিক ওদিক ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে। অফিসারটি আমাকে ধরে রেখেছিল, তবু তারা আমাকে বিশ্রীভাবে নিচের দিকে ঠেলেছিল। আমি তখন তাদের বলি, এভাবে ঠেলবে না, একটু দাঁড়াও, আমি আমার পাইপটি নিয়ে আসি। পাইপ আর তামাক আমার খুব প্রিয় প্রয়োজনীয়। আমার স্ত্রীর কাছে থেকে ওগুলো আনার অনুমতি দাও।

আমাকে ওরা উপরে যেতে দেয়। আমার স্ত্রীকে বাচ্চা দুটোর সাথে দাঁড়ানো অবস্থায় চোখে পড়ে। ওরা আমাকে পাইপ আর একটা ছোট স্যুটকেস এনে দেয়। আমি নিঃশব্দে আসি। আমার দৃষ্টিসীমার চারদিকে জুড়ে ছিল একরাশ আগুনের লেলিহান শিখা, উষ্ণ লাভার মতো।

ফ্রস্ট : আপনিতো তাদের চোখে অপরাধী; আপনার বিচার কিভাবে করা হয়?

শেখ মুজিব : আমার বিচারের জন্য পাঁচ জন সামরিক অফিসারের সাথে সব

অসামরিক অফিসার মিলে আমার বিরুদ্ধে সামরিক আইনের ব্যবস্থা নিতে চেয়েছিল।

ফ্রস্ট : আপনার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ?

শেখ মুজিব : রাজদ্রোহের। পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ইত্যাদি। সব মিলিয়ে ১২টা অভিযোগ। তার মধ্যে ছয়টার শাস্তি—মৃত্যুদণ্ড।

ফ্রস্ট : আপনি কি আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন?

শেখ মুজিব : বিচারের বাণী যেখানে নীরবে নিভৃতে কাঁদে সেখানে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়ার মানে ভাওতার আশ্রয় নেয়া। পাকিস্তান সরকার যেখানে আমার বিচার করতে বদ্ধপরিকর সেখানে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ কোথায়? কোর্টে নেয়ার পর আমি কোর্টের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য একজন আইনজ্ঞ নিয়োগের অনুমতি প্রার্থনা করি। কেননা আমি একজন অসামরিক ব্যক্তি। একজন অসামরিক ব্যক্তির বিচার সামরিক আদালতে কখনও হতে পারে না, কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান ইয়াহিয়া খান শুধুমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান নন, প্রধান সামরিক আইন শাসকও। কাজেই সামরিক আদালত ডাকার ক্ষমতা একমাত্র তারই। তাছাড়া সবাই জানে বিচারের নামে একটা প্রহসন চলছিল।

ফ্রস্ট : তাহলে কি আপনার বিচারে শাস্তির সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ছিল ইয়াহিয়া খানের?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, তিনি ছিলেন সিদ্ধান্তদাতা।

ফ্রস্ট : তারা কি যথাযথ রায় দিতে সক্ষম হয়েছিল?

শেখ মুজিব : ডিসেম্বর মাসে চারদিন কোর্ট মুলতবী ঘোষণা করে ইয়াহিয়া খান সব বিচারক, লেঃ কর্ণেল, ব্রিগেডিয়ার সবাইকে নিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে এক জরুরি সভায় মিলিত হয়ে বিচারের রায় কি হবে সে সম্বন্ধে তার মতামত ব্যক্ত করেন। সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ফ্রস্ট : আপনি কি তখন আপনার পাশের সেলে আপনার কবর আবিষ্কার করেন?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ আমার সেলের খুব কাছেই আমার কবর খোঁড়া হয়। কবরটাকে স্বচোখে দেখেছি।

ফ্রস্ট : ইয়াহিয়া খান যখন আপনাকে হত্যা করার জন্য নিতে আসে তখন জেল প্রশাসক আপনাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন বলে আমি খবরের কাগজে পড়েছি। তথ্যটা কি সঠিক?

শেখ মুজিব : ইয়াহিয়া খানের সাঁগরেদরা জেলের ভেতর একটা তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলেছিলেন। কিছু কয়েদিকে আমার বিরুদ্ধে

ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছিল। খুব ভোরে আমাকে আক্রমণ করে হত্যা করার একটি পরিকল্পনা আঁটা হয়েছিল, কিন্তু জেলের একজন অফিসার আমার প্রতি বেশ সদয় ছিলেন। তিনি ইয়াহিয়া খানের জেলে আসার দিনক্ষণ সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখতেন। একদিন রাত ৩টার সময় তিনি আমাকে কারাগারের বাইরে নিয়ে এসে তাঁর বাংলোয় আমাকে মিলিটারি পাহারা ছাড়াই লুকিয়ে রাখেন। দুই দিন পর আমাকে ঐ বাংলো থেকে সরিয়ে রাখেন। সেখানে তিনি আমাকে চার-পাঁচ কিংবা ছয় দিন লুকিয়ে রাখেন। কেউ আমার অবস্থান জানতো না। জেলের কয়েক জন গরিব অফিসার শুধু আমার সন্ধান জানতো।

ফ্রস্ট : ইয়াহিয়া খান যখন আপনাকে ভুট্টোর হাতে তুলে দেন তখন তিনি আপনাকে আবার ফাঁসি দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন—এটা কি সত্য?

শেখ মুজিব : নির্ভেজাল সত্য। এ প্রসঙ্গে মিঃ ভুট্টো আমাকে একটা মজার গল্প বলেছিলেন। ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ইয়াহিয়া খান মিঃ ভুট্টোকে বলেছিলেন, "শেখ মুজিবকে হত্যা না করে আমি একটি বিরাট ভুল করে ফেলেছি।"

ফ্রস্ট : ইয়াহিয়া খান কি ঠিক এ কথাই বলেছিলেন?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে বলেছিলেন ঃ ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে মুজিবকে হত্যার অনুমতি দিন। তিনি আরো বলেছিলেন ঃ দিন তারিখ পিছিয়ে দিন, ক্ষতি নেই। কিন্তু দয়া করে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে মুজিবকে হত্যা করার অনুমতি দিন। কিন্তু ভুট্টো মত দেননি। প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করেছেন।

ফ্রস্ট : এর জবাবে ভুট্টো কি বলেছিলেন তা কি তিনি আপনাকে বলেছিলেন?

শেখ মুজিব : হ্যাঁ, ভুট্টো বলেছিলেন, তিনি তা পারেন না, কারণ এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য এবং বেসামরিক ব্যক্তি তখন বাংলাদেশে বন্দি, বাংলাদেশ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর কব্জায় তারা দিন কাটাচ্ছে। এ ছাড়া পাঁচ থেকে দশ লক্ষ অবাঙালির অবস্থান বাংলাদেশে। এ অবস্থায় শেখ মুজিবকে যদি হত্যা করা হয় এবং আমি যদি ক্ষমতা দখল করি তাহলে বাংলাদেশ থেকে একজন পাকিস্তানীও পশ্চিম পাকিস্তানে আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারবে না। এরা ফেরৎ না এলে পশ্চিম পাকিস্তানে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং আমার অবস্থাও শোচনীয় হবে।

৯. মৃত্যুর কালো গহবর থেকে বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন... মুজিব হত্যার দ্বিতীয় পর্যায় ব্যর্থ হলো।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## বঙ্গবন্ধু : বাংলাদেশ : এক অন্তহীন আক্রোশ ...

১. বঙ্গবন্ধু হত্যা সম্পর্কে তথ্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, বঙ্গবন্ধুর হত্যার সঙ্গে যে সমস্ত আন্তর্জাতিক চক্র জড়িত বাংলাদেশের স্বাধীনতার তারা ছিল দুশমন, শত্রু। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ধ্বংস করার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও তাদের সে শত্রুতা ও আক্রোশ ফুরিয়ে যায়নি। তাদের সমস্ত আক্রোশ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে কেন্দ্র করেই বারবার ছোবল হানতে চেয়েছে।

১.১ পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত যোশেফ ফারল্যান্ড ১৯৭১ সনের মার্চে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে সাক্ষাৎ করে স্পষ্ট করে বলেছিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার যে কোনো উদ্যোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ নীতির পরিপূরক নয় বরং তাই এ ধরনের প্রচেষ্টাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করতে পারে না। ফারল্যান্ড বিশেষ করে সি. আই. এ পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন যে, শেখ মুজিবের নিকট স্বাধীনতার বিকল্প কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়।

১.২ এ কথা বুঝতে পেরেই শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী গণহত্যার যে ব্লু প্রিন্ট হাতে নিয়ে কাজ করেছিল সে ব্লু প্রিন্ট রচনায় সামরিক চক্রকে সাহায্য করেছিল রবার্ট জ্যাকসন। ২৫শে মার্চের পূর্ব হতেই তিনি ঢাকাতে ছিলেন এবং সামরিক চক্রের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। জ্যাকসনের ছিল গণহত্যা পরিকল্পনার অতীত অভিজ্ঞতা—যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও ব্রাজিলে হত্যা ও ধ্বংসের পরিকল্পনা সরবরাহের মাধ্যমে।

১.৩ এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৬০ সাল থেকে ঢাকাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেলের সম্প্রসারিত অফিসের নামে শাহবাগ হোটেলের একটি স্যুটে গোপন অফিস স্থাপিত হয়। ১৯৬৪ সনে উক্ত অফিসের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী হঠাৎ করে চাকুরী ছেড়ে দেয়। তিনি প্রকাশ করেন যে, কতিপয় মার্কিনী অফিসার এ দেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নেতা, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের ফটো, জীবনী এবং কর্মতৎপরতা সম্পর্কে রিপোর্ট সংগ্রহ করে গোপন ফাইলে রাখা হচ্ছে।

শাহবাগ হোটেলের এই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে এই গুপ্ত অফিসটি মতিঝিলস্থ আদমজী কোর্টে স্থানান্তরিত হয়। জ্যাকসন এই অফিসটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার আরো তিন জন সহকর্মী ছিল।

১.৪ পাকিস্তানী জেনারেল রাও ফরমান আলীর নিজের হাতে লেখা (২৮ পৃঃ) ডেস্ক ডায়েরিতে দেখা যাচ্ছে এটির ডানদিকের উপরে যে কয়টি শব্দ লেখা আছে তাতে U.S.A. (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) DGISI (ডিরেক্টর জেনারেল ইন্টার সার্ভিস ইনটেলিজেন্স), এর উপরে লেখা আছে মি. ডব্লিউ দেশপিক এবং নিচে মি. হেইট। আরো নিচে লেখা রয়েছে পলিটিক্যাল ৬০–৬২ ও ৭০।

কে এই হেইট? এর পুরো নাম হাগ জি হেইট। জন্ম ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯২৮। ১৯৪৬–৪৯ পর্যন্ত মার্কিন সেনাবাহিনীতে ছিলেন। ১৯৫৩–৫৪ সালে মার্কিন সেনাবাহিনীর বিশেষ গবেষণা বিভাগে কাজ করতেন। ১৯৫৪ সালে পররাষ্ট্র দফতরের মাধ্যমে সি. আই. এ পলিটিক্যাল এটাচি করে তাকে কয়েকটি দেশে এজেন্ট হিসেবে পাঠায়। কলকাতা, ঢাকা ও কায়রো ছিল তার কর্মক্ষেত্র। ১৯৬০–৬২ সালে তিনি ঢাকায় ছিলেন। ১৯৭০ সালেও পুনরায় ঢাকায় আসেন।

১.৫ আর, ডাব্লিউ দেশপিক একজন বাস্তুত্যাগী পোলিশ, যিনি সরাসরি সি. আই. এর নেট ওয়ার্কে নিয়োজিত ছিলেন। রাও ফরমান আলী, জ্যাকসন, হেইট ও দেশপিক একজোট হয়ে বাঙালি হত্যাযজ্ঞের ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছিল। এবং ২৫শে মার্চের পূর্বেই এই শেষোক্ত দুইজন সি. আই. এর অন্যতম ঘাঁটি ব্যাংকক যাবার দুইখানা পি আই এ টিকিট যোগাড় করেছিল— যা উক্ত ডায়েরির পৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে।[১] শুধু তাই নয়, ১৯৭১ সনের মধ্য মার্চের সি. আই. এ পেন্টাগণ ইলেকট্রোনিক গোয়েন্দা সূত্র থেকে ওয়াশিংটন পাক বাহিনীর ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতির খবর জানলেও তা ঢাকাকে জানতে দেয়া হয়নি।[২] অবশ্য ড. কিসিঞ্জার বারবার বলে এসেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার ব্যাপারে এ ধরনের সামরিক সমাধানের তিনি কোন সময়েই পক্ষপাতি ছিলেন না।[৩] কিন্তু কলামিস্ট জ্যাক এন্ডারসনের ফাঁস করে দেয়া কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তানকে সর্বতোভাবে সাহায্য দিয়েছে এবং দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল।[৪] সে জন্য প্রখ্যাত বই 'ম্যাসাকার'–এর লেখক বরার্ট পেইন

লিখেছেন ঃ পূর্ব পাকিস্তানের অসহায় জনগণের জন্য ড. কিসিঞ্জার কোনো প্রকার সহানুভূতি উচ্চারণ করেনি। পূর্ব প্যাকিস্তানের এই ম্যাসাকার ছিল তার চোখে একটি সহজ দুঃখজনক রাজনৈতিক ঘটনা— যা শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ও প্যাকিস্তানের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যা কোনোক্রমেই এই রাষ্ট্রের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বিনষ্ট করতে পারবে না। তারা একত্রে সমতা রেখে কাজ করে যাবে—যতই ম্যাসাকার ঘটুক না কেন।[৫]

২.১ এ২ মধুর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য নিক্‌সন প্রশাসন মিথ্যাচার করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠানো হয়েছে অথচ বিশ্বকে বলা হয়েছে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ওয়াশিংটন পোস্ট–এর প্রকাশিত এক সংবাদে দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিম থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণের জন্য মার্কিন বিমানগুলো লিজ দেয়া হয়েছে।[৬] ১৯৭১ সনে ক্রোধোদীপ্ত সিনেটর ফুলব্রাইট সিনেট পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটিতে পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠানো বন্ধ করার দাবী জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ফলে প্রকাশ্যতঃ ১৯৭১ সালের এপ্রিলের শেষাশেষি নিকসন সরকার পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেও গোপনে পাকিস্তানের নিকট অস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাব পাঠায়। এ প্রস্তাব দানের যাবতীয় দলিল-পত্রও হঠাৎ করে এক সময় ফাঁস হয়ে পড়ে। এ দলিলগুলো 'এন্ডারসন দলিল' নামে পরিচিত।

২.২ জ্যাক এন্ডারসন কর্তৃক প্রকাশিত ঐ দলিল পত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি গোপন চুক্তির অস্তিত্ব রয়েছে।[৭]

৩. বাংলাদেশের গণহত্যা দেখে ঢাকাস্থ মার্কিন কনস্যুলেট অনেক গোপন এবং উল্লেখযোগ্য ডিসপ্যাচ ওয়াশিংটনে প্রেরণ করে। ১৯৭১ সনের ২৮শে মার্চ একটি টেলিগ্রাম করে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত গণহত্যা বন্ধের জন্য ওয়াশিংটনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।[৮]

এ সকল রিপোর্ট দেখে ইসলামাবাদের মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বলতে বলা হয় এ সব রিপোর্ট 'দুঃখজনক' 'অপরিপক্ক' এবং বন্ধু দেশের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়ে' হস্তক্ষেপের সামিল।[৯]

৩.১ এতদসত্ত্বেও সমস্ত কূটনৈতিক রীতিনীতি ভঙ্গ করে ১৯৭১ সনের ৬ই এপ্রিল ঢাকাস্থ মার্কিন কনস্যুলেটের উনিশ জন অফিসার, AID মিশন USIA একটি রেজিস্টার টেলিগ্রাম ওয়াশিংটনে প্রেরণ করে। টেলিগ্রামটি ৪৮ বয়স্ক ক্যারিয়ার ডিপ্লোম্যাট তদানীন্তন ঢাকাস্থ মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেল মিঃ আর্চার ব্লাড (Archer Blood) কর্তৃক অনুমোদন করানো হয়। এ সম্পর্কে কিসিঞ্জার বলেছেন, "সেক্রেটারি রজার্স তাকে বলেছেন

যে তার ডিপ্লোম্যাটগণ রিপোর্ট না পাঠিয়ে দরখাস্ত লিখেছে।" অন্যদিকে দিল্লীস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত কিনেথ কিটিং অনুরূপ রিপোর্টে এই হত্যাযজ্ঞ ও নৃশংসতায় সামরিক সাহায্য অবিলম্বে বন্ধের জন্য লিখে পাঠায়।[১০] এই দুটি রিপোর্ট ও আবেদনই বলা বাহুল্য প্রত্যাখ্যাত হয়।

৩.২ ঢাকাস্থ মার্কিন কনস্যুলেট কর্মচারীদের এবং কনস্যুলেট জেনারেল আর্চার ব্লাডের আবেদন এবং দিল্লীর মার্কিন রাষ্ট্রদূতের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে হোয়াইট হাউজ ও পেন্টাগণ কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কেননা প্রাক্তন সি. আই. এ বিশ্লেষক ও কিসিঞ্জারের দক্ষিণ এশিয়ার সহায়তাকারী হ্যারল্ড সান্ডার্স, যোশেফ সিসকো যিনি নিকট প্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি এবং উলিয়াম কার্গো—যিনি অত্র এলাকার রিসার্চসনের স্টান্ড অফিসার, এরা একত্রে মিটিংএ বসে ১৯৭১ সনের বসন্তে এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করে যে, বাঙালিরা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে; এমনকি পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর নিকট গেরিলা তৎপরতাও ব্যর্থ হবে।[১১]

৩.৩ যেহেতু বিজয়ী হবে পাকিস্তান আর স্বাধীন বাংলাদেশের আন্দোলন পরাজিত হবে, সে জন্য জয়ের স্বপক্ষে কাজ করাই শ্রেয়। সুতরাং পাঠাও পাকিস্তানে অস্ত্র। দাও টাকা।

মার্কিন ও বিশ্বজনমতকে শান্ত করার জন্য নিকসন সরকার বিভিন্ন প্রকার কলা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। পূর্বেই বলেছি পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও পেন্টাগণ পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রেখেছিল। ১৯৭১ সনের ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত মার্কিন সি–১৩০ মালবাহী বিমানে করে অস্ত্র পাঠিয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে মার্কিন সমরাস্ত্র কি পরিমাণে পাকিস্তানে এসেছিল তার কিছু বিবরণ—

ক. মার্কিন সহায়তা কর্মসূচি অনুযায়ী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাড়ে ৫ থেকে ৬ ডিভিশনকে অত্যাধুনিক মরণাস্ত্রে সুসজ্জিত করার এবং তাদের প্রশিক্ষণ দানের দায়িত্ব গ্রহণ করে পেন্টাগণ। পাকিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হতে আধুনিক ইনফ্যান্ট্রি অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে—

সেমি অটোমেটিক রাইফেল, কারবাইন,
হালকা ও মাঝারি মেশিনগান,
ইনফ্যান্ট্রি মর্টার,
৪৭ ও ১০৬-এম এম ক্যালিবর রিকয়েললেস রাইফেল,
১০৫ ও ১৫৫ এম এম হোইৎসার,

৩শ আমর্ড পারসোনাল ক্যারিয়ার,
২শ সোবম্যান, ২৫০টি শাফী, প্রায় ১০০ শ বুলডস, ৪শ ৬টি এম ৪৭ এম ৪৮ প্যাটন ট্যাঙ্ক।
এ ছাড়াও রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং সরবরাহ এবং সংকেত পাঠাবার সমস্ত উপকরণ। দুই মাসের উপযোগী গোলাবারুদ এবং উচ্চ শ্রেণীর ভ্যারিয়েবল টাইম ইলেকট্রনিক ফিউজ।

খ. বিমান বাহিনী
১০টি লকহিড, টি–৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান,
৭টি লকহিড আরটি–৩৩–এ সন্ধানী প্রশিক্ষণ বিমান,
১২০টি এফ–৮৬ স্যাবর জেট জঙ্গী বোমারু বিমান,
২৬টি মার্টিন ক্যানবেরা বি–৫৭ বোমারু বিমান,
৬টি মার্টিন ক্যানবেরা আর বি-৫৭ বোমারু বিমান,
১৫ টি সিকোরগি এস ৫৫ হান্টার,
৪টি গ্রামান এইচ ইউ–১৬ এ আলবাট্রস সামুদ্রিক সন্ধানী বিমান,
১২টি লকহিড এফ–১০৪ এ স্টার ফাইটার,
২টি লকহিড এফ ১০৪ বি স্টার ফাইটার,
৬টি লকহিড সি–১৩০-ই হারকিউলিস পরিবহন বিমান,
৪টি ক্যামন এইচ–এইচ–৪৩ বি হাস্কি হান্টার এবং
২৫টি সেসনা টি–৩৭ বি জেট প্রশিক্ষণ বিমান।

গ. নৌবাহিনী
৭টি উপকূলীয় মাইন সুইপার,
১টি আকর্ষক জাহাজ,
২টি তেলবাহী জাহাজ,
৪টি ব্যাটল জাতীয় পোত বিধ্বংসক,
২টি সি ভি জাতীয় পোত বিধ্বংসক,
২টি সি এইচ জাতীয় পোত বিধ্বংসক,
এ ছাড়া একটি জলবাহী জাহাজ, দুটি আকর্ষক জাহাজ ও একটি তেলবাহী জাহাজ আমেরিকা ইতালির নিকট থেকে ক্রয় করে এবং তা পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়। একটি ডুবো জাহাজ (পি এন এস গাজী) পাকিস্তানকে ধার দেয়া হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশে গেরিলা তৎপরতা বন্ধের জন্য বেশ কিছু নদীযান ও উপকূলীয় জল–যান পাকিস্তানকে আমেরিকা সরবরাহ করে।

৩.৪ এ ছাড়া মার্কিন সামরিক সহায়তা কর্মসূচি অনুসারে পাকিস্তানের সকল বিমান ঘাঁটি ন্যাটোর মান অনুযায়ী তৈরি করা হয়। এই সব ঘাঁটিগুলো হচ্ছে, মৌরীপুল, সামুঙ্গলি, দ্রিঘারোড, পেশোয়ার, কোহাট, রিশালপুর,

লাহোর, সারগোদা, মুলতান, চাকলাল, নবাবশাহ, গিলগিট, চিত্রল, মাশির এবং মীরনশাহ। বাদিন, মুলতান ও পেশোয়ারে ভারতমুখী সেন্টো নির্ভর করা হয়। এই কর্মসূচিতে একটি মাইক্রোওয়েভ সংবাদ বিনিময় কেন্দ্রও তৈরি হয়।[১২]

অনেকের হিসেবে তখন পর্যন্ত পাকিস্তানকে দেয়া মার্কিন সামরিক সহায়তার মূল্যমান ১শ ২৯ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। এখানে এ কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, এ সব মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রের প্রায় পুরোটাই ব্যবহৃত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এবং বাঙালি নিধন কার্যে।

৪. শুধুমাত্র এত সব মরণাস্ত্র পাঠিয়েই মার্কিন শাসকবৃন্দ সন্তুষ্ট থাকেনি। বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে ঠেকানোর সর্বশেষ প্রকাশ্য প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় বঙ্গোপসাগরে মার্কিন ৭ম নৌবহর বা টাস্ক ফোর্স–৭৪ পাঠানোর মাধ্যমে। ওয়াশিংটন স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপের (WSAG) পরামর্শ মনঃপুত না হওয়ায় নিকসন চাইলেন সোভিয়েতকে বুঝতে হবে সোভিয়েত অস্ত্র ব্যবহার করে পাকিস্তানকে বিভক্ত করা যাবে না।[১৩]

৪.১ শুধু তাই নয়, আমেরিকা আশা করেছিল চীন পাকিস্তানের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। যুদ্ধে চীন এগিয়ে এলে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিশ্চুপ থাকবে না এবং তার ফলে আমেরিকার জড়িত হয়ে পড়াও অনিবার্য হয়ে উঠবে।

৪.২ নিকসন ব্যক্তিগতভাবে এই ঝুঁকি (পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধের) নিতে প্রস্তুত ছিলেন।[১৪] এ ছাড়া রাশিয়া-মার্কিন হটলাইনের মাধ্যমে কিসিঞ্জার মস্কোকে অনুরোধ করেন যে, সে যেন পশ্চিম পাকিস্তান ধ্বংস করা থেকে ভারতকে নিবৃত্ত করে।[১৫]

৪.৩ পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন দেখে বঙ্গোপসাগরে টাস্ক ফোর্স বা সপ্তম নৌবহর পাঠানোর জন্য এডমিরাল মুরারকে নির্দেশ দেয়া হয়।[১৬] এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রকার ঝুঁকি নিয়ে বল প্রয়োগিক কুটনীতির ব্যবহার করতে আসে। বলাবাহুল্য বাংলাদেশের মূল ঘটনাবলির প্রতিই মার্কিন টাস্কফোর্সের লক্ষ্য ছিল। ৬ই ডিসেম্বর ভিয়েতনামের টংকিন উপসাগরে অবস্থানরত নৌবাহিনীর কয়েকটি জাহাজ সমন্বয়ে টাস্ক–ফোর্স–৭৪ গঠন করা হয় এবং ১০ই ডিসেম্বর এই বহর সিঙ্গাপুর পৌছে। ১২ই ডিসেম্বর টাস্ক–ফোর্সকে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু ইতিপূর্বেই রাশিয়া ৬–৭ তারিখের মধ্যেই ভারত মহাসাগরে রণপোতের প্রথম টাস্ক–ফোর্স পাঠিয়েছিল এবং সপ্তম নৌবহরকে যথারীতি মোকাবিলার জন্য রাশিয়া দ্বিতীয় টাস্ক–ফোর্স পাঠায়। এমতাবস্থায়, মার্কিন ৭ম নৌবহরকে

বঙ্গোপসাগর হতে ফিরিয়ে নিতে হয়। সম্পূর্ণ টাস্ক–ফোর্সটি পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত ছিল এবং এর নেতৃত্ব দানকারী পারমাণবিক জাহাজটির নাম ছিল এন্টারপ্রাইজ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই ৭ম নৌবহরটি আক্রমণাত্মক শক্তি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের দিকে তীব্র গতিতে ছুটে এসেছিল। এই টাস্ক–ফোর্স ৭ম নৌবহরে অন্তর্ভুক্ত ছিল—

ক. ইউ.এস. এস. এন্টারপ্রাইজ, এটি ছিল ৭৫ হাজার টনের বিশাল ভারবাহিত জাহাজ, যা ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ এবং যে জাহাজটি ৫৭ দিনে ত্রিশ হাজার মাইল পুনঃতেল গ্রহণ ব্যতীত একটানা চলতে পারে। এটা আটটি অটোমেটিক রিয়্যাক্টরস শক্তিসম্পন্ন। এর চারটি গিয়ার বাষ্পীয় টারবাইন ৩৫ নটস্ পর্যন্ত চলতে সক্ষম। স্বাভাকিভাবে ২৮৭০ জন পারসোনাল সত্ত্বেও জাহাজটি অরো ২ হাজার লোকসহ ১০০টি বিভিন্ন ধরনের বিমান বহন করতে পারত। এই জাহাজের সঙ্গে ছিল 'ত্রিপোলী'—যা ছিল এমফিলিয়ান য়্যাসল্ট শিপ, ছিল গাইডেড মিসাইল সজ্জিত 'কিং', তিনটি গাইডেড মিসাইল সজ্জিত ডেস্ট্রায়ার; ডেকাটুর; পরসনস এবং টারটার শ্যাম।

খ. 'দি ত্রিপোলী' ছিল ১৭ হাজার ১০ টন সম্পন্ন একটি বড় ধরনের এমফিবিয়ান য়্যাসল্ট যুদ্ধ জাহাজ। এই জাহাজটি বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছিল যাতে ২৪টি মাঝারী, ৪টি বড় এবং চারটি পর্যবেক্ষক হেলিকপ্টার বহন করতে সক্ষম। সে ২১০০ জন অফিসার ও নৌসেনাসহ একটি নৌব্যাটালিয়ানকে অস্ত্রশস্ত্র, কামান, যানবাহন এবং অন্যান্য উপকরণ দ্বারা সজ্জিত করার ক্ষমতা বহন করত।

গ. 'দি কিং' গাইডেড মিসাইল দ্বারা সজ্জিত ছিল। সে ভূমি থেকে শূন্যে ক্ষেপণাস্ত্র এবং টর্পেডো দ্বারাও সজ্জিত ছিল।

ঘ. অনুরূপভাবে ডেস্ট্রয়ার, টারটার এবং ডেকাটরে ভূমি থেকে শূন্যে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা সজ্জিত ছিল এবং যা অত্যাধুনিক পারমাণবিক উপকরণ দ্বারা সমৃদ্ধ।[১৭]

৫. স্বাধীনতা যুদ্ধের পরও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মার্কিন ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারি মার্কিন প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্কের বেতার থেকে একটি বার্তা প্রচার করা হয়েছিল।[১৮] যার অনুবাদ উদ্ধৃত করা হলো—

বার্তাটির অনুবাদ ঃ

হেড কোয়ার্টার্স, আমেরিকান ফোর্সেস নেটওয়ার্ক, ইউরোপ

এপিও, নিউইয়র্ক ৮৯৭৫৭

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

প্রিয় মহাশয়,
১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ এই নেটওয়ার্ক বেতারের ০৮০০ সংবাদ প্রচারের অংশ হিসেবে প্রচারিত বাংলাদেশ সংক্রান্ত একটি খবরের পূর্ণ বিবরণের জন্য আপনি যে অনুরোধ জানিয়েছেন তার জবাবে আমরা সানন্দে এ সঙ্গে তা পাঠাচ্ছি
"শিশু সাধারণতন্ত্র বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ দশ হাজারেরও বেশি লোককে আটক করেছেন বলে জানা গেছে। একজন সরকারি মুখপাত্র বলেছেন, গত বছরের শেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে সহযোগিতার জন্য এদের গ্রেফতার করা হয়েছে। মুখপাত্র বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক মামলা দায়েরের প্রত্যেকটি ঘটনাই পুরোপুরি তদন্ত করা হবে। সন্দেহক্রমে আটক ব্যক্তিদের সকলেই মুসলমান .. বাংলাদেশের নতুন শাসকেরা হিন্দু... এর মধ্যে কোন প্রীতির অবশেষও নেই।
মার্কিন সশস্ত্রবাহিনীর সংবাদে আগ্রহের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।"

ভবদীয়
স্বাক্ষর—ডেভিড এইচ মিন্যাট
নিউজ ডিরেক্টর।[১৯]

এখানে বিশ্বজনমত বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার অপকৌশল গ্রহণ করেছিল নিকসন সরকার। স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার, আলবদর দালালদের স্বপক্ষে প্রচার এবং স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রপরিচালনায় অধিষ্ঠিত শেখ মুজিব ও তাঁর সরকারকে অপদস্ত করার জন্য এই সব বিভ্রান্তিকর অপকৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল, শেখ মুজিবসহ তার সরকারকে হিন্দু বলে প্রচার করা হয়েছিল।

৫.১ এ প্রসঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শুধুমাত্র অস্ত্রশস্ত্র, অর্থ সম্পদ ও নৌবহর দিয়ে পাকিস্তানকে সাহায্য করেই ক্ষান্ত হয়নি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ যেন অংকুরেই বিনষ্ট হয় তার অশুভ প্রয়াসও চালিয়েছিল। সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জার একটি বড় আকারের বই লিখেছেন। বইটির নাম 'দি হোয়াইট হাউস ইয়ার্স'।[২০] বইটির একুশতম অধ্যায়ের শিরোনাম ঃ
"দি টিল্ট ঃ দি ইন্ডিয়া পাকিস্তান ক্রাইসিস অব ১৯৭১।"
এই শিরোনামের মধ্যে ৮৬৯ থেকে ৮৭৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একটি অধ্যায়ের নাম "কনট্যাক্ট উইথ দ্য বাংলাদেশ একজাইলস্।" এই অংশে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব হেনরী কিসিঞ্জার যা লিখেছেন সংক্ষেপে তা হলো—
১৯৭১ সনের ৩০শে জুলাই প্রবাসী সরকারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও আওয়ামী

লীগের নির্বাচিত সদস্য জনাব কাইউম (কাজী জহিরুল কাইউম, যিনি 'মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর' বইয়ের সাক্ষাৎকারে কিসিঞ্জারের কথিত মিঃ কাইউম যে তিনিই তা স্বীকার করেছেন) কলকাতাস্থ মার্কিন দূতাবাসে দেখা করে বলেন, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ করার জন্য প্রবাসী সরকারের পক্ষে দায়িত্ব পেয়েছেন। কলকাতাস্থ মার্কিন কনস্যুল তাঁকে দুই সপ্তাহ পরে পুনরায় আসার জন্য অনুরোধ জানান এবং কলকাতা স্টেট্ চ্যানেলে বিষয়টি হোয়াইট্ হাউজকে জ্ঞাত করেন।

এ সম্পর্কে কিসিঞ্জার লিখেছেন ঃ ইসলামাবাদে এই গোপন সংযোগ প্রকাশিত হয়ে পড়লে তাদের জন্য মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে এবং ভারত এটা প্রকাশ করার জন্য যে উদ্যোগী হবে তা বলাই বাহুল্য; তা সত্ত্বেও বিষয়টি প্রেসিডেন্ট নিকসনকে অবহিত করে সংযোগ স্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

নির্ধারিত ১৪ই আগস্ট কাজী জহিরুল কাইউম পুনরায় দূতাবাসে উপস্থিত হন। তার প্রস্তাব ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতায় শেখ মুজিবকে উপস্থিত থাকতে হবে তাহলে তার গ্রুপ ছয় দফার ভিত্তিতে স্বাধীনতার চেয়ে কিছু কমে পাকিস্তানের সাথে সমঝোতায় আসতে রাজি আছে।

কয়েক দিন পর দ্বিতীয় দফা বৈঠকে তিনি এই বলে মত প্রকাশ করেন যে, ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে এই ধরনের 'ফেস সেভিং' প্রস্তাব অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, সে জন্য সমঝোতা প্রক্রিয়া দ্রুততর হওয়া প্রয়োজন। কিসিঞ্জার যোশেফ ফারল্যান্ডের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানকে বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারের সঙ্গে 'সংযোগ' করার কথা জানালে ইয়াহিয়া খান এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। একই সাথে ফারল্যান্ড ইয়াহিয়া খানকে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার ও তাঁর সঙ্গে গোপন বৈঠকের পরামর্শ দিলে ইয়াহিয়া খান তাতে সম্মত হন।

২৭শে আগস্ট জনাব কাইউম এই সংযোগ দ্রুততর করতে চাইলে হোয়াইট হাউজ আরো এক পা এগিয়ে আসে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর ফারল্যান্ড ইয়াহিয়া খানকে বলেন যে, আমরা বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে 'সংযোগ' করেছি এবং জনাব কাইউমকে জানিয়ে দেয়া হয় ইয়াহিয়া খান এ ধরনের গোপন বৈঠকে রাজী আছেন।

৯ই সেপ্টেম্বর কলকাতার মার্কিন দূতাবাস জনাব কাইউমকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করতে বলে। কিন্তু জনাব কাইউম উল্টো সুরে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী করেই শুধু ক্ষান্ত হননি, তিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানী সৈন্যের প্রত্যাহার, জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশের নিরাপত্তার গ্যারন্টি এবং অবিলম্বে স্বাধীনতা দাবী করেন।

[প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ইতিমধ্যে জনাব কাইউমের মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে এই 'সংযোগ'-এর কথা ভারত সরকার অবগত হয়েছে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মোশতাককে প্রকারান্তরে তখন থেকেই নজরবন্দি রাখা হয়।]

১৪ই সেপ্টেম্বর জনাব কাইউম দূতাবাসকে বলেন যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রী দেখা করতে অপারগ।

২১শে সেপ্টেম্বর ইয়াহিয়া খান ফারল্যান্ডের নিকট কলকাতার সংযোগ সম্পর্কে জানতে চান।

২৩শে সেপ্টেম্বর কাইউম তার প্রতিনিধি দ্বারা মার্কিন দূতাবাসকে জানান যে, ভারত সরকার তাদের 'সংযোগ'–এর কথা জেনে ফেলেছে এবং ফর্মালী হুঁশিয়ারী জানিয়েছে। বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির সঙ্গে 'সংযোগের' কথা বলাতে জনাব কাইউম অল্পক্ষণের মধ্যে দূতাবাসে এসে বলেন যে, ইন্ডিয়া চায় যে সমস্ত যোগাযোগ দিল্লীর মাধ্যমে হোক।

২৮শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কিন দূতাবাসে দেখা করে বলেন, বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা—পূর্ণ স্বাধীনতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ ব্যাপারে প্রভাব খাটানো উচিত।

১৬ই অক্টোবর জনাব কাইউম মার্কিন কনস্যুল ও বাংলাদেশের এ্যাকটিং প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মিটিং নাকচ করে দেন।

২০শে অক্টোবর বাংলাদেশের উচ্চ পদস্থ অফিসার হোসেন আলী বলেন যে তার মিশন ইয়াহিয়া খানের নিকট বার্তা পাঠাতে আগ্রহী নয়। 'অপরিহার্য সমাধান' হলো মুজিবের মুক্তি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা। অক্টোবরের শেষের দিকে ভারতীয় সংবাদপত্র 'বিদেশী প্রতিনিধিদের' সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য হুমকি প্রদান করে। এইভাবে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের একাংশের সঙ্গে ও পাকিস্তানী সরকারের মধ্যে সমঝোতা প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

৫.২ ড. হেনরি কিসিঞ্জারের এই অংশের সঙ্গে আরও কিছু তথ্যের সংযোজন প্রয়োজনীয়। 'দি কারেঞ্জি পেপারস্'[২১] এ বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে। তার মধ্যে কলকাতার 'নেগোশিয়েশনস্' সম্পর্কে বলা হয়েছে, মার্কিন সরকার কলকাতায় আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু এঁরা এফেকটিভ ছিল না। স্টেট ডিপার্টমেন্ট সোর্স থেকে আরো বলা হয় সেখানে কমপক্ষে আটটি কন্ট্যাক্ট সোর্স কাজ করছিল। ঐ সূত্র ধরে বলা হয়েছে তদানীন্তন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে সি. আই. এ যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। কিভাবে এবং কাদের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল? ওয়াশিংটন সূত্র থেকে

প্রকাশ, স্যান্ডার্স আওয়ামী লীগের মোশতাক চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল।[২২]

৫.৩ হোক, মোশতাক চক্রের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে আটকে দেয়া—পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই বাংলাদেশের জন্য অধিকতর স্বায়ত্তশাসন গ্যারান্টি করা। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাস। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের বৈঠক। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে একটি দল জাতিসংঘের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। প্রায় সব ঠিকঠাক, এমনকি টিকিট পর্যন্ত কাটা শেষ হয়েছে। এমন সময় ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে পড়ল। ষড়যন্ত্রের মূলকথা ছিল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ নিউইয়র্কে যাবেন এবং অকস্মাৎ মার্কিন নীতির কাছাকাছি একটি ঘোষণা দেবেন পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার বিকল্প হিসেবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের কলকাতাস্থ থিয়েটার রোডের বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন এবং পাল্টা সরকার গঠন করবেন।[২৩] আজ ভাবতে ভয় হয়, এই সর্বনাশা ষড়যন্ত্র ফাঁস না হলে না জানি আরো কত লক্ষ প্রাণের আত্মহুতি দিতে হতো এই স্বাধীনতা যুদ্ধে। এই গোপন আঁতাত প্রকাশিত হয়ে পড়লে প্রকারান্তরে খন্দকার মোশতাকের নজরবন্দি অবস্থায় দিন কাটাতে হয়। ফলে সি. আই. এ ও মোশতাকের ষড়যন্ত্র সে দিন সফল হয়নি।

৫.৪ এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি লিফলেট সেদিন মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। একাত্তরের অক্টোবর মাস মুজিবনগর সরকারের জন্য মারাত্মক সংকট কাল। নানা গুজব চারদিকে ছড়ানো। নানা উপদলীয় কোন্দল। মুজিবনগর সরকারের আওতার বাইরে মুজিব বাহিনীর উপস্থিতি, পরামর্শ কমিটিতে ছোট ছোট চৈনিকপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মৌলানা ভাসানীর চাপ, মন্ত্রী সভা সম্প্রসারণের জন্য রাজনৈতিক চাপ তখন প্রবল। তাছাড়াও যেটা সবচেয়ে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল তাহলো সরকারের অজ্ঞাতে পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার প্রচেষ্টা। এমনি এক নাজুক অবস্থায় বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের অজান্তে মোশতাক চক্র বঙ্গবন্ধুর মুক্তিদানের শর্তে ছয় দফার ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় যুদ্ধ বিরতির জন্য প্রচেষ্টা শুরু করে। এই উদ্দেশ্যে সেদিন "স্বাধীনতা না বঙ্গবন্ধু" এই মর্মে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা চাইলে পাক জঙ্গী শাহী বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করবে। সুতরাং তাদের যুক্তি হলো, পাকিস্তান

রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ঢিলেঢালা কনফেডারেশন স্বীকার করে নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে আনা হোক, তারপর স্বাধীনতার বিষয়টি দেখা যাবে। কিন্তু কিসিঞ্জারের বইয়ের উল্লেখিত জনাব কাইউম সাহেব এক সাক্ষৎকারে বলেছেন যে, খন্দকার মোশতাক বঙ্গবন্ধুকে আনার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এটা আমি তো বিশ্বাস করি না।[২৪]

৫.৫ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেখ মুজিবের জন্য চেষ্টা চালিয়েছে এ কথা মিথ্যা ও বানোয়াট। কেননা কিসিঞ্জারের সঙ্গে তদনীন্তন ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত টি.এন. কাউলের আলোচনায় কাউলের মনে এই প্রতীতিই জন্মলাভ করেছে যে, কিসিঞ্জারের ধারণা মুজিবকে বন্দি করে রাখা না হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঠেকানো যাবে না।[২৫] শুধু তাই নয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বানচাল করার জন্য তাঁর প্রয়াসের অন্ত ছিল না।[২৬]

৫.৬ সকল চক্রান্তের পাশাপাশি ১৯৭১ সনের ২৬শে অক্টোবর যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো মার্কিন সি.বি.এস. টেলিভিশন নেট ওয়ার্কের এক ইন্টারভিউ–এ একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। তিনি পাকিস্তান– ভারতের আসন্ন সংঘাত এড়ানোর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে, ইরানের শাহ আমাকে বলেছেন যে, তার এরকম ধারণা হয়েছে যে, ইয়াহিয়া খান যথেষ্ট নমনীয় হয়ে আসছে। অবশ্য আমি ইয়াহিয়া খানকে বলেছি যে, এটা শুধুমাত্র ভারত–পাকিস্তানের বিষয় নয় বরং এটা যদিও পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ বিষয় তবুও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্ন।[২৭]

৫.৭ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে লিফসুজ–এর সঙ্গে একটি তথ্য যোগ করে বলেছেন যে, মার্কিন উদ্যোগে ইরানের শাহের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের অজ্ঞান্তে মোশতাক চক্র পাকিস্তানের সঙ্গে একটি সমঝোতার কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল।

এ সব চক্রান্ত ফাঁস হয়ে পড়েছিল। তাই লক্ষ্য করা যায় ১৯৭১ সালের ২৭শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ পররাষ্ট্র সচিব পদ হতে মাহবুব আলম চাষীকে সরিয়ে নেন এবং তার স্থানে এ ফতেহকে উক্ত পদে নিয়োগ করেন।

৫.৮ মার্কিন প্রশাসন বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও কিসিঞ্জার স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে হতেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে বৈরী মনোভাব গ্রহণ করে স্বাধীনতাকে বানচাল করার যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। জুলাই মাসে হেনরি কিসিঞ্জার দিল্লী সফরের পর টি. এন. কাউল লিখেছেন,

"remember meeting him when he landed in Delhi, I found him entirely Pro-Pakistan, anti-India, anti Bangladesh when I first met him."[২৮]

৬. বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি চীনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয় ১১ই এপ্রিল পিপলস্ ডেইলিতে ও জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রতি চৌ-এন-লাইয়ের চিঠির মাধ্যমে। পিপলস্ ডেইলিতে সোভিয়েত প্রক্রিয়ার সমালোচনা করা হয় বাংলাদেশকে সমর্থনের জন্য। চৌ এন-লাই পাকিস্তানের 'জাতীয় স্বাধীনতা' ও 'রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব' রক্ষায় চীনের দ্ব্যর্থহীন সমর্থনের কথা জানান।[২৯]

৬.১ ১৯৭১ সনের জুন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে চীন প্রতিদিন একশতটি লরী ভর্তি সমর উপকরণ পাঠায়। এ ছাড়া অত্যন্ত অভিজ্ঞ সামরিক বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছিল[৩০] যাদের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে ব্যাপক গেরিলা–যুদ্ধবিরোধী প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬.২ শুধু তাই নয়, শুধুমাত্র ১৯৭১ সালেই চীন পাকিস্তানে সরবরাহ করেছিল ৪৫ মিলিয়ন ডলারের সমর উপকরণ।[৩১]

৬.৩ চীন পাকিস্তানকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল যার অধিকাংশই ব্যবহার হয়েছিল বাঙালির হত্যাযজ্ঞে। পাকিস্তানকে চীন সরবরাহ করেছিল দুটি পদাতিক বাহিনী গঠনের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক সামরিক উপকরণ। যার মধ্যে ছিল এ. কে. রাইফেল, হালকা ও মাঝারী মেশিনগান, ৬০ এম এম, ৮০ এম, এম, ১২০ এম, এম, মর্টার ও ১০০ এম. এম. ফিল্ডগান। এ ছাড়া ২২৫টি টি-৫৯ মাঝারি ট্যাঙ্ক যা ঢাকার রাস্তায় দেখা যেত।

৬.৪ পাকিস্তান বিমান বাহিনীর জন্য চীন ১ স্কোয়াড্রন ১১.২৮ বোমারু বিমান ও স্কোয়াড্রন মিগ-১৯ ছাড়াও চীন ১৯৭১ মার্চের পরে সরবরাহ করেছিল বহু সংখ্যক গান বোট ও উপকূলীয় যান।

৬.৫ বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পরও চীনের বৈরীতা শেষ হলো না। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পরই ঢাকাস্থ চীনা কনস্যুল অপিস বন্ধ করার কথা চীন পাকিস্তানকে জানিয়ে দেয়। ১৯৭২ সনের ২১ আগস্ট চীন বাংলাদেশের জাতিসংঘ সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে প্রথম ভেটো প্রয়োগ করে। ১৯৭১ সনের বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে চৌ-এন-লাই 'এক অন্তহীন যুদ্ধের সূচনা মাত্র' উল্লেখ করেছিলেন। তারই প্রেক্ষাপটে চীন 'বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান অস্থিতিশীল অবস্থা' অব্যাহত রাখার কৌশল গ্রহণ করে।[৩২]

৭. পশ্চিম জার্মানি ইরানের মাধ্যমে সরবরাহ করেছিল ৯০টি এফ-৮৬ স্যাবর

জেট এবং সরাসরি কোবরা ট্যাংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ফ্রান্ডা সরবরাহ করে, ৬টি আলুম এত-৩ হেলিকপ্টার, ২৪টি মিরেজ ৩টি ফাইটার ও ৩টি ডুবো জাহাজ।

৭.১ ইরান দিয়েছিল ২৪টি লকহিড সি-১৩০ হারকিউলিস পরিবহন বিমান।

৭.২ চীনের পাশাপাশি ইরান, সৌদি আরব ও লিবিয়া পাকিস্তানকে সমরাস্ত্র ও যুদ্ধের সময় বিমান বাহিনী দিয়ে সাহায্য করেছিল।

৮. বলাবাহুল্য বঙ্গবন্ধু হত্যার পূর্ব পর্যন্ত সৌদি আরব, চীন ও সুদান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেনি।

উল্লেখ যে, সুদান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাবেদার রাষ্ট্র, যেখানে রয়েছে মার্কিন সামরিক বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটিসমূহ।

# তৃতীয় অধ্যায়

## বঙ্গবন্ধু হত্যার পটভূমিকা : রাজনৈতিক দল

আমি নতুন পতাকা ওড়াবো ...

১. হত্যা, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কালোমেঘ ছিন্ন করে বাঙালি জাতি ছিনিয়ে আনল স্বাধীনতা।
পাকিস্তান কারাগার থেকে ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু
১০ই জানুয়ারি, ১৯৭২।
দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন।

১.১ ২১শে জানুয়ারি স্বদেশ ফিরতি পথে আসামের ফকিরগঞ্জে মওলানা ভাসানী এক জনসভায় বললেন ঃ
মিসেস গান্ধীর মতো দয়ালু মহিলা হয় না। ভারতের জনগণের সহানুভূতির কথা ভুলব না। বললেন ঃ স্বাধীন বাংলাদেশ ধর্ম-নিরপেক্ষ, গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।[১]

১.২ ২২শে জানুয়ারি, ১৯৭২।
মওলানা ভাসানী ভারত থেকে ফিরে এলেন স্বদেশের বুকে। শুরু হয়ে গেল নবতর খেলা।
১৯৭১ সনের ২১শে এপিল মওলানা ভাসানী বহু কাকুতি মিনতি করে চীনের চেয়ারম্যান মাও সেতুং ও প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইয়ের নিকট মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য পত্র লেখেন।[২] কিন্তু ইতিহাস বলে চীন নেতৃবৃন্দ সে পত্রের গুরুত্ব প্রদান করেননি।

১.৩ অথচ কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল মওলানা ভাসানী বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদলে বিভক্ত চৈনিক পন্থীদের 'মহান নেতা' বনে গেলেন। যদিও এই সব নেতাগণ মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি বিরোধিতা করেছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে পরাজিত চৈনিক প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই সখেদে বললেন ঃ ঢাকার পতন ভারতের বিজয়ের পথে অগ্রগতির স্বাক্ষর নয় বরং এশীয় উপমহাদেশে এক অন্তহীন যুদ্ধের সূচনামাত্র। ১৯৭১ সনের ১৭ই ডিসেম্বর পিকিং-এ তিনি বললেন ঃ ভারতীয়রাই পাকিস্তানের ঘাড়ে

তথাকথিত বাংলাদেশের ক্রীড়নক সরকারকে চাপিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি ১৯শে ডিসেম্বর পাকিস্তান থেকে ভুট্টো বললেন যে, এই অবস্থা চিরস্থায়ী নয়—পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য অঙ্গ।

২. এই ঘোষণার সাথেই সিরাজ শিকদারের পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি 'স্বাধীনতার নামে বাংলাদেশ ভারতের পদানত হয়েছে' বলে উল্লেখ করে এবং 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' কায়েমের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানায়। মওলানা ভাসানী ফিরে আসার পর বিরোধী রাজনীতিতে নেমে পড়েন। হক-কথা নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশনা শুরু করেন, যার সম্পাদক কলাবরেটর।

২.১ হক তোহা মতিন, আলাউদ্দিন, দেবেন শিকদার, শান্তি সেন, অমল সেন প্রমুখের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের নেতাগণ চীন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে হিংসাত্মক ও সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির পথ বেছে নেয়। মওলানা ভাসানী এদের নেতা সেজে 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' কায়েমের সুরে সুর মিলিয়ে ঘোষণা করলেন, "আমি নতুন পতাকা ওড়াবো।"

২.২ এই 'নতুন পতাকা ওড়ানো'র নেপথ্যে ক্রিয়াশীল ছিল স্বাধীনতা বিরোধীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তৎপরতা। পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো মওলানা ভাসানীকে আরো উসকে দেবার জন্য ১৯৭২ সনের ৮ই জুলাই মওলানা ভাসানীকে পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানান। শুধু তাই নয়, লন্ডন হয়ে বিশেষ দূত মারফত ভুট্টো মওলানা ভাসানীর নিকট পত্র প্রেরণ করেন- যেখানে ভুট্টো 'মুসলিম বাংলা' প্রতিষ্ঠার জন্য মওলানার সাহায্য কামনা করেন।[৩]

২.৩ স্বাধীনতা যুদ্ধের পরাজিত দেশদ্রোহী জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম ও পিডিপির নেপথ্য শক্তিকে আড়ালে রেখে মওলানা এই সব অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তির স্বপক্ষে কাজ করার জন্য গঠন করলেনঃ হুকমতে রব্বানী—এর লক্ষ্য চরম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি ও ভারত বিরোধিতা। মৌলনা ভাসানী বিভিন্ন সভা সমিতিতে প্রকাশ্যে হাত তুলে এদের সমর্থন জানিয়ে দোয়া করলেন। বললেন, "মুসলিম বাংলার জন্য যারা কাজ করছে তাদের আমি দোয়া করছি। আল্লাহর রহমতে তারা জয়যুক্ত হবে।"

বলাবাহুল্য মুসলিম বাংলার শ্লোগানটি ভুট্টো প্রদত্ত, যা ঐ সময়ে পাকিস্তান রেডিও থেকে প্রচারিত হতো। মওলানা ভাসানী দীর্ঘদিন ধরে প্রগতিশীল রাজনীতির কথা বলেছেন, নির্যাতন ভোগ করেছেন তিনি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অতি উগ্র বাম ও ডানপন্থীদের হাতে এবং জাতীয়

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করে গেলেন। রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে গৃহীত মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমুন্নত বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র বাতিল করার দাবী জানিয়ে মওলানা ভাসানী বললেন ঃ বাংলাদেশের সংবিধান অবশ্যই কোরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে প্রণীত হবে।[৪]

২.৪ শুধু তাই নয়, তিনি পল্টনের জনসভায় হুংকার দিয়ে বললেন ঃ বাংলাদেশকে আমি ভিয়েতনামে পরিণত করে ছাড়বো।

স্বাধীনতা যুদ্ধে বর্ণনাতীত ক্ষতিগ্রস্ত বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের কাজে যেখানে প্রয়োজন ছিল সহযোগিতা, সেখানে প্রকাশ্য জনসভায় মওলানা ভাসানী হুংকার দিতে থাকলেন ঃ আমি এ দেশে প্রতিবিপ্লব ঘটাবো।[৫]

৩. এর সঙ্গে যুক্ত হয় ভিন্নতর, সর্বনাশা এক সংকট। স্বাধীনতার পর ছাত্রলীগের মধ্যে মতপার্থক্য প্রবল হয়ে উঠল, তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা বিভক্ত হয়ে পড়েন।

তদানীন্তন ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট নূরে আলম সিদ্দিকীর সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র উত্তরণের হুংকার, অন্যদিকে আ, স, ম, রবের নেতৃত্বে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লম্পঝম্পে ছাত্রলীগ বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭২ সনের ২১শে জুলাই একই দিনে বঙ্গবন্ধু নূরে আলম সিদ্দিকী আহুত ছাত্রলীগের সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উপস্থিত হন। অন্যদিকে পল্টন ময়দানে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সশস্ত্র সংগ্রামের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দেয়া হলো।

৩.১ আওয়ামী লীগের ছাত্রফ্রন্টে—ছাত্রলীগের এরূপ ভাঙন অচিরেই শ্রমিক, কৃষক, মুক্তিযোদ্ধা ফ্রন্টগুলোতেও ব্যাপক ভাঙনের সৃষ্টি করে। পরিণতিতে ১৯৭২ সনের ৩১শে অক্টোবর 'বিপ্লবে পরিপূর্ণতা প্রদান ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার শ্লোগানে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়।

৩.২ বলাবাহুল্য জাসদ গঠিত হবার পর স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুরা বঙ্গবন্ধুর সরকারের বিরুদ্ধে জাসদকে ব্যবহার করে। স্বাধীনতা বৈরী পুঁজিপতি, শোষক শ্রেণী এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ স্ব-স্বার্থে জাসদকে অর্থ, সম্পদ, সাহায্য ও সহযোগিতা দিতে থাকে। মুজিব বাহিনী, মুক্তিযোদ্ধা ও তরুণ সমাজের একটি বিরাট অংশ জাসদের কাতারে এসে সামিল হয়।

ঐ সময়ে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এবং আসন্ন খাদ্য সংকটের মুখে ১৯৭৪ সনের জুলাই মাসে জাসদ কর্ণেল আবু তাহেরের নেতৃত্বে বিপ্লবী গণবাহিনী গঠন করে। তাহেরের সঙ্গে

যথা থ সংযোগ রক্ষা করে চলতেন সর্বহারা পার্টির মেজর জিয়া ও সেনাবাহিনীর ডেপুটি প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান।[৬]

৩.৩ গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের সুযোগ নিয়ে জাসদ প্রকাশ্যত অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালাতে থাকে। ১৯৭৪ সনের ২০শে জানুয়ারি এবং ৮ই ফেব্রুয়ারি জা াদ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে এবং বোমা ও গুলি চালায়। ১৯৭ঃ সনের ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে জাসদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করতে অগ্রসর হয় ও পুলিশের প্রতি গুলি বর্ষণ করে। ফলে পুলিশের পাল্টা গুলিতে তিন জন নিহত হয়, ১৮ জন আহত হয়। জনতা জাসদ অফিস পুড়িয়ে দেয়। জাসদ হাইকমান্ড এমনি অবস্থায় সর্বত্র নির্দেশ পাঠায় সশস্ত্র প্রতিরোধের। সমগ্র দেশে শুরু হয়ে যায় খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, হাইজাকিং। আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

৩.৪ ১৯৭৪ সনের স্মরণাতীত কালের প্রচণ্ড বন্যায় দেশে ব্যাপক ফসল হানি ঘটে। দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যায়। এই সুযোগে সকল আন্ডার গ্রাউন্ড সশস্ত্র দলগুলো তাদের কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটায়। ১৯৭৪ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতিকর পরিস্থিতির উল্লেখ করে এক বেতার ভাষণে বলেন, "তিন হাজার আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের হত্যা করা হয়েছে—হত্যা করা হয়েছে চার জন জাতীয় সংসদ সদস্যকে।" ২৮শে ডিসেম্বর সমগ্র দেশে জরুরি অবস্থা জারী করা হয়।

৩.৫ এই সময়ে জাসদ সশস্ত্র গ্রুপ-সমূহের সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৩.৬ জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর দেশে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে থাকে চাল ডাল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম হ্রাস পেতে থাকে। সন্ত্রাসবাদী উগ্রপন্থী সশস্ত্র-গ্রুপ ও দল আত্মরক্ষার জন্য ডিপ আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যায়! সে জন্য পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৭৪ সনের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণহানির সংখ্যা একশ'র বেশি নয়। অথচ জরুরি অবস্থা জারীর পূর্বের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। বাকশাল গঠিত হওয়ার পর জাসদ জনগণের প্রতি সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতির আহ্বান জানায়। তাদের প্রচারপত্রে বলা হয়, গণতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে এই সরকারকে অপসারণের আর কোনো পথ খোলা না থাকায় সশস্ত্র বিপ্লবের পথেই শাসন ক্ষমতা দখল করতে হবে। জাসদ বিপ্লবী গণবাহিনীতে যোগদানের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানায়।

৩.৭ পরবর্তীকালে দেশবাসীর প্রতি মেজর জলিল ও আ, স, ম, রবের এক

যৌথ বিবৃতিতে স্বীকার করা হয় যে, শেখ মুজিবের ফ্যাসীবাদী কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য খুবই গোপনে অথচ তৎপরতার সাথে গড়ে তোলা হয় সারা দেশব্যাপী মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক প্রাক্তন সৈনিকের সমন্বয়ে বিপ্লবী গণবাহিনী। অতি গোপনে সংগঠিত করা হয় বাংলাদেশে প্রতিটি সেনানিবাসের সৈনিক ভাইদেরকে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার' মাধ্যমে।[৭]

৩.৮ শুধু তাই নয় সশস্ত্র লড়াই সংগঠিত করতে জাসদ নেতৃত্বে সি.আই. এর লোক বলে কথিত জনৈক পিটার কাস্টারের নিকট হতে ৪০ লক্ষ টাকা গ্রহণ করে।[৮]

৪. ১৯৭৪ সনের খাদ্য সংকটকে সামনে রেখে ১৪ই এপ্রিল ন্যাপ ভাসানী, জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ গণমুক্তি ইউনিয়ন, বাংলাদেশ কমুনিস্ট পার্টি (লেলিনবাদী) শ্রমিক-কৃষক সাম্যবাদী দল সম্মিলিতভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। তারা ৩০শে জুন জনসভা আহ্বান করে। ২৯শে জুন রাতে মওলানা ভাসানীকে টাঙ্গাইলে তাঁর স্বগৃহে তাঁর ইচ্ছে অনুসারে আটক রাখা হয়, জনসমর্থন না পেয়ে যুক্তফ্রন্ট অকেজো হয়ে পড়ে। মওলানা ভাসানী তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বঙ্গবন্ধুর সরকারের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপনে সে অবস্থাতেও ক্ষান্ত হয়নি।

৫. অন্যদিকে পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি পূর্ববাংলার সাম্যবাদী দল (এম. এল) পূর্ববাংলার কমুনিস্ট পার্টি (এম. এল), পূর্ব পাকিস্তান কমুনিস্ট পার্টি প্রকাশ্য ও গোপন তৎপরতা চালায়। তারা আন্ডারগ্রাউন্ড নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে, ক্যাডারদের সশস্ত্র করে, গেরিলা কায়দায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর আঘাত হানে, বিপ্লবের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে স্বাধীনতার স্বপক্ষের বিশেষ করে আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীকে খুন করে, শস্য লুট করে, ব্যাংক ডাকাতি করে এবং থানা লুটের মতো কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে আইন-শৃঙ্খলা ও জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। হাট-বাজার, রেলওয়ে, গ্রামে সর্বত্র ডাকাতি শুরু করে। তারা-রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণ করে। এই সব অতি উগ্রপন্থী দল ১৯৭৪ সনের জুন-নভেম্বর মাসে কমপক্ষে ১০০ বার পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।[৯]

৫.১ স্বাধীনতার পরপরই এই অতি উগ্র চীনপন্থী দলগুলো কখনো 'স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ' কখনো 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' কখনো 'মুসলিম বাংলার' শ্লোগান দিয়ে চীন-পাকিস্তান প্রদত্ত অস্ত্র নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে উৎখাতের জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে। তোয়াহা ও তার সহযোগী আবদুল হক চীনা নীতির সমর্থক হিসেবে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখা তাদের পবিত্র কর্তব্য

বলে ঘোষণা করে।[১০]

৫.২ নাশকতামূলক কার্যক্রম জনমনে আতংক সৃষ্টি করে। প্রতিদিনই গোপন হত্যা, কিডন্যাপিং, হাইজ্যাক, ডাকাতি খবরের কাগজে ফলাও করে প্রচারিত হতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর সরকার গঠনের পর হতে; অর্থাৎ ১৯৭২ সনের জানুয়ারি হতে ১৯৭৩ সনের জুন পর্যন্ত এক সরকারি হিসাবে দেখা গেছে ঐ সময়কালে ২০৩৫টি গোপন খুন, ৩৩৭টি কিডন্যাপিং, ১৯০টি ধর্ষণ, ৪৯০৭ ডাকাতি এবং ৪০২৫ ব্যক্তি ঐ সমস্ত উগ্রপন্থী দুষ্কৃতিকারীদের হাতে প্রাণ হারায়।[১১]

৫.৩ ১৯৭৪ সনে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। পরিসংখ্যানে জানা যায়, জাসদের গণবাহিনী, চৈনিকপন্থী সশস্ত্র দল ও গ্রুপ এবং স্বাধীনতা বিরোধী উগ্রপন্থী চক্র মিলে ১৫০টি ছোট বড় হাট-বাজার, অর্ধশতাধিক ব্যাংক, প্রায় দুই ডজন থানা ও ফাঁড়ি লুট করে। গ্রামেগঞ্জে হাজার হাজার ডাকাতি ঐ সময়ে সংঘটিত হয়।[১২]

৫.৪ শুধু তাই নয়, তারা দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করার জন্য ব্যাপক নাশকতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। দেশের জাতীয় সম্পদ পাটের গুদামে আগুন লাগিয়ে দেয়। ১৯৭৪ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক নির্মিত ঘোড়াশাল সার কারখানার কন্ট্রোল রুমটি এ সব উগ্রপন্থীরা বড় রকমের বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়। তদন্ত কমিটির হিসেবে জানা যায়, সার কারখানার এই নাশকতামূলক কার্যক্রম অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ হাতের কাজ। এই বিস্ফোরণে ক্ষতি হয় বৈদেশিক মুদ্রায় ১৫০ মিলিয়ন টাকা। দশ মাস পর্যন্ত এই কারখানা উৎপাদন অক্ষম হয়ে পড়ে। সারের বন্টন হ্রাস পেয়ে গেল বছরে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টন থেকে ১৯৭৪/৭৫ সনে মাত্র ২ লক্ষ ৮০ হাজার টন; এক লক্ষ টন কম। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়।[১৩]

৫.৫ বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সনের ৩০শে নভেম্বর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলে ৩৬৪০০ পাকিস্তানী দালাল মুক্তি লাভ করে।[১৪] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ১লা ডিসেম্বর এ তথ্য প্রকাশ করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি লাহোর ইসলামী সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু যোগদান করেন।

প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানী দালাল নেতাদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর মনোভাব কোনো সময়ই কঠোর ছিল না। একটি উদাহরণ দিলেই দালালদের সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর মানসিকতা কি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করার জন্য

শাহ আজিজুর রহমান পাক-প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘে গিয়েছিলেন। শাহ আজিজুর রহমানের পত্নী বঙ্গবন্ধুর সংগে দেখা করলে বঙ্গবন্ধু শাহ আজিজের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত মাসিক ৫০০ টাকা করে বরাদ্দ করেন।[১৫]

অনুরূপভাবে খাজা খায়েরউদ্দিনকে বঙ্গবন্ধু জেল হতে বের করে নিজের কাছে নিয়ে এসে, তাকে খাওয়ায়ে টিকেট কিনে, পাকিস্তানে প্রেরণ করেন। অথচ এই খাজা খায়ের উদ্দিন ছিল শান্তি কমিটির প্রধান। সবুর খান সম্পর্কে এরূপ সদয় ব্যবহারের কথা বাজারে চালু আছে। অর্থাৎ পাকিস্তানী দালাল নেতাদের সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু কোমল মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন।

৫.৬ কিন্তু পাকিস্তানী দালালগণ বঙ্গবন্ধুর এ মহানুভবতাকে দুর্বলতা ভেবেছে। ফলে স্বভবতই সাম্প্রদায়িক শক্তি এ দুর্বলতার আড়ালে নিজেদের সংগঠিত করেছে। সে জন্য লক্ষণীয় মুসলিম লীগ, পিডিপি, নেজামে ইসলাম, জামাতে ইসলামী প্রভৃতি বেআইনী ঘোষিত দলগুলোর এক শ্রেণীর নেতা ও কর্মী চাঁদ তারা মার্কা পতাকা নিয়ে জাতীয় গণতন্ত্রী দল গঠন করে। এদের এক সভায় ভারতের 'রাহুগ্রাস' হতে বেরিয়ে এসে ইসলামী সম্মেলনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানানো হয়। সারা দেশে মসজিদে মসজিদে ও ধর্মীয় সভা সমাবেশে তারা প্রচণ্ডভাবে ভারত বিরোধিতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ বঙ্গবন্ধুর সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালায়। এমনকি তাদের অবস্থান সম্পর্কে তারা আস্থাশীল হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত আলবদর ও দালালদের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করে। কবি দাউদ হায়দারের একটি কবিতায় হযরত মোহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে অশালীন উক্তির অজুহাতে সারাদেশে এটিকে উপলক্ষ্য করে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র চরম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং নিজেদের অবস্থানকে পাকাপোক্ত ও শক্তিশালী করে নেয়।

৬. এমনি অবস্থায় বঙ্গবন্ধুকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগও উপদলীয় কোন্দলের এক সর্বনাশা খেলায় তৎপর হয়ে ওঠে।

১৯৭৩ সনের জাতীয় সংসদের নির্বাচনে পর পরই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মধ্যে উপদলীয় কোন্দল চমরভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, যা প্রকারান্তরে বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তিকে বহুলাংশে ক্ষুণ্ন করে।

৬.১ এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জেলায় জেলায় ক্ষমতাসীন চিহ্নিত আওয়ামী লীগ নেতাদের বিশেষ বিশেষ বাহিনী, লাল বাহিনী জনগণের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। তদের সন্ত্রাসে জনগণ প্রতিবাদহীন আক্রোশে হয়েছে নির্বাক নিশ্চুপ।[১৬]

শুধু তাই নয়, কেন্দ্রে মনি-তোফায়েল উপদলীয় কোন্দলের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্নভাবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ১৯৭৪ সনের এপ্রিলে সূর্যসেন হলের ৭ জন ছাত্রের নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

বঙ্গবন্ধু তখন অসুস্থ। মস্কোয় চিকিৎসাধীন। ১৯শে মার্চ থেকে ১১ই এপ্রিল। মাঝখানে তিন সপ্তাহ। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মুনসুর আলী বলতেন, এই পরিকল্পিত ছাত্র হত্যা ছিল একটি গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। যার লক্ষ্য বঙ্গবন্ধুর সরকারের উৎখাত।

৬.২ ক্ষমতার কোন্দল সবাইকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। গমিরুদ্দিন প্রধান পাকিস্তান পন্থী ও আইয়ুব-ইয়াহিয়ার বিশ্বস্ত এবং কলাবরেটর– তার পুত্র সফিউল আলম প্রধান ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট হল, দুর্নীতি উচ্ছেদের নামে মনি ও তোফায়েল গ্রুপের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। সূর্যসেন হলে ৭ জন ছাত্র হত্যাকাণ্ডের পেছনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথিত কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র ছিল– একদিন তা উদ্‌ঘাটিত হবে।

এই হত্যাকাণ্ড বঙ্গবন্ধুর তৎকালীন রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমদের নির্দেশে সংঘটিত হয়েছিল বলে যুবলীগ প্রধান ফজলুল হক মনি বারবার অভিযোগ করেছেন।

এ ভাবে এ সব দলীয় হত্যাকাণ্ড বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তিকে বহুলাংশে হ্রাস করেছিল সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, কন্‌ফিডেনসিয়াল ডায়রিতে বলা হয়েছে, 'মনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো।' তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা বলুনতো বাংলাদেশে স্পাই–এর কাজ কে করে?

আমি জানিনে। স্পাই–এর খোঁজ খবর রাখা আমার কাজ নয়। আমি বেশ ছোট, কিন্তু স্পষ্ট জবাব দিলুম।

কিছুদিন যাবত শুনছি কতকগুলো বিদেশী দূতাবাসে সাংবাদিকরা খুব যাতায়াত করছে। এম্বাসী থেকে এদের জন্য বিলেতী মদ আসে, আরো কত কী? এবার শুনুন আমি কাকে সন্দেহ করি। প্রথমত আপনার ঐ বন্ধু এনায়েতুল্লাহ, তোফায়েল আহমদ, তাহেরুদ্দিন ঠাকুর এরাই সবাই বিদেশী গুপ্তচর।"[১৭]

বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তিকে দুর্বল করার অর্থই হলো শত্রুদের হাতকে শক্তিশালী করা। তোফায়েলের প্রোটেক্‌শনে সফিউল আলম প্রধান কি সেই পথ বেছে নিয়েছিল? পরবর্তী রাজনীতিতে শফিউল আলম প্রধানের অবস্থান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুনসুর আলীর ধারণাকেই কি সমর্থন করে না?

# চতুর্থ অধ্যায়

## মুজিব হত্যার হাতিয়ার লজ্জাহীন মিথ্যাচার—১

১. ঐ সমস্ত অতিউগ্র বামপন্থী দলগুলো গোপনে সশস্ত্র দল, স্কোয়াড গঠন করতে থাকে। থানা, ব্যাংক লুট করা হয়। খুন-হত্যা, রাহাজানি, ডাকাতি জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

১.১ পাশাপাশি তাদের 'মাস ফ্রন্টের' রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ১৯৭২ সন হতে ১৯৭৪ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিনা বাধায় চলতে থাকে। রাজনীতির নামে ডাকাতি, রাজনীতির নামে লুট, রাজনীতির নামে হাইজ্যাকিং অবাধে অগ্রসর হয়। ১৯৭২ সনে গৃহীত শাসনতন্ত্রের উল্লেখিত মৌলিক অধিকারসমূহের অবাধ সুযোগ নিয়ে ঐ সমস্ত দল ও চক্র অজস্র বানোয়াট মিথ্যাচারসমূহ বিভিন্নভাবে প্রচার করে জনগণকে সার্বিকভাবে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়। ঐ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো যে সমস্ত মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার পটভূমিকায় তার উল্লেখ প্রয়োজন এ জন্য যে, এ থেকে বোঝা যাবে ঐ সমস্ত দলগুলো সকল ন্যায়বোধ, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে শুধু গুজব আর মিথ্যাচার দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার কৌশল গ্রহণ করেছিল।

১.২ এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যদিয়ে যে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানো হয়েছিল জনগণের একাংশের মনে তার প্রতিক্রিয়া কখনই একেবারে মুছে যায়নি। ভারত সম্পর্কে একটা অহেতুক ভীতি ও হিন্দু বিদ্বেষ উসকে দিয়ে গণ-অসন্তোষকে তীব্রতর করা এবং তা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য মওলানা ভাসানী শাণিত কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরপরই বিভিন্ন সময়ে যে স্বাধীনতা বৈরী শক্তি, 'হলিডে চক্র' মওলানা ভাসানীকে সামনে রেখে ও নেতৃত্ব মুক্তিযোদ্ধার ভাবমূর্তি নিয়ে মিথ্যাচার প্রচার করেছিল তার প্রধান বিষয়সমূহ ছিল—

ক. ভারত বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংস করার মতলবে গোপনে বিপুল অংকের জাল নোট বাজারে ছেড়েছে।

খ. বাংলাদেশের শিল্প কারখানার কলকব্জা ভারতে পাচার করা হয়েছে।

গ. বাংলাদেশের সব গাড়িকে পাচার করা হয়েছে।

ঘ. বাংলাদেশ হতে ৬০০০ কোটি টাকার সম্পদাবলী ভারতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং সর্বোপরি যে অভিযোগটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত ছিল, তা হলো—

ঙ. ভারতের সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করে বঙ্গবন্ধুর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিয়েছে।

চ. মুজিব ভারতের পুতুল সরকার এবং বাংলাদেশ ভারতের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

ক. প্রথমেই আসা যাক জাল নোট প্রসঙ্গে। একটা গুজব রটে গেল যে, বঙ্গবন্ধুর সরকার ভারত সরকারকে যে পরিমাণ নোট ছাপাতে দিয়েছিল ভারত সরকার ইচ্ছেকৃতভাবে দেশের অর্থনীতিকে দেউলিয়া করে দেবার জন্য তার দ্বিগুণ নোট ছাপিয়েছে। এ সময় একই নম্বরের দুই একটি নোট পাওয়া যাচ্ছিল এবং সংবাদপত্রে তা ছাপা হচ্ছিল। অন্যদিকে টাকার মূল্যও কমে যাচ্ছিল শীঘ্র ভারতীয় নোট বাজার থেকে তুলে নেয়া হোক। বঙ্গবন্ধুর সরকার ভারতীয় নোট প্রত্যাহারের জন্য এক মাস সময় দিলেন। শুরু হয়ে গেল অপপ্রচার। বলা হলো আওয়ামী লীগ নেতাদের লক্ষ লক্ষ টাকা ভারতে রয়েছে তা বদলানোর জন্যই এত দীর্ঘ সময় দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানের নোট অচল ঘোষণায় মাত্র ৫ দিন সময় দেয়া হয়েছিল। আর ভারতীয় নোট প্রত্যাহারের জন্য প্রথমে ১ মাস ও পরে আরো ১৫ দিন সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

এই মিথ্যা অভিযোগের জবাবে অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দিন সাহেব বললেন যে, পাকিস্তানের টাকার ব্যাপারটা হলো ডিমনিটাইজেশন ভারতের টাকার ব্যাপারটা হলো উইথড্রয়াল, প্রথমটা হলো নির্দিষ্ট তারিখের পর অচল ঘোষণা আর পরেরটা হলো ভারতীয় সমস্ত টাকা প্রত্যাহার করে নেয়া। তিনি বললেন, ভারত থেকে মোট ৩৫০ কোটি টাকার নোট ছাপানো হয়েছে। সত্যিই ভারত নির্দেশিত ৩৫০ কোটি টাকার বেশি নোট চেপে বাজারে ছেড়েছে কিনা সেটা আমি জানতে চাই। লম্বা সময় দিলাম যাতে সমস্ত নোট জমা হতে পারে এবং আমরা প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে পারি। ৩৫০ কোটি টাকার বেশি নোট জমা হলেই আমরা ভারত সরকারকে দায়ী করে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারব। অন্য প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, এক টাকার নোট এত বিপুল পরিমাণ হওয়ায় নম্বরে দুই একটি ত্রুটি হতে পারে।[১]

১৯৭৩ সনের ৩১ মে ভারতে মুদ্রিত টাকা জমাদানের তারিখ অতিবাহিত

হলে দেখা গেল বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মূলত ইস্যুকৃত মোট অংকের চাইতে ৫৩ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৮০ টাকা কম জমা পড়েছে। এতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, দ্বিগুণ ছাপা বা নোট ছাড়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ গুজব। কিন্তু স্বাধীনতা বৈরীদের ব্যাপক প্রচারে বঙ্গবন্ধু ও তার সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে বিভ্রান্ত করার এটা ছিল এক মোক্ষম হাতিয়ার।

খ. জাসদ, হলিডে চক্র এবং মওলানা ভাসানী এবং স্বাধীনতা তৈরি শক্তিসমূহ পচার করতে থাকে যে, মুক্তিবাহিনীর সাথে বাংলাদেশে যে মিত্র বাহিনী প্রবেশ করেছিল তারা যাবার সময় শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে সকল কলকব্জা খুলে নিয়ে গেছে। ফলে দেশব্যাপী শিল্প উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশে তথা পূর্বপাকিস্তানের শিল্পকারখানার অধিকাংশ মালিকই ছিল তখন পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিগণ। সরকারের এক জরিপে দেখা গেছে, পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতি ও বিরাট কারবার প্রতিষ্ঠান ওয়ালারা বাংলাদেশ থেকে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, বাংক আমানত ও নগদ অর্থে ৭৮৫ কোটি টাকা সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বহুক্ষেত্রে শিল্পপতিরা সমগ্র কারখানা বা কলকব্জা অংশে অংশে খুলে পাকিস্তানে পাচার করছে। ফলে স্বাধীনতার পর পরই অনেক শিল্প কারখানা চালু করা সম্ভব হয়নি।

এই প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে সারা দেশে ভারতের উপর এ সব দোষ চাপানো হলো এবং ভারত বিরোধী প্রচার চালানো হলো।

গ. মওলানা ভাসানী অভিযোগ করেন যে, কলকাতার রাস্তায় বাংলাদেশের মোটর যানে ভর্তি হয়ে গেছে। কথাটির ভিত্তি মিথ্যার উপর দাঁড় করানো। স্বাধীনতা যুদ্ধে কেউ কেউ গাড়ি নিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। এই সকল গাড়িকে সনাক্ত করে কলকাতা পুলিশ WJB সংকেতে পৃথক নম্বর দিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হলে দেশে প্রত্যাগমনের সময় ঐ সকল গাড়ি তারা সংগে নিয়েই বাংলাদেশে ফিরে আসে।

ঘ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পদ স্থানান্তর কতটুকু হয়েছে বা না হয়েছে এ কথা বিচার–বিশ্লেষণ না করেই অভিযোগ করা হয়েছে ৬০০০ কোটি টাকার মালামাল ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছে।

সরকারি পর্যায়ের লেনদেনের হিসাবে বিশ্বব্যাংক ১৯৭৬ সালে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭২ সনের জানুয়ারি হতে ১৯৭৫ সনের জুন পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশকে সাহায্য দিয়েছে ১৩৫ কোটি টাকারও বেশি।[২]

বে-সরকারিভাবে যদি ধরেও নেয়া যায় ব্যাপক চোরাচালান রয়েছে, তা হলেও বলতে হয় চোরাচালান সব সময়ই দ্বিমুখী। তাছাড়া কেমব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডব্লু বি বেডডাওয়ে প্রণীত আরেকটি গবেষণামূলক নিবন্ধে দাবী করা হয় এ ধরনের চোরাচালান ও চোরা কারবারের পরিধি ও পরিমাণ কখনই বিপুল হয় না।

১৯৭৫ সনে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর চাল, পাট ও অপর কয়েকটি সামগ্রীর দাম কমে যাওয়ায় ঢাকার শাসক চক্র বলে যে চোরাচালান দমনেই এ ফল অর্জন করা গেছে। প্রকৃত ঘটনা হলো ঐ সময় বাংলাদেশে ও ভারতে বিপুল ফসল উৎপাদিত হয়। বিশ্বজুড়ে খাদ্য শস্যের দামও তখন হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৩ সনে তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে যে ভয়াবহ বিশ্ব মুদ্রাস্ফীতি ও সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তখন ধাতস্থ হয়ে এসেছে।

ঙ. উগ্র ডান ও বামপন্থী এবং স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি অত্যন্ত জোরে প্রচার চালায় যে বঙ্গবন্ধুর সরকার ভারতের সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নেই, বাংলাদেশ ভারতের তাবেদার রাষ্ট্র বৈ কিছু নয়। বলাবাহুল্য আন্তর্জাতিক বিশ্বে এমনি ধরনের প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছিল পাকিস্তান, সৌদি, চীন মার্কিনসহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ। বঙ্গবন্ধু হত্যার দশ বছর পরও আজ পর্যন্ত মোশতাক, সায়েম, জিয়া, সাত্তার ও এরশাদ এ সব বঙ্গবন্ধু বিরোধী শাসকগণ সেই কথিত গোপন চুক্তি জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারেনি বা এমন কিছু তথ্য উপস্থাপন করতে পারেনি যার ফলে জনগণ বুঝতে পারে সত্যিই এ ধরনের চুক্তি ছিল। ১৯৭২ সনের ১৯শে মার্চ ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে এসে ২৫ বছরের বাংলাদেশ–ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বলাবাহুল্য এটা কোনো গোপন চুক্তি নয়, প্রকাশ্য চুক্তি যা পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহায়তা, সার্বভৌমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ এই প্রকাশ্য চুক্তিকেই গোপন চুক্তি বলে অপপ্রচার চালানো হয়েছিল। এই চুক্তি যদি দিল্লীর নিকট দাসখত বলে প্রমাণিত হয় তাহলে বঙ্গবন্ধু পরবর্তী 'দেশপ্রেমিক শাসককুল' এই চুক্তিকে বাতিল করছেন না কেন? চুক্তিটি সম্পর্কে এখনো স্বাধীনতা বিরোধী চক্র অপপ্রচার করে থাকে। সে জন্য পুরো চুক্তিটি পরিশিষ্টে প্রদত্ত হলো। বলাবাহুল্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের মধ্যে সম্পাদিত এই চুক্তিটি সোভিয়েত ইউনিয়ন–ভারতীয় চুক্তির অনুরূপ।

চ. বাংলাদেশ মুক্ত হবার পর পরই মওলানা ভাসানী, জাসদ, অতি বাম, চৈনিকপন্থী দল ও তার সহযোগীরা বলতে লাগলেন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ভারতীয় নেতাদের হাতে পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়, ভারতের আঙ্গুলি হেলনেই তারা চলে।[৩]

আজো শেখ মুজিব ও মুজিব অনুসারীদের ভারতের দালাল হিসেবে তুলে

ধরার চেষ্টা করা হলেও এ পর্যন্ত এ সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেই প্রমাণিত হচ্ছে। জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ ও জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনসমূহে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য বঙ্গবন্ধুকে শোষিত বিশ্বের মহান নেতৃত্বের প্রথম সারিতে উন্নীত করেছিল।

দিল্লীর অনীহা সত্ত্বেও ইসলামিক সম্মেলনে পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর গমন ও সদস্যপদ লাভ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে সক্রিয় সদস্য এবং সৌদি আরবসহ মুসলিম জাহান ও চীনের মতো পাকিস্তানের পয়লা নম্বর দোস্তদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বারবার চেষ্টার কথা স্মরণ রাখলে বঙ্গবন্ধুর নীতি যে ভারতের লেজুড় বৃত্তি ছিল না তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। বঙ্গবন্ধু পরিচালিত সরকারের পররাষ্ট্র নীতি যে দিল্লীর আঙ্গুলি নির্দেশে চলত না অথবা দিল্লীর তাবেদার ছিল না সে জন্যই এখানে প্রাসঙ্গিক ঘটনা তুলে ধরা প্রয়োজন। যতদূর মনে পড়ে ১৯৭৩ সনের অক্টোবর মাসের কথা।

পার্লামেন্টের সাব কমিটি রুমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা জন কয়েক কাজ করছিলাম। তখন বিকেল হয়ে এসেছে। এমন সময় হঠাৎ করে বঙ্গবন্ধু ঘরে ঢুকলেন। দেখলাম বিশাল ব্যক্তিত্বশালী চেহারায় যেন আগুন ঝরে পড়ছে। বুঝলাম কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু কি হয়েছে বুঝতে পারলাম না। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে। বঙ্গবন্ধু বললেন, "ইউ সি, বৃহৎ প্রতিবেশীর নিকট ক্ষুদ্র প্রতিবেশী থাকলে স্বভাবতই ডমিনেন্স এসে যায়। বাংলাদেশের ব্যাপারে এটা হতে পারে না।" এই বলে ক্রোধোদ্দীপ্ত বঙ্গবন্ধু প্রস্থান করলেন।

এমনকি ঘটনা ঘটেছে যার ফলে বঙ্গবন্ধু এ কথা বললেন—এটা জানার ঔৎসুক্যে ঐ দিন রাতে আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এম, মনসুর আলীর বাসায় যাই এবং জানতে পারি বরিশাল সমুদ্র এলাকার তেল খননকারী স্ট্রাকচার ইণ্ডিয়ান গানবোট এসে ভেঙ্গে দিয়েছে। জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে তাঁর দেশপ্রেম ছিল তুলনাহীন, কিন্তু দেশদ্রোহীগণ গোয়েবলসীয় প্রচারকেও হার মানিয়েছিল।

১.৩ কিন্তু এত সব মিথ্যা প্রচারে জনগণ বিশ্বাস না করলেও তারা যে বিভ্রান্ত হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায় এবং এ সব মিথ্যা প্রচারের কিছু ভিত্তিও তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং রক্ষীবাহিনী গঠন। সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তির ফলে সেদিনের সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশ কতখানি উপকৃত হয়েছিল বা হয়েছিল না, সে বিচারের চাইতে প্রচার হতে লাগল—গেল, গেল সবই গেল, ভারতে চলে গেল। আসলে প্রকৃত ঘটনা তলিয়ে দেখবার মতো অবস্থা সেদিন সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত অস্থির

জনগোষ্ঠীর ছিল না।

অন্যদিকে রক্ষীবাহিনী নিয়েও নানা কথা প্রচার হতে থাকল। যেমন রক্ষীবাহিনীর পোশাক ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোশাকের মতো। রক্ষীবাহিনীর ট্রেনার ভারতীয় অফিসাররা এবং রক্ষীবাহিনীকে দ্রুত গড়ে তোলা হচ্ছিল, তাদের জন্য নতুন ব্যারাক তৈরি হচ্ছিল। ১৯৭২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে রক্ষীবাহিনী গঠনের সময় হতে ১৯৭৫ সনের মধ্যে রক্ষীবাহিনীর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ হাজার। ফলে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বিক্ষোভ, ঈর্ষা এবং বিভ্রান্তি দানা বাধতে থাকে।

কিন্তু তদানীন্তন রাজনৈতিক, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এবং দেশকে সেই বিশৃঙ্খল প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা ঠেকাতে রক্ষীবাহিনীর গঠন অনস্বীকার্য ছিল। সেনাবাহিনীকে দল মতের উর্ধ্বে সম্মানে রাখার জন্যই; দৈনন্দিন অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলার প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর ব্যবহার কখনও যুক্তিযুক্ত নয়।[৪]

বাংলার দামাল মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সংগঠিত হয়েছিল রক্ষীবাহিনী, তাদের বিরুদ্ধে চালানো হলো অপপ্রচার। লক্ষ্য সেনাবাহিনীর ভেতর অসন্তোষ জাগিয়ে তোলা এবং রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে জনমনে ভীতি ও বিভ্রান্তি জাগিয়ে তোলা।

## মুজিব হত্যার হাতিয়ার
## খাদ্য সংকট : চক্রান্ত-২

১. পর পর দুই বছর প্রচণ্ড বন্যা, অনাবৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির ফলে ১৯৭৪ সনে বাংলাদেশে খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। বিশ্বে তেলের মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে ১৯৭৪-এর পূর্বেই মুদ্রাস্ফীতি চরম আকার ধারণ করেছিল। বিশ্ব মুদ্রাস্ফীতির ধাক্কায় বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা নিঃশেষিত। এমনি অবস্থা দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা গেল। বঙ্গবন্ধু বিশ্বের দরবারে খাদ্য ক্রয়ের জন্য প্রাণান্তক প্রচেষ্টা চালালেন। অবস্থার দ্রুত অবনতি দেখে সোভিয়েত ইউনিয়ন ত্বরিত গতিতে খাদ্য সাহায্য করে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল নগণ্য। বঙ্গবন্ধু হাজারো প্রয়াস নিয়েও খাদ্য সংকট ঠেকাতে ব্যর্থ হলেন। দেশের উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেল। ২৭ হাজার লোক অনাহারে মৃত্যু বরণ করলেন।

১.১ ১৯৭৪ সনের ঘটনা। অক্টোবর।

তখন অনাহারে মৃত্যুর খবর আসছে।

বঙ্গবন্ধু প্রাণান্তক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

সে দিন বিকেল ঘনিয়ে এসেছিল ...।

গণভবনে গেলাম। দেখলাম উত্তরাঞ্চলীয় সংসদ সদস্যদের কয়েকজন উপস্থিত। তার মধ্যে জনাব লুৎফর রহমান সাহেব রংপুর এলাকার দুর্দশার কথা বলেছিলেন। অনাহারী মানুষের কথা, মৃত্যুর কথা, বেদনার কথা।

বঙ্গবন্ধুর চোখে পানি।

দুই হাতে মুখ ঢাকলেন।

তাঁর বিষণ্ন মুখের দুই পাশ ঘিরে অবিন্যস্ত কাঁচাপাকা চুলরাশি। অসহায়। বিপর্যস্ত। বেদনার্ত বিশাল একটি মানুষ। রক্তাক্ত হৃদয়।

১.২ কেন এই দুর্ভিক্ষ?

অনেক গবেষকই অভিযোগ করেছেন দেশে যে খাদ্য ছিল তা সুষ্ঠু বিলিবণ্টন হলে বহু লোকের প্রাণ বাঁচানো যেতো। অভিযোগটির সত্যতা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ-বিতর্কিত। তবু একটি কথা এখানে বিরাট প্রশ্নের

আকারে আজো আমাকে আলোড়িত করে, আর তা হলো খাদ্য বিভাগ সেদিন সময়মতো ও দ্রুত খাদ্য সরবরাহে ব্যর্থ হয়েছিল কেন? কেন এই দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস পূর্বাহ্নেই জানানো ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়নি? সে সময় খাদ্য সচিব ছিলেন আবদুল মোমেন খান। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর যিনি জিয়াউর রহমানের মন্ত্রী সভায় খাদ্য মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। যে ব্যক্তি খাদ্য সচিব হিসেবে ১৯৭৪ সনে ব্যর্থ হলেন, তিনিই ১৯৭৫ সনের বঙ্গবন্ধু হত্যার পর কেন ব্যর্থতার পুরস্কার লাভে ধন্য হলেন? কেন? এখানে কোনো জাতীয় ষড়যন্ত্র ছিল কি?

১.৩ খাদ্য বিভাগের এই জাতীয় ব্যর্থতা ও ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মানুষদের নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি জঘন্য ষড়যন্ত্রে মেতেছিল তার প্রমাণ এখন উদ্‌ঘাটিত। কাউন্সিল অফ ফরেন রিলেসন্স (নিউইয়র্ক)– এর জর্নাল ফরেন এফেয়ার্সের ১৯৭৬ সনের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে ১৯৭৪ সনে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার শেখ মুজিব ও তার সরকারকে দুর্বল করার জন্য কিভাবে তার খাদ্য রপ্তানি নীতিকে ব্যবহার করেছে। 'ফুড পলিটিক্স' শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধে এমারথ চাইল্ড লিখেছেন– সি. আই. এ 'খাদ্যই শক্তি' এই নব্য মতবাদকে সামনে রেখে খাদ্য রাজনীতি দ্বারা ক্ষমতা ও প্রভাব খাটানোর কৌশল উদ্ভাবন করছে। ১৯৭৪ সনে বাংলাদেশ সি. আই. এর সেই খাদ্য রাজনীতির শিকার হয়েছে—মৃত্যু হয়েছে হাজার হাজার মানুষের। উক্ত গবেষণা নিবন্ধের কালের দুর্ভিক্ষের উৎস সম্পর্কে বলা হয়েছে : বাংলাদেশ ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সনে বাণিজ্যিক বাজার থেকে আমেরিকান খাদ্য কেনে। ১৯৭৪ সালের শুরুতেই বাংলাদেশ সরকার খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে খাদ্য ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করে। চলতি বাজার দরেই এ সব খাদ্য ক্রয়ের কথা ছিল। অর্থ যোগানো হতো সুদ হারের ঋণ থেকে। ১৯৭৪ সালে গ্রীষ্মে বাংলাদেশ সরকার বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র ঘাটতির সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় ঋণ সংগ্রহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। মার্কিন খাদ্যশস্য সরবরাহকারী কোম্পানিগুলো সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বাংলাদেশে পৌছানোর জন্য স্থিরীকৃত দুটি বড় চালানের বিক্রয় বাতিল করে। বাংলাদেশ ঐ সময় বহু চেষ্টা করেও মার্কিন সরকারের ঋণ লাভে ব্যর্থ হয়। ঐ একই সাথে পি. এল-৪৮০ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশকে প্রদত্ত খাদ্যশস্য পাঠানো বিলম্বিত করা হয়। কারণ দেখানো হয় বাংলাদেশ কিউবার কাছে পাট বিক্রয় করার ফলে বাংলাদেশ সাহায্য

পাবার যোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যদিও ঐ একই সময় মিশর কিউবায় তুলা রপ্তানি করেছিল এবং মিশরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হয়নি। ১৯৭৪ সনের ৭ই জুন পি. এল-৪৮০-এর অধীনে ১ কোটি ডলার ঋণ দিয়েছিল মিশরকে।

২. সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই যে, কিউবার সঙ্গে গোপনীয় ৪০ লক্ষ পাটের থলে রপ্তানির চুক্তি সম্পর্কিত একটি খবর বিশেষ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ সংবাদের কাটিং নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে দুই দুইবার সাক্ষাৎ করেন এবং যথা সময়ে বাংলাদেশে খাদ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে অজুহাত ও অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়। খাদ্য সংকট সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সরকারের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। যেমন ১৯৭৩ সালের ১লা আগস্ট ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়ম রজার্সের সাথে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ বৈঠক করেন। উক্ত বছরের ৩০শে আগস্ট বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম ও মার্কিন সাহায্য সংস্থার সহকারী প্রশাসক মরিস উইলিয়ামসের মধ্যে এক বৈঠক হয় এবং ১৯৭৪ সনের ৯ই জানুয়ারি ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিবের সাথে দেখা করেন। এ সব সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল খাদ্য সাহায্য প্রার্থনা।

২.১ অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নগদ দামে কেনা ২ লক্ষ টন খাদ্য জাহাজ যোগে সে দেশের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। বাংলাদেশ সরকার অনুরোধ জানালে সে খাদ্যশস্য সোভিয়েত বাংলাদেশকে প্রদান করে। যার ফলে সংকটপূর্ণ রেশন ব্যবস্থা সে সময় চালু সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল নগণ্য।

২.২ যাহোক, বারবার আবেদন-নিবেদন করার পরেও যুক্তরাষ্ট্র কাঙ্খিত সময়ে খাদ্যশস্য পাঠায়নি। অজুহাত কিউবাতে পাটের থলে রপ্তানি। এ সম্পর্কে অধ্যাপক রেহমান সোবহান লিখেছেন, "কেন যে পাটের থলে কাঁচা তুলার চেয়ে অধিকতর বিপজ্জনক 'অস্ত্র' হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল অথবা কেন মিশরের ক্ষেত্রে যে বিশেষ অনুমতির ব্যবস্থা হয়েছিল তা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও হলো না—এই সব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্ভবত এটাই যে, মিশরের আনোয়ার সাদত সেই সময় কিসিঞ্জারের কূটনীতিকে পশ্চিম এশিয়ায় প্রয়োগ করেছিলেন বা প্রয়োগে সহায়তা করেছিলেন।"

৩. অন্য যে কোনো সময়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু মুজিব আমেরিকার এই ধরনের আচরণের মোকাবিলা করার দিকেই ঝুঁকতেন এবং বাংলা-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি

করতেন। এমনটি তাঁর জন্য নতুনও নয়।

৩.১ ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋণের উত্তরাধিকার অস্বীকার করার মাধ্যমে তিনি এ ধরনের একটি অবস্থা অতীতেই সৃষ্টি করেছিলেন। তবে ঐ মুহূর্তে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মনে রাজনৈতিক বীরত্ব প্রদর্শনের কোনো অভিলাষ ছিল না। চালের দাম মণ প্রতি ১৪০ টাকা রেখে দেশের সার্বভৌমত্বের পক্ষে শক্তি সংগ্রহের সম্ভাবনা তদানীন্তন অর্থনৈতিক কাঠামোয় খুবই সীমিত ছিল। সে জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার দুর্ভিক্ষ ঠেকানো ও মানুষকে বাঁচানোর স্বার্থে নতি স্বীকার করে এবং ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সনের ১০ই জুলাই ব্যক্তিগত খাত ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অনুকূলে বঙ্গবন্ধুকে নীতি পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

৩.২ এত সব প্রতিশ্রুতি ছাড়া, কনশেসান দেয়ার পরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খাদ্যশস্য পাঠাতে অহেতুক বিলম্ব করল। অজুহাত হিসেবে বলল, কিউবায় পাঠানো পাটের থলির সরবরাহের বিষয়-পর্ব পুরোপুরি শেষ না হওয়ায় খাদ্যশস্য পাঠানো হবে না। সুতরাং ১৯৭৪ সনের অক্টোবর পর্যন্ত কোন খাদ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে দেয় না। ১৯৭৪ সনের ৪ঠা অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে খাদ্য পাঠানোর সবুজ সংকেত দেয়, কিন্তু দুইমাস পর যখন এ খাদ্য এল তখন দুর্ভিক্ষ শেষ। আর মৃত মানুষের লাশে তখন বাতাস ভারী হয়ে আছে।[১]

## মুজিব হত্যার হাতিয়ার
## মিথ্যাচারের বাহন—৩

মুজিব হত্যায় মিথ্যাচারের বাহন হিসেবে বাংলাদেশের কয়েকটি পত্র পত্রিকা দুরভিসন্ধিমূলক ভূমিকা পালন করে।

১. ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চের কাল রাত।

দৈনিক ইত্তেফাক এবং দৈনিক সংবাদ অফিস পাকবাহিনীর কামানের গোলায় ভস্মীভূত হলো। কারণ এই দুটি দৈনিক পত্রিকা বাংলার স্বাধিকার অর্জনের স্বপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল। সেই রোষবহ্নিতে ইত্তেফাক ও সংবাদ অফিস ধ্বংস করা হয়।

১.১ কিন্তু ঘটনাটি যে ভুল সিদ্ধান্তের পরিণতি তা বুঝতে পেরে জেনারেল ইয়াহিয়া ইত্তেফাক পুণঃ প্রকাশের জন্য ১২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিলেন। তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সে টাকা গ্রহণ করে ইংল্যান্ড-জার্মান সফর করলেন অফসেট রোটারি মেশিন ক্রয়ের উদ্দেশ্যে। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেন না।

১.২ দেশে ফিরে এসে দৈনিক পাকিস্তান মুদ্রণালয় থেকে ইত্তেফাক ছাপাতে লাগলেন। শোনা যায় দুটো পশ্চিমা দেশ বিশেষকরে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ইয়াহিয়া খানকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এটি মার্কিনী লাইনের পত্রিকা। আজ ফারল্যান্ডের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এই পত্রিকাটি বাংলাদেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গুরুত্বপূর্ণ মুখপত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

১.৩ যাহোক, স্বাধীনতার পর মঈনুল হোসেন ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জু পূর্বেকার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ধরলেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তারা হানাদার কবলিত বাংলাদেশে ইত্তেফাক ছাপানো বকেয়া বিজ্ঞাপন বিল আদায় করতে সমর্থ হলেন।

১.৪ শুধু তাই নয় রোটারি মেশিন আমদানির জন্য ইত্তেফাক ১৭ লক্ষ টাকার ক্যাশ লাইসেন্স লাভ করে।

পাক গোয়েন্দা বাহিনীর সঙ্গে মঈনুল হোসেনের যোগাযোগ ছিল। পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনীর কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক লিখিত বইতে তাঁকে তাঁর পিতার 'যোগ্যপুত্র' হিসেবে প্রশংসা করা হয়েছে।[২]

শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত পরীক্ষিত নিষ্ঠাবান নেতা নূরুল ইসলাম ভাণ্ডারীকে বাদ দিয়ে ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দিয়ে ব্যরিস্টার মঈনুল হোসেনকে সংসদ সদস্য হিসেবে পার্লামেন্টে নিয়ে এলেন।

এরপর শুরু হলো ইত্তেফাকের খেলা।

ইত্তেফাক প্রকারান্তরে মুসলিম বাংলার প্রচার চালাতে থাকে এবং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর জাতীয় মূলনীতি বিশেষকরে সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপসমূহ বানচাল করার জন্য কৌশলে কাজ করে যেতে থাকে। খন্দকার আবদুল হামিদ আইউব আমলে মৌলিক গণতন্ত্রী, মুসলিম লীগের ও মোনায়েম খানের সমর্থক। ইয়াহিয়া জান্তাকেও সমর্থন দেয় এ কুখ্যাত কলাবরেটর। হীরু-মঞ্জু মিয়ার তদবীরে বঙ্গবন্ধু তাকে ক্ষমা করে দেন। কারাগার হতে বের হয়ে মুজিবকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি স্পষ্টভাষী নাম নিয়ে ইত্তেফাকে লেখা শুরু করেন এবং আজাদে সাম্প্রদায়িক গরল উদগীরণ করেন 'মর্দে মুমীন' নামে।

১.৫ ইতিহাসই প্রমাণ করেছে এই ব্যক্তিটি বাঙ্গালি জাতি সত্তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য জিয়ার আমলে 'বাঙালি'র পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' তত্ত্বের উদ্‌গাতা। যে তত্ত্বটি পাকিস্তানী দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর দাঁড়ানো এবং যার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ আত্মাহুতি দিয়েছেন।[৩]

২. মিথ্যা উদ্দেশ্যমূলক কৌশলী সংবাদ পরিবেশনার ক্ষেত্রে ইংরেজি

সাপ্তাহিক হলিডের জুড়ি নেই। আইউব আমলে পত্রিকাটির আবির্ভাব। সোভিয়েত, ভারতের বিরুদ্ধে চীনা নীতির ধারক ও প্রচারক এবং জোর সমর্থক হিসেবে পত্রিকাটি নিজেকে হাজির করলেও এটি ছিল সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন ও পাক এলিট প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বার্থ সংরক্ষক।

২.১ হলিডে চক্র প্রথম দিকে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সরাসরি না লিখলেও সংবাদ বিশ্লেষণ, সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং চিঠিপত্র কলামে সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সমালোচনা করার উদ্যোগী হয়। পত্রিকাটি প্রকাশ্যত চীনের পক্ষে ওকালতি ও পাক-মার্কিনীদের সাফাই গাইতে শুরু করে এবং চরমভাবে ভারত ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকে।

২.২ ১৯৭৩ সনের ২৮ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য আব্দুল কুদ্দুস মাখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, পাকিস্তানী নাগরিক মোহাম্মদ অসলাম এখন কোথায়? এই প্রশ্নে শুরু হলো বিতর্ক। অনুসন্ধানে দেখা গেল, জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো তার পিপলস্ পার্টি গঠন করার সময় আসলাম নামের জনৈক উর্দু ভাষী সাংবাদিকের আবির্ভাব ঘটে। যুদ্ধকালে সে বাংলাদেশেই ছিল এবং স্বভাবতই পাকবাহিনীর সাথে যোগাযোগ ছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মালেক উকিল পার্লামেন্টে জানালেন যে, গোয়েন্দা রিপোর্টে দেখা গেছে সে ছিল পাকিস্তান তথা ভুট্টোর এজেন্ট। পাকিস্তানের সাথে সকল যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সে ঢাকায় গোপনে কাজ করছিল। তার কাজ ছিল বিচ্ছিন্ন পাকিস্তানী এজেন্টদের সংগে পাকিস্তানী গুপ্তচর বাহিনীর পুনঃযোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া। সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সে এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

২.৩ বলাবাহুল্য, এই পাকিস্তানী এজেন্টটি ছিল হলিডের নির্বাহী সম্পাদক। পার্লামেন্টে এ সব বিতর্ক উত্থাপনের দুই দিন পর ৩০শে সেপ্টেম্বর এনায়েত উল্লাহ খান নিজের সাফাই গাইতে গিয়ে 'মাতৃভূমির রক্ষার্থে' সাহসিকতার লাল পোশাক পরিধানের 'সংকল্প' প্রকাশ করে তার উপর অবিচার ও পার্লামেন্টে এহেন 'ননসেন্স' থামানোর জন্য প্রধান মন্ত্রীর নিকট আবেদন করেন। এখানে উল্লেখ্য, আসলাম যে একজন পাকিস্তানী ও তার পত্রিকায় কর্মরত ছিল এনায়েত উল্লাহ খান তা অস্বীকার করেননি।[৪]

২.৪ পাকিস্তানী এই এজেন্টটি অত্যন্ত সংগোপনে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরপরই এনায়েত উল্লাহ খানকে নিয়ে স্বাধীনতা বিরোধী কাজে লেগে গেলেন।

স্বাধীনতার পরপর হলিডে লিখল ঃ তাহলে কি আমরা ৬ কোটি লোক সকলেই দালাল?

অর্থাৎ জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরানোর সুচতুর কৌশল এবং সাথে সাথে স্বাধীনতা বিরোধীদের রক্ষার জন্য বিকল্প জনমত গঠনের পাঁয়তারা। দালাল, রাজাকার, আলবদর, খুনী চক্র, মুসলিম লীগ ও জামাতী পাণ্ডারা যেহেতু, এই ছয় কোটির মধ্যে সে জন্য এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার অর্থই ছয় কোটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সিপাহসালার অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে লিখে লিখে বঙ্গবন্ধু ও তাজুদ্দিনের মধ্যে ক্রমাগত বিরোধ প্রচেষ্টা সফল করে। এনায়েত উল্লাহ খান বঙ্গভবনে অবাধে যাতায়াত শুরু করে।

২.৫ ইনটেলিজেন্স রিপোর্টে জানা যায়, এনায়েত উল্লাহ খান বাংলাদেশ বিরোধী একটি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিল এবং তার গতিবিধি সন্দেহজনক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এম মনসুর আলী তাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করেন। "এনায়েত উল্লাহ খান বন্দি হবার পর তার স্ত্রী গিয়ে শেখ মুজিবের দুয়ারে ধর্ণা দেন এবং বঙ্গবন্ধু এনায়েত উল্লাহ খানকে ক্ষমা করেন।"[৫]

বঙ্গবন্ধু শুধু ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হলেন না, তাকে প্রেসিডেন্টের তথ্য উপদেষ্টা পদে বহাল করলেন।

২.৬ সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এনায়েত উল্লাহ খান বলেছেন, "বাকশাল সৃষ্টির আগে শেখ মুজিব আমাকে এক দিন ডেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মিডিয়া গঠন সম্পর্কিত একটি পেপার তৈরি করে দিতে বললেন। আমি সাংবাদিক শহীদুল হক ও তোয়াব খান এই তিন জন অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের আলোকে বাংলাদেশে মিডিয়া State Controlled Media-র স্ট্রাকচার ও ভূমিকা কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে একটি পেপার তৈরি করে দিলাম। পেপারটি ছিল ফুল্লি একাডেমিক। সেখানে আমরা কয়েকটি দেশের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে State Controlled media-বা পরামর্শ দিয়েছিলাম; আমি বিদেশে থাকা কালেই এটি ইম্প্লিমেন্ট করা হয়।"[৬]

২.৭ ঐ উপদেষ্টার পরামর্শে তৈরি ১৯৭৫ সনের নিউজ পেপার অর্ডিনেন্স পাস হয়।[৭]

২.৮ কিন্তু মাত্র দুই মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু নিহত হলে এনায়েত উল্লাহ খান লিখেছেন ঃ তিনি দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। জীবন দিয়ে তাকে সেই মূল্য শোধ করতে হয়েছে।[৮]

৩. বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর খন্দকার মোশতাক আহমদ ক্ষমতায় এসে এনায়েত উল্লাহকে বাংলাদেশ টাইমসের সম্পাদক নিযুক্ত করেন এবং হলিডে প্রকাশনার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। ৭ই

নভেম্বর প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী পুনরায় ক্ষমতা দখল করলে এনায়েত উল্লাহ্ খান লিখলেন, "বাংলাদেশ উইনস্ ফ্রিডম" অর্থাৎ এতদিনে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো।

তারপর শুরু হলো হলিডে চক্রের নির্লজ্জ দালালী। স্বাধীনতা বৈরী তৎপরতা। স্বাধীনতার স্বপক্ষে শক্তির উপর নির্লজ্জ এক অন্তহীন আক্রমণ!

৩.১ আজ প্রমাণিত হয় সি. আই. এর ব্লু প্রিন্টে পরিচালিত এনায়েত উল্লাহ খান ১৯৭৭ সন ২৭শে জানুয়ারি হলিডে পত্রিকায় সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারী বিপ্লবী পরিষদ ও প্রেসিডেন্টকে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির উর্ধ্বে স্থান দেবার জন্য এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।[৯] যার প্রক্রিয়া জিয়া ও এরশাদের আমলে চলেছে ও চলছে। সে জন্য জিয়া তাকে মন্ত্রী ও এরশাদ তাকে চীনের রাষ্ট্রদূত করে পুরস্কৃত করেছেন।

৩.২ এখানে উল্লেখ্য যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এনায়েত উল্লাহ খান এ দেশেই ছিলেন এবং বন্দি হন। বঙ্গবন্ধুর সময়ও বন্দি হন। এই বন্দিদশা থেকে মুক্তির ব্যাপারে একটি বিদেশী রাষ্ট্র বার বার হস্তক্ষেপ করেছে। প্রশ্ন থেকে যায় এই বিদেশী রাষ্ট্র কোন্‌টি?

৩.৩ ভারতীয় পার্লামেন্টে উত্থাপিত এক প্রশ্নের উত্তরে বাংলাদেশে সি. আই. এ. নেট ওয়ার্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এনায়েত উল্লাহ্ খানও উল্লেখিত। [পরিশিষ্ট দেখুন]

৪. সরকার পরিচালিত বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদক ওবায়দুল হক মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনী ও শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দিন-রাত লিখেছেন, বলেছেন এবং কাজ করেছেন।

৪.১ দেশ স্বাধীন হলো।

ওবায়দুল হক শেখ মুজিবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

অবজারভার পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রশংসার ফিরিস্তি চলল।

বই লিখেন ঃ ভয়েজ অব থান্ডার ঃ মুজিব প্রশস্তি।

কবিতা লিখলেন।

তা বাধিয়ে গণভবনের দেয়ালে পেরেক দিয়ে গেঁথে দিলেন। চলল এভাবেই।

৪.২ ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট।

নিহত মুজিব। লাশ তাঁর পড়ে আছে। দাফন পর্যন্ত হয়নি। তিনি লিখলেন অবশেষে জাতি দুষ্ট চক্রের কবল মুক্ত হয়েছে।

৫. ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সির মালিক ও প্রধান গোলাম রসুল। আইউব আমলে আইউবের প্রিয়পাত্র, বাঙালিদের মধ্যে একজন—যারা সরকারি খরচে দেশে-বিদেশে সফর করার বহু সুযোগ পেয়েছেন। আইউব-মোনয়েমের পেয়ারা বান্দা।

দেশ স্বাধীন হলো।

৫.১ গোলাম রসুল বঙ্গবন্ধুর পেয়ারা। দেশ-বিদেশে তাঁর সফর সঙ্গী। অথচ গোপনে সে স্বাধীনতা বিরোধী বলে কথিত সিরাজুল হোসেন খানকে তার প্রতিষ্ঠানের সংবাদ বিশ্লেষণ তৈরি করার কাজে নিয়োজিত করেছিল। যার ফলে বহু আন্তর্জাতিক পত্র পত্রিকায় বহু সংবাদ বিকৃত হয়ে প্রকাশিত হতো। যেমন—

৫.২ বঙ্গবন্ধু জেনেভায় ...
ভুট্টো–বঙ্গবন্ধুর বৈঠক সম্পর্কে একটি বিবৃতি লন্ডনের দি টাইমস পত্রিকা বিকৃত আকারে প্রকাশ করে।[১০]

৫.৩ এই গোলাম রসুল বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর জিয়ার খাস চামচা হয়ে বহু চমকপ্রদ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছে।

৬. জেনারেল টিক্কা আর হানাদার আমলের গভর্নর ডাঃ মালেকের স্টেনোগ্রাফার রোজারিও গণভবনে বহাল থাকলেন।

৭. দেশের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী বিদেশে অতিরঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে।
অভ্যন্তরীণ ছোট ঘটনাও বড় করে দেখানো হচ্ছে। ঠিকমতো তথ্যসমৃদ্ধ সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে না।
তাহের উদ্দিন ঠাকুর তথ্য প্রতিমন্ত্রী।
বললেন ঃ যোগ্য লোক দিচ্ছি।
বৈদেশিক প্রচারণা জোরদার করতে হবে। তার সুপারিশে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের তথ্য বিভাগের মহাপরিচালক হয়ে বসলেন ঃ নাজিমুদ্দিন হাশিম।
পরিচয় ঃ আইউবের 'প্রভু নয় বন্ধু' গ্রন্থের মূল প্রণেতা। রাওয়ালপিন্ডির পাকিস্তান কাউন্সিলের সাবেক ডাইরেক্টর।

৭.১ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংবাদ পরিবেশনার দায়িত্বে থাকলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুর এবং বৈদেশিক মন্ত্রণালয় প্রচার বিভাগের দায়িত্বে থাকলেন আইউব–মোনায়েমের প্রিয়পাত্র নাজিম উদ্দিন হাশিম। বর্তমান বাংলাদেশ ফৌজি শাসককুলের তিনি অনুগ্রহ ভাজন ব্যক্তি। বিদেশে প্রচারিত হতে থাকল বাংলার বুভুক্ষু মানুষের জন্য প্রদত্ত সাহায্যের গম রেডক্রস প্রধান গাজী গোলাম মোস্তফার গরুর খামারে গো খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।[১১] গাজী গোলাম মোস্তফার না ছিল গরু, না ছিল খামার। না ছিলেন তিনি খাদ্য ব্যবসায়ী। এ রকমের অপপ্রচার চলছিল।

৭.২ সবিশেষ বিশেষণে বিশেষিত করে তাহের উদ্দিন ঠাকুর পার্লামেন্টে যে

ভাষণ দান করতেন তা আমরা যারা সংসদ সদস্য ছিলাম তারা অত্যন্ত লজ্জা ও কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করতাম। কর্তা ভজানো এই সব চাটুকার বেঈমানদের পাল্লায় বঙ্গবন্ধুর স্বাভাবিক কথাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। যেমন ১৯৭৩ সনে যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে এক বিয়ের আসরে বঙ্গবন্ধু আক্ষেপ করে বলেছিলেন, কবে যে বঙ্গললনা বেলী ফুলের মালা দিয়ে বিয়ে করবে! শুরু হয়ে গেল বেলী ফুলের দাবদাহ্!

৭.৩ আবার ১৯৭৪ সনের দুর্ভিক্ষাবস্থার পর শেখ আত্মজের লক্ষ টাকার স্বর্ণমুকুট মাথায় পরে পরিণয় পর্ব! একদিকে রুগ্ন শিশুর বিবর্ণ মৃত্যুপ্রায় মূর্তি হাড়্ডিসার; অন্যদিকে টেলিভিশনে আলোকোজ্জ্বল স্বর্ণমুকুট প্রদর্শনের মহড়া!

৭.৪ ইত্তেফাক দুর্গতি বাসন্তীদের খবর ছাপল, টেলিভিশন স্বর্ণমুকুট প্রদর্শনে ব্যতিব্যস্ত। আর বঙ্গবন্ধু?

লিপ্সার গণ্ডিবদ্ধ পারিপার্শ্বিক চক্রে শৃঙ্খলিত মুজিবের অসহায় আত্মরোদন!

# পঞ্চম অধ্যায়

## দিনপঞ্জী : কতিপয় ঘটনা

১. মুজিব হত্যার বিষয়টিকে নিয়ে আরো গভীরে যাওয়া যাক। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী বলে পরিচয় দানকারী লেঃ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান ও আবদুর রশিদ এক সাক্ষাৎকারে নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, "বহু পূর্বে হতেই মুজিব হত্যার পরিকল্পনা চলে আসছিল।" যেমন তারা বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে আগস্ট বিপ্লবের সংগঠকরা ১৯৭৩ সালের শেষ দিক থেকেই পরিস্থিতির উপর তীব্র নজর রেখে আসছিলেন। তারা গোটা পরিস্থিতি নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নির্বাচন করার ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে একটি যৌক্তিক কার্যক্রমের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে বিস্তারিত কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় এবং একটি খসড়া সময়সূচিও নির্ধারণ করা হয়। গোপনীয়তা রক্ষা করার স্বার্থেই বিস্তারিত কার্যক্রমের পরিকল্পনা আমরা দুই জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখি। চূড়ান্ত সময়সূচি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ৬ মাস কেটে যায়। কেননা এটি বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের, কার্যকারণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত চূড়ান্ত আঘাত হানার দুটি নির্ধারিত সময়সূচি ছিল। সত্য কথা বলতে কি, দুটি বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিপ্লবের মহড়াও অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে ১৫ই আগস্ট ছিল চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের সর্বশেষ সময়সূচি। ১২ আগস্টের মধ্যে আমাদের কাছে এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে, ১৫ই আগস্ট হচ্ছে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মোক্ষম সময়। চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ১২ই আগস্ট ও ১৫ই অগস্টের মধ্যবর্তী সময়কে বেছে নেয়া হয়। পরিকল্পনা কার্যকরী করার আদেশ প্রদান করা হয় ১৫ই আগস্ট এবং ঐ দিনই সূর্যাস্তের অব্যাহিত পর থেকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেয়া হয়।"[১]

সুতরাং এটা প্রতীয়মান হয় যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড গুটিকয়েক সামরিক অফিসারের হঠাৎ পাগলামী অংশ নয়। আমরা যদি সাক্ষাৎকারটি

ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, হত্যাকারীগণ "তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য" দীর্ঘ দেড় বছর সময় নিয়েছে। কারণ হিসেবে তারা বলেছে, "এটা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে জড়িত।"

এ সব উদ্ধৃতি থেকে বঙ্গবন্ধু হত্যা সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো পাওয়া যায়—

ক. এটা ছিল একটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

খ. হত্যাকারীদের ভাষ্যমতে ১৯৭৪ সালের শেষের দিক হতেই তারা পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ স্থাপন করেছে।

১.২ লে. কর্নেল ফারুক ও রশীদের বিবৃতি অনুসারে বঙ্গবন্ধু হত্যা–পরিকল্পনায় তাদের দীর্ঘ সময় লেগেছিল; কারণ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি। তারা ১৯৭৪ সনের মাঝামাঝি সময় হতেই হত্যা-পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল।

এই সময়ের কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—

১৭ই জুন : ১৯৭৪ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তিন দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন।[২]

৭ই জুলাই : ছয় জন মন্ত্রী ও তিন জন প্রতিমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র পেশ।

৯ই জুলাই : দেশের সীমান্ত এলাকা চোরাকারবারীদের দমনের জন্য প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সেনাবাহিনীকে নির্দেশ প্রদান।

১০ই জুলাই : ভারতীয় হাই কমিশনার কার্যভার গ্রহণের জন্য সমর সেনের ঢাকা আগমন

১৫ই জুলাই : বন্যার সার্বিক অবনতি

২রা আগস্ট : বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীকে সতর্কাবস্থায় থাকার নির্দেশ।

৩রা সেপ্টেম্বর : কমার্স ও ফরেন টেড মিনিস্টার খন্দকার মোশতাক আহমদের ছয় দিনব্যাপী ইরান ও আফগানিস্তান সফর শেষে ঢাকা প্রত্যাবর্তন

৪ঠা সেপ্টেম্বর : দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকারের প্রেসিডেয়ামের প্রেসিডেন্ট–এর আগমন এবং লাল গালিচা সম্বর্ধনা প্রদান

৭ই সেপ্টেম্বর : ব্যক্তিগত সফরে ভারতের মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাংলাদেশে আগমন।

১১ই সেপ্টেম্বর : ঘোড়াশালের সার কারখানায় বড় রকমের বিস্ফোরণ ২ জন

নিহত ৭ জন আহত।

১৭ সেপ্টেম্বর : ১৩৬তম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্য পদ প্রাপ্তি।

২০ সেপ্টেম্বর : সরকার কর্তৃক সমুদ্র উপকূলে তেল অনুসন্ধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার দুটি ফার্মের সাথে চুক্তি।

২৫ সেপ্টেম্বর : জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ।

১লা অক্টোবর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ৪৫ মিনিট আলোচনা।

৩০ অক্টোবর : মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট ড. হেনরি কিসিঞ্জারের ১৯ ঘন্টার সফরে ঢাকা আগমন।[৩]

৫ই নভেম্বর : বঙ্গবন্ধুর কায়রো যাত্রা।

১১ ডিসেম্বর : লিবিয়ান প্রেসিডেন্ট–এর বিশেষ দূত আলী গাদামাসীর ঢাকা আগমন।

২৩ ডিসেম্বর : সমগ্র দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা।

২৫ জানুয়ারি : জাতীয় সংসদে চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত। প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির প্রবর্তন জাতীয়দল গঠন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ।

৩০ জানুয়ারি : ভারতের জনসংঘ ও ভারতীয় লোকদলের কতিপয় কর্মীর নয়াদিল্লীস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন।

২৪ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় দল-বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ/বাকশাল ঘোষণা।[৪]

১০ই মার্চ : কাগমাইর জনসভায় প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব ও মওলানা ভাসানীর ভাষণ প্রদান।

২৬শে মার্চ : স্বাধীনতা দিবস সমাবেশে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা।

২৭শে জুলাই : প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী জাতীয় সংসদে ঘোষণা করেন, বাকশাল হলো সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কমিটি এবং সরকার তার কার্যাদেশ নির্বাহ করবে।

১৮ই জুলাই : কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৪ জন শিক্ষক অফিসারের বাকশালের সদস্য পদের জন্য আবেদন।

২১শে জুলাই : প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু দুর্নীতির জন্য যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী নূরুল ইসলাম মঞ্জুরকে অপসারণ করেন।

২৩শে জুলাই : সরকার কে. এম. কায়সারকে (বার্মায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে)

জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন।

২৫শে জুলাই : দেশে ৬৮ জন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের বাকশালের সদস্য পদের জন্য আবেদন।

৪ঠা আগস্ট : গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কোর্সে খন্দকার মোশতাক ঘোষণা করেন যে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধন দৃঢ়তর হবে।

৯ই আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী যশোরে ক্যান্টনমেন্টে সামরিক বাহিনীর অফিসার ও জোওয়ানদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় দ্বিতীয় বিপ্লবের ক্যাডার হবার আহবান জানান।

১৪ই আগস্ট : বাংলাদেশ সরকারের অনুমতিক্রমে ভারতীয় একটি হেলিকপ্টার ৮ জন লোকসহ নোয়াখালীর রামগতিতে বিধ্বস্ত হয়। ব্রিটিশ হাই কমিশনারের খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

২. ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পূর্ব পর্যন্ত এক বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ঘটনার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ ঘটনার পুনরাবৃত্তি জরুরি। এর মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দান ও তার রাষ্ট্রপ্রধানকে বাংলাদেশে লাল গালিচা সম্বর্ধনা, ১৯৭৪ সনের প্রচণ্ড বন্যা ও বন্যা উদ্ভূত দুর্ভিক্ষ, খন্দকার মোশতাকের ইরান সফর এবং মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জারের ঢাকা আগমন উল্লেখ্য।

৩. মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট ড. হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭৪ সনের ৩০ অক্টোবর ১৯ ঘন্টায় সফরে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দুই ঘন্টা ব্যাপী আলাপ আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেন, "A man of vast conception', Kissinger said, he had rarely met a man who was the father of his Nation and this was a particularly uniqne experience for him, for those who listend to Kissingers dead-pan delivery that then, there was a slight trace of Sarcasm in his Voice."[৫]

কিন্তু একজন সংবাদদাতা যখন প্রশ্ন তুলল শেখ মুজিবের দূরদর্শিতা ও 'বিশাল প্রজ্ঞতা' যদি এমনই তাহলে আপনি ১৯৭১ সনে বঙ্গোপসাগরে ৭ম নৌবহর পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন কেন? কিসিঞ্জার এর উত্তর না দিয়ে সম্মেলন কক্ষ ত্যাগ করলে তিন মিনিটের মধ্যেই সাংবাদিক সম্মেলন শেষ হয়ে যায়।

৪. কোনো দেশের রাষ্ট্র প্রধান যখন প্রথমবারের মতো জাতিসংঘে ভাষণ দিতে যান তখন প্রটোকল প্রথানুযায়ী তাকে সৌজন্যমূলকভাবে

ওয়াশিংটন সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাংলাদেশ ফরেন মিনিস্ট্রি থেকে বারবার অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও শেখ মুজিবের ওয়াশিংটন সফর সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ব্যবস্থা পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ মুহূর্তে যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, যাই হোক না কেন শেখ মুজিব ওয়াশিংটনে তার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য যাবেনই। তখন নিরুপায় হয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্ট হোয়াইট হাউজে মাত্র ১৫ মিনিটের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত শীতল এবং ড. হেনরি কিসিঞ্জার ওয়াশিংটনে শেখ মুজিবের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতও প্রদান করেননি। বরং নিউইয়র্কে জাতিসংঘে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন এবং ছবি তোলেন। তাই লিপস্যুজ মনে করেন শেখ মুজিব সম্পর্কে বিশেষিত শব্দগুলো 'এ ম্যান অব ভাস্ট কনসেপশন' ছিল এক ধরনের কথার কথা। ব্যাঙ্গোক্তি।

লিপস্যুজ লিখছেন : "Within a month after Kissinger visit to Dhaka, according to a high-level U.S. source then stationed at the American Embassy in Dhaka the first regular contacts with the coup planning cell bagan."[৬]

৫. কিসিঞ্জারের বাংলাদেশ সফরের পূর্বে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশে ২৪শে জুন ১৯৭৪ তিন দিনের সফরে আসেন। তার সঙ্গে সর্বমোট ১০৭ জন সফর সঙ্গী ছিল। এক জন বিদেশী রাষ্ট্রনায়ককে যোগ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার যথাযথ ব্যবস্থা করেন, কিন্তু বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনীর গণহত্যা ও বর্বরতার ভয়াল দিনসমূহের ছবি ভুট্টোর আগমনের দিন সংবাদপত্রগুলো প্রকাশ করে।

৫.১ ভুট্টোর ঢাকায় পৌঁছার পূর্বেই একটি অগ্রবর্তী দল ঢাকা আসে। তাদের মধ্যে সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দাবাহিনীর লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঢাকা এসেই তারা তাদের পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে ত্বরিত যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়। কেননা এর পূর্বেই হলিডে পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক আসলাম ভুট্টোর এজেন্ট হিসেবে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে পাকিস্তানীপন্থীদের ছিন্নভিন্ন ও হতোদ্যম শক্তি ও ব্যক্তিবর্গকে চাঙ্গা রাখার ব্যবস্থা করেছিল। প্রচণ্ড ভারত বিরোধিতার পাশাপাশি মুসলিম বাংলার স্বপক্ষে কার্যকর ব্যবস্থা ও আশাবাদ গড়ে তোলার কাজে এই ব্যক্তিটি চীনাপন্থীদের সহযোগিতা, বিশেষকরে হলিডে-চক্রের সহায়তায় অত্যন্ত সংগোপনে কাজ চালিয়েছিল; হলিডে চক্রের সহায়তায় ধরা পড়ার পূর্বে এই ব্যক্তি বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। যা নিয়ে পার্লামেন্টে বিতর্কের

সৃষ্টি হয়।[৭] যাহোক, পাকিস্তানপন্থীদের মধ্যে ভুট্টোর লোকজন প্রচুর উপঢৌকন, অর্থ ও মদের বোতল দেদারে বিতরণ করে।

ভুট্টোর আগমনের দিন ঢাকা ও ঢাকার বাইরে থেকে প্রচুর লোক আনা হলো। ভুট্টোর আগমনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটনো হলো। মন্ত্রী ফণীভূষণ মজুমদার লাঞ্ছিত হন।

৫.২ ভুট্টো বাংলাদেশে আসার আগে আভাস দিয়েছিল সে একটা মিটমাট ও বোঝাপড়া চায়। সে জন্য বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মাহমুদ হারুনকে বাংলাদেশে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে রেখে যাবার জন্য ভুট্টো তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

৫.৩ কিন্তু বাংলাদেশে আসার পর ভুট্টোর মনোভাব পরিবর্তিত হলো কেন? কথিত, ভুট্টোর 'এক ক্লাসের বন্ধু' মশিউর রহমান ভুট্টোকে অনুরোধ করে পাঠান যে, সে যেন কোন অবস্থাতেই বঙ্গবন্ধুর সাথে সব বিষয়ে ফয়সালা না করে। পিকিংপন্থী এক নেতা হোটেল ইন্টারকনে ভুট্টোর সঙ্গে আগত শীর্ষস্থানীয় কুটনীতিকদের মধ্যে ওয়াজিদ শামসুল হকের সঙ্গে আলোচনা করে বোঝাতে সক্ষম হন যে, বাংলাদেশে চীন পাক মিত্র শক্তির অবস্থান অচিরেই সুদৃঢ় হবে। সুতরাং শেখ মুজিবের সঙ্গে সমঝোতা না করে বরঞ্চ তাকে ও বাংলাদেশকে বর্তমান নাজুক পরিস্থিতিতে কিছুদিন ঝুলিয়ে রাখতে হবে।[৮]

৫.৪ সুতরাং ভুট্টো বাংলাদেশের দায় দেনা ও পাওনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন, "I have not brought a blank cheque" ভুট্টোর সফর পুরোপুরি ব্যর্থ হলো।

এক বিদেশী সাংবাদিক যিনি ভুট্টোর সফর 'কভার' করার জন্য ঢাকা এসেছিলেন, তিনি বললেন, "ভুট্টো ওয়ানটেড সামথিং ফর নাথিং"।

কিন্তু ভুট্টো ফিরে গিয়ে বললেন, বাংলাদেশে তার তাৎপর্যপূর্ণ সফর অত্যন্ত ফলপ্রসূ। করাচীর এক দৈনিকে আভাষ দেয়া হলো, বাংলাদেশে অচিরেই পরিবর্তন ঘটবে।[৯]

৬. সফর যে ফলপ্রসূ তা অচিরেই বোঝা গেল। ১৯৭৪ সনের আগস্ট মাসে ভুট্টোর সফরের আট সপ্তাহ পর বঙ্গবন্ধু সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ আফগানিস্তান ও ইরান সফরে যান। ইরান–আফগান হয়ে মোশতাক জেদ্দায় গমন করেন। ঐ সময়ে ইরানে চীনের নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন। মোশতাক গোপনে জেদ্দায় গিয়ে পাকিস্তানী দলের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। এ সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত মঞ্চে নেপথ্যে বলা হয়–

"গত বছরে (১৯৭৪) ইত্তেফাকের একটি নিজস্ব সংবাদে বলা হয় যে,

মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এক স্থানে বাংলাদেশ সরকারের জনৈক নেতার সহিত চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এক বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের বিষয় আলোচনা হয় এবং চীনা নেতার তরফ হইতে এ ব্যাপারে বিশেষ অনুকূল সাড়া পাওয়া যায়। গত ২৪'শে মে'র নিবন্ধে আমরা তদসম্পর্কে লিখিয়াছিলাম, "বাংলাদেশের সেই নেতা তখন নিজের নাম প্রচারে অস্বীকৃতি জানাইলেও আমরা পরবর্তীকালে জানিতে পারি যে, বাংলাদেশ সরকারের সেই নেতাটি ছিলেন আমাদের বিচক্ষণ বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ। আর অকুস্থলটি ছিল বাগদাদ"।

তার আফগানিস্তান সফরকালে কাবুলে চীনা প্রতিনিধিদের সঙ্গে তার 'সাক্ষাৎকারের' কথা জানা গিয়াছে।

এটা অনস্বীকার্য যে, তিনি 'ফরেন ট্রেড' করার উপলক্ষে বেশ কিছু "ফরেন য়্যাফেয়ার্সের কাজও করিয়াছিলেন এবং তাহা করিতে গিয়া হয়ত কোন কোনও মহলের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।"[১০]

৬.১ মোশতাকের এই সাক্ষাৎকারের পর পরই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো কাবুলের মিলিটারি একাডেমিতে এক ভাষণে বললেন, "Soon some changes are going to be taken place in this region."[১১]

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পটভূমিকায় বঙ্গবন্ধুর আমলে তাঁর প্রশাসন এবং প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একটি তালিকা প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরি। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে যেমন বেসামরিক প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীতে উচ্চ পদস্থ অফিসারদের জীবন ধারা, কর্মপদ্ধতি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের সম্পর্ক ও লবি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যাদি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের উদ্‌ঘাটনে যথার্থভাবেই সহায়ক হবে সন্দেহ নেই। এ লক্ষ্যে আগ্রহী গবেষকদের দিক নির্দেশের জন্য বর্তমান উপ-অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে।

### পুলিশ প্রশাসন

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫০ সন থেকে ১৯৭৩ সন পর্যন্ত ইন্টারন্যাশন্যাল পুলিশ সার্ভিস (আই. পি.এস) পরিচালিত হয়েছে যার লক্ষ্য ছিল দ্বিবিধ– মিত্র দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার উন্নতি সাধন এবং প্রো-আমেরিকান মানসিকতা তৈরিকরণ। ফলে এ সব গোয়েন্দা ব্যক্তিত্বের মধ্যে হতে সি. আই. এ. সহজেই তাদের বিশ্বস্ত লোক খুঁজে পেতে পারত। ষাট দশকের

গোড়ার দিকে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপ্‌মেন্টস্ অফিস অব পাব্লিক সেফ্‌টি সংস্থাটিকে ঢেলে সাজানো হয় এবং বিদেশী পুলিশদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সি. আই. এ দলিলে দেখা যাচ্ছে, সি. আই. এদের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ রাখত।[১]

১.১ জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে ১৯৬৩ সনের মার্চ মাস হতে বাঙালি পুলিশ অফিসারদের জন্য ইন্টারন্যাশন্যাল পুলিশ সার্ভিস স্কুলে ও ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণের দ্বার উন্মুক্ত হয়। একই সাথে অফিস অব পাবলিক সেফটির কর্মকর্তারা ঢাকায় মোতায়েন হন। এদের মধ্যে রবার্ট জানুষ, লিও ক্রে, মন্টস, ওবভাল ডনার ঢাকার পুলিশ ও গোয়েন্দা ট্রেনিং তদারক করতেন। এদের অনেকেই ভিয়েতনামে কাজ করতেন এবং সি. আই. এর নেটওয়ার্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন।[২]

১.২ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর হিসাবে দেখা গেল ১১৩ জন পুলিশ কর্মচারী আমেরিকায় ট্রেনিং নিতে গিয়েছিলেন এবং 'ইনপোলসে' ট্রেনিং নিয়েছে। এদের মধ্যে চল্লিশ জন ছিলেন ইনটেলিজেন্সের অফিসার এবং হিসাবে অনুযায়ী এদের সবারই সি. আই. এর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।[৩]

১.৩ বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত পুলিশ কর্মকর্তা মার্কিনীদের এ সব প্রশিক্ষণে যোগদান করেছিল তাদের মধ্যে এ. বি. এস. সফদর, আবদুল রহিম এস, এ. হাকিম, মুসা মিয়া চৌধুরী, সৈয়দ আমির খসরু, এম. এন. হুদা, এ.কে. এম. মোসলেহ উদ্দিন, আবু সৈয়দ শাহজাহান, এ. এম. এম. আমিনুর রহমান, গোলাম মোর্শেদ, আলী মোহম্মদ জামসেদ, আব্দুল খালেক খান, এ. এইচ. নূরুল ইসলাম, জাফরুল হক, খন্দকার গোলাম মহিউদ্দিন প্রমুখ।[৪]

২. খাজা মুহাম্মদ কাইসার ঢাকার নবাব বাড়ির ছেলে এবং ভারত ভাগের পূর্বে ইম্পিরিয়াল পুলিশে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তান আমলে তিনি ফরেন সার্ভিসে ঢুকে পড়েন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কাইসার পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে চীনে কর্মরত ছিলেন এবং ঐ সময় মার্কিন–চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের হয়ে তিনি চীনের মাও সেতুঙ–চৌ এন লাই-এর সঙ্গে কিসিঞ্জারের মিটিং-এর ব্যবস্থা করেছিলেন। চৌ এন লাই-এর সঙ্গে তার হৃদ্যতা ছিল, হৃদ্যতা ছিল জুলফিকার আলী ভুট্টো ও কিসিঞ্জারের সাথে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার অনেক পরে তিনি বাংলাদেশের পক্ষে অপশন প্রদান করলে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাকে বার্মায় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেন।

২.১ রেঙ্গুনে কাইসারের খুব একটা কাজ ছিল না। সে জন্য তিনি প্রায়ই ঢাকায় আসতেন এবং হোটেল পূর্বানীতে আসর জাঁকিয়ে বসতেন।

২.২ 'কাইসারের বৈঠকে যাঁরা যোগ দিতেন তাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুর রহিম, এস. এ. হাকিম. মুসা মিয়া চৌধুরী, আমির খসরু, এম. এন. হুদা, এ. কে. মুসলেহ উদ্দিন, আবু সৈয়দ শাহাজাহান, গোলাম মুরশেদ প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই সব পুলিশ কর্মচারীরা বাংলাদেশ বিরোধী কাজ করতেন। "আমি কাইসারের আসরে গিয়ে এই সব ইনটেলিজেন্স অফিসারের দেখা পেতাম। আগেই বলা হয়েছে যে, কাইসার এই সব দলের পাণ্ডা। তার আসরের সবাই ছিলেন মুজিব বিরোধী'।[৫]

৩. বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল সিকুউরিটি ইনটেলিজেন্স বা এন.এস. আই নামে বাংলাদেশের ইনটেলিজেন্সির নামকরণ করলেন এবং ডিরেক্টরের দায়িত্বে নিয়োগ করলেন এ. বি. এস. সফদরকে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সফদর ও আবদুর রহিম ওয়াশিংটনের আমেরিকান পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য গমন করেন। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নৃশংস গণহত্যা চলাকালে সেদিন যারা প্রবাসে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের অধিকাংশই তখন দেশে ফিরে না এসে প্রবাসেই আন্দোলনে যোগদান করেন। এদের মধ্যে এই দুই জন দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পাক হানাদার বহিনীর অধীনে চাকুরীতে যোগদান করেন।[৬] সফদর পাকিস্তান সামরিক জান্তার অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে ১৯৭০ সনে কেন্দ্রীয় ইনটেলীজেন্সির পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। নির্বাচন সম্পর্কে সফদরের রিপোর্ট ছিল আওয়ামী লীগ শতকরা ৬০টি আসন পাবে। নির্বাচনের ফলাফল ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যুরোর প্রধান এন. এ. রিজভীর বিশ্বস্ততা তিনি হারাননি। সে জন্য দেখা যায়, বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ও এই 'বিশ্বস্ত বাঙালিকে' 'কাউন্টার ইনটেলিজেন্সি'র প্রশিক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান হয়।[৭]

৩.১ এ.বি. এস. সফদর এনটেলিজেন্স বিভাগের কাজে যোগদান করেন আর কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের বিশিষ্ট কর্মকর্তা হিসেবে আবদুর রহিম তার দক্ষতা প্রমাণে তৎপর হন। রাজাকার বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আবদুর রহিম।[৮]

৩.২ ১৯৬৯–এর আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলায় এ. বি এস. সফদর শেখ মুজিবকে ফাঁসানোর জন্য যাবতীয় খবরাদি সংগ্রহ করেছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে পাক সরকার যে ব্রিফ তৈরি করেছিলেন সেটি ছিল সফদরের সংবাদের উপর ভিত্তি করেই। যারা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়

উপস্থিত ছিলেন তারা দেখেছিলেন যে সফদর নিজের হাতে ব্রিফকেস নিয়ে প্রতিদিন কোর্টে যেতেন। বঙ্গবন্ধু এই সফদরকেই গুরুত্বপর্ণ পদে উন্নীত করলেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর মোশতাক সফদরকে এন.এস. আই ডাইরেক্টর জেনারেল পদে প্রমোশন দিলেন।

৩.৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেনিং প্রাপ্ত আবদুর রহিমকে বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিয়েট প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন, যিনি ইয়াহিয়া খানের রাজাকার বাহিনীর প্রধান হিসেবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কাজ পরিচালনা করতেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারিয়েটের প্রায় সকলই যখন অপসৃত অথবা বিদেশে– সেই সময় আবদুর রহিম মোশতাকের পাশে স্বগৌরবে উপস্থিত।

অক্টোবরে পার্লামেন্ট সদস্যদের সমাবেশে মোশতাকের বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে 'নোট' নেবার জন্য বঙ্গভবনে তিনি প্রফুল্লচিত্তে উপস্থিত ছিলেন। জিয়াউর রহমানের সময় তিনি পদোন্নতি পেয়ে সংস্থাপন বিভাগের সচিব নিযুক্ত হন। তার খুঁটির জোর ছিল এমনি পাকা।

৪. বঙ্গবন্ধু তাদের অতীত সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন কিনা এ বিষয়ে সংশয় থাকলেও একটি কথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে বঙ্গবন্ধু কর্মক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তিকে জাতীয় স্বার্থে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। সে জন্য তাদের অতীতকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু মাথা ঘামিয়েছেন বলে মনে হয় না। তাই দেখা যায় সফদর ও আবদুর রহিমের মতো সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। অবশ্য এদের নিয়োগের বাস্তব অবস্থাও দেশে তৈরি হয়েছিল। স্বাধীনতার পর উগ্র ডান ও বামপন্থীদের সশস্ত্র আক্রমণ, খুন, হত্যা, ডাকাতি ইত্যাদি মোকাবিলায়, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে বঙ্গবন্ধু নিরুপায় হয়ে এই সমস্ত 'অভিজ্ঞ অফিসারদের' সাহায্য নিতে শুরু করেন এবং ফলে তাদের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করতে হয়।

৪.১ বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন এই সব কলাবোরেটর অফিসারদের চাকুরিতে পুনর্বাসিত করার ফলে তারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন, নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন।

৫. মিঃ তসলিম উদ্দিন পাকিস্তান ইনটেলিজেন্স দপ্তরে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কোনো এক সময়ে তসলিম উদ্দিন পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে সেন্টোর ইনটেলিজেন্স বিভাগে কাজ করতেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কিছু আগে তিনি আই. জি. পির পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং ২৫শে মার্চ তিনি ঐ পদে ইস্তাফা দেন। বঙ্গবন্ধু ফিরে এসে তাকে হোম সেক্রেটারির পদে নিয়োগ করে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তসলিম উদ্দিন

কিছুদিন পর চাকুরিতে ইস্তাফা দেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর খন্দকার মোশতাক আহমদ তসলিমউদ্দিনকে পুনরায় হোম সেক্রেটারির পদে নিয়োগ করেন।[৯] তবে এ কথাও প্রকাশিত যে তসলিম উদ্দিন ছিলেন নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী।

৬. বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর এম. এন. হুদা আর একজন বেনিফিসিয়ারি। ১৯৬৩ সনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণ করেন এবং পাকিস্তান স্পেশাল ব্রাঞ্চের পদস্থ কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এন. এস. আই–এর ডেপুটি ডাইরেক্টর পদে সফদরের বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে কাজ করতে থাকেন। লিফ্‌স্যুজে লিখেছেন, ১৯৭৬ সনের জুন মাসে তিনি এন. এস. এস. আই হেড কোয়ার্টারে এক সাক্ষাৎকারে হুদাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তারা বঙ্গবন্ধু হত্যা সম্পর্কে জানতেন কিনা অথবা হত্যায় তারা জড়িত ছিলেন কিনা? লিফস্যুজ লিখেছেন, "Hoda laughed and said the question was a very very clever one. But he would not answer."[১০]

৭. এ. এম. আমিনুর রহমান ১৯৬৯ সনের ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ একাডেমির গ্রাজুয়েট। ১৯৭০ সনে পাকিস্তান আর্মির প্যারা মিলিটারি ফোর্স হিসেবে আলবদর বাহিনী সংগঠিত হচ্ছিল। আলবদর বাহিনীর কমান্ড কাউন্সিলের মওলানা মান্নানের সঙ্গে মত ও পথের দিক থেকে তিনি খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ ফোর্সের তিনি কমিশনার নিযুক্ত হন।[১১]

৮. এ. কে. এম. মুসলিহ্ উদ্দিন ১৯৭১ সনে মুসলিম লীগ ও সামরিক জান্তার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে কাজ করেন। তিনি ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সনে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের আই. পি. এ. ও ইনপেলস্ থেকে গ্রাজুয়েশন লাভ করেন। তিনি এস. এস. আই-এর পদস্থ ব্যক্তি হিসেবে কাজ পরিচালনা করতে থাকেন।

৯. আমির খসরু ১৯৭১ সনের একজন কলাবোরেটর। বঙ্গবন্ধু তাকে পুলিশ ক্যাডার হতে সরিয়ে এনে বাংলাদেশের সেই সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিব পদে নিযুক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরপরই তাকে পদোন্নতি দিয়ে সচিব করা হয়।

১০. মুসা মিয়া চৌধুরী যিনি এন. এস. আই-এর ডেপুটি ডাইরেক্টর– তার সম্পর্কে লিফস্যুজ বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছেন যে, সি. আই. এর আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত ইনপোসসে, প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী এই বক্তিটি 'রায়ট কন্ট্রোল' 'কাউন্টার রেভ্যুলেশন' ও 'পুলিশ টেরর' বিষয়াদি সম্পর্কে কিরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বিগলিত ছিলেন এবং এই সমস্ত আইডিয়া

স্বদেশে বাস্তবায়ন করতে তারা কিরূপ পারঙ্গমতার পরিচয় প্রদান করে। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর মুসা মিয়া চৌধুরীকে প্যারামিলিটারি আর্মস্ ব্যাটেলিয়ান সংগঠনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।'[১২]

১১. সালাহউদ্দিন আহমদ ১৯৬৮–৬৯ সনে আইয়ুব-মোনেমের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলন ও ঐ সময়ে শ্রমিক আন্দোলন দমনের জন্য কর্তৃপক্ষের 'সুনাম' অর্জন করেন। কথাবার্তায় অভিজাত এবং কঠোরতাসম্পন্ন এই ব্যক্তিত্ব দেশ স্বাধীন হবার পর রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি (ফাও) প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর তিনি স্বরাষ্ট্র সচিবের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের হাজার হাজার অনুসারীদের কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

১২. পুলিশ প্রশাসনের আলোচনায় ই.এ. চৌধুরী প্রসংগ এসে যায়। দক্ষ ও কর্মক্ষম পুলিশ অফিসার হিসেবে ই. এ. চৌধুরীর সুনাম রয়েছে। পাকিস্তান আমলে, পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর সরকারে তার পদোন্নতি অনেককে ঈর্ষার বিষয়ে পরিণত করেছিল। নিষ্ঠাবান, প্রতিশ্রুতিশীল এবং স্মার্ট এই উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার বাংলাদেশের পুলিশ প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার দিন প্রত্যুষে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এম. মনসুর আলী সংঘটিত কুদেতার বিরুদ্ধে তাঁকে পাল্টা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে মনসুর আলী সাহেবের পুত্র এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন। ই. এ. চৌধুরীর উজ্জ্বল সাফল্যময় জীবনে ঐ একটি মাত্র অপ্রকাশিত ব্যর্থতা যে, তিনি ১৫ই আগস্টে কিছুই করতে পারেননি। অবশ্য সে সময় তিনি ছিলেন ডি আই জি স্পেশাল ব্রাঞ্চ। লিফস্যুজ লিখেছেন, আমেরিকান 'কন্টিনেন্টাল গ্রেইনস' নামক একটি ফার্মের স্থানীয় এজেন্ট হিসেবে শফি আহমদ চৌধুরী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পি-এল ৪৮০–এর অধীনে আমদানিকৃত বিপুল পরিমাণ গম হ্যান্ডেল করেন। এতে তাঁর ভাগ্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। আজ তিনি বাংলাদেশের 'রকফেলার'।

আমেরিকার বশংবদ শফি আহমদ চৌধুরীর ভাই হলেন ই. এ. চৌধুরী।[১৩] এবং কিসিঞ্জার উল্লেখিত কাজী জহিরুল কাইউমের নিকট আত্মীয়।

১৩. অধিকাংশ পুলিশ অফিসার যারা পাক হানাদার বাহিনীর যোগসাজশে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের বিরুদ্ধে 'পিছু নিতে' বাধ্য হয়েছিলেন, স্বাধীনতার পর তারা মানসিক দিক থেকে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন। স্বাধীনতার পরপরই তাদের উপর মুক্তি বাহিনীর খবরদারি ভিতরে ভিতরে পুলিশ

প্রশাসনের র‍্যাক এন্ড ফাইলকে অসন্তুষ্ট করে তোলে। তাদের এ ধরনের অসন্তুষ্ট মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ নানাভাবে ঘটেছে। দুস্কৃতিকারীদের পাকড়াও করার সরকারি নির্দেশ তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মুক্তিযোদ্ধা বিশেষ-করে আওয়ামী লীগ মুক্তিযোদ্ধাদের যেনতেন কারণে ধরে এনেছে, থানায় আটক করেছে এবং জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার ব্যবস্থা নিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই পুলিশ প্রশাসনের থানা, মহকুমা বা জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সরকার বিরোধীরা, অবৈধ, অস্ত্রধারী দল ও গ্রুপ নিরাপদ আশ্রয়ে তাদের গণবিরোধী নিষ্ঠুর কার্যকলাপ চালিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তিকে ধ্বংস করার চেষ্টায় তৎপর থাকতে সমর্থ হয়েছে।

১৪. এ সব কারণে বঙ্গবন্ধু হত্যায় পুলিশ বাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের অফিসারগণ ছিলেন নির্বিকার।

১৫. বঙ্গবন্ধু হত্যার পূর্বে রাত ১২ টার পর হতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তদানীন্তন পুলিশের আইজি নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে ১১টি টিমের বিভিন্ন ব্রাঞ্চের লোক উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাদের এই সম্মিলিত শক্তি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রাক্কালে কোনোই কাজে আসেনি।[১৪]

### বেসামরিক প্রশাসন

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন সময়ে বাঙালি সি, এস, পি অফিসারের সংখ্যা ছিল ১৮০ জন এবং ই, পি, সি, এস অফিসারের সংখ্যা ছিল ৯৫০ জন।

১.১ বাঙালি সি, এস, পি অফিসারের মধ্যে মাত্র ১৩ জন মুক্তিযুদ্ধে মুজিব নগরের প্রবাসী সরকারের সঙ্গে যোগদান করেছেন।[১]

১.২ অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত অফিসারদের মধ্যে পি, এস, পির দুই জন অফিসার এবং ই, পি, সি, এস–এর হাতে গোনা কয়েকজন অফিসারসহ সর্বস্তরের মাত্র ৫০০ জন সরকারি কর্মচারী মুজিব নগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।[২]

২. বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রবাসী সরকার ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করলে শুরু হয়ে যায় অলিখিত প্রশাসনিক সংকট। পাক বাহিনীর সঙ্গে যোগসাজশে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য নয় জন প্রাক্তন সি, এস, পি অফিসারসহ ছয় হাজার কর্মচারী চাকুরিচ্যুত হয়। পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসার ও বাংলাদেশে চাকুরীরত ঐ সময়ের অফিসারগণ সব সময়ই আতঙ্কগ্রস্ত ছিলেন। আমলারা বলতে শুরু করলেন ঃ সংবাদ পত্র দেখে তারপর অফিসে যেতে হবে। কেননা কোনদিন পর্যন্ত তিনি

চাকুরীতে থাকবেন কি থাকবেন না তা তাদের জানা নেই।

২.১ মুজিব নগর প্রবাসী সরকারের কর্মরত অফিসারদের প্রতি স্বাভাবিক সহমর্মিতা ও দুর্বলতা থাকার কারণে প্রতিষ্ঠিত সার্ভিস রুলকে নাকচ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অফিসারদের পদোন্নতি ও সুযোগ–সুবিধা দেয়া হয়।

২.২ অন্যদিকে প্রাক্তন সি, এস, পি অফিসার ও ই, পি, সি, এস অফিসারদের মধ্যে চাকুরির স্তর বিন্যাস ও কাঠামো নিয়ে বিরোধ অব্যাহত থাকে।

৩. ড. মোজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত প্রশাসন ও চাকুরি পুনর্বিন্যাস কমিটি প্রাক্তন সি, এস, পি সিস্টেমকে 'আর্টিফিশিয়েল ইনস্টিটিউশন' নামে আখ্যায়িত করে সকল বড় বড় পদ সি, এস, পি অফিসারদের প্রাপ্য এই প্রথা ও নিয়মকে বাতিল করে দেয়। এতে সি, এস, পি অফিসারগণ ফুঁসতে থাকেন। তারা কোনো কাজ না করে আড্ডা মেরে, গালগল্প করে সময় কাটাতে থাকে।[৩]

৪. সি, এস, পি অফিসারদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু সবচেয়ে বেশি আস্থা যার উপর স্থাপন করেছিলেন তিনি হলেন জনাব রুহুল কুদ্দুস। জেনারেল ইয়াহিয়া দুর্নীতির দায়ে যে সমস্ত অফিসারদের চাকুরীচ্যুত করেন তাদের মধ্যে রুহুল কুদ্দুস অন্যতম। বাঙালি উচ্চ পদস্থ অফিসারকে প্রশাসনিক উচ্চ পদ হতে হটানো হচ্ছে মনে করে সে দিনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জোয়ারে চাকুরিচ্যুত উক্ত অফিসারগণ বাঙালির সমবেদনা লাভ করেন। এ বিষয়ে তদানীন্তন মন্ত্রী প্রফেসর শামসুল হকের নিকট এ সমস্ত অফিসারদের উপর কেন অন্যায় করা হচ্ছে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে বলেছিলেন, "এদের দুর্নীতির বহর দেখলে তোমরা স্তম্ভিত হয়ে যাবে।" জেনারেল ইয়াহিয়ার দোসর হিসেবে সেদিন তার কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু রুহুল কুদ্দুসকে সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল, এক অজ্ঞাত কারণে বঙ্গবন্ধু তার নিকট ফাইল প্রেরণ বন্ধ করেছেন। ১৯৭৪ সনের দুর্ভিক্ষে দেশের হাজার হাজার মানুষ যখন মারা যাচ্ছে তখন রুহুল কুদ্দুসের গুলশানের প্রাসাদ তৈরি হচ্ছে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত রুহুল কুদ্দুসের এই অসময়োচিত আচরণ বঙ্গবন্ধুকে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রতি অবিশ্বাসী ও হতাশ করে তোলে।

৫. আর একজন স্বনামধন্য প্রাক্তন সি, এস, পি অফিসার হলেন শফিউল আযম। স্বাধীনতা সংগ্রাম কালীন সময়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি ছিলেন। পাক হানাদার বাহিনীর আদেশ– নির্দেশ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি পালন করেছেন। স্বাধীনতার কিছুকাল পূর্বে তাকে

পশ্চিম পাকিস্তানে বদলী করা হয়। ১৯৪৯ সনে সি, এস, পি পরীক্ষায় তিনি সমস্ত পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম হন। পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যোগসাজশকারী এই 'প্রবীণ' ও 'মেধাবী' সি, এস, পি অফিসার স্বাধীন বাংলাদেশে চাকুরী না পেয়ে গোপনে বঙ্গবন্ধু বিরোধী সি, এস, পি'দের পরামর্শ দাতার ভূমিকা গ্রহণ করলেন। বোধগম্য কারণে তার ভূমিকা বঙ্গবন্ধুর স্বপক্ষে ছিল না।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর পরই এই জ্ঞানী অফিসারটি চাকুরিতে উচ্চাসন লাভ করেন এবং চাকুরিতে নিয়ম বিরুদ্ধে পদোন্নতি সম্পর্কিত রিভিউ কমিটির প্রধান হয়ে বঙ্গবন্ধুর আমলের পদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ ও এডমিনিস্ট্রেশনকে 'ক্লিন' করার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। অচিরেই পাকিস্তানপন্থী অফিসারদের যথাযোগ্য আসন ও মর্যাদায় উন্নীত করে তিনি তাদের সমহিমায় পুনর্বাসিত করলেন।

৬. স্বাধীনতার পরপরই পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামোকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জাতীয় কাঠামোতে রূপান্তরিত করা ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। আমলাদের ভেতর মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা, পাকিস্তান প্রত্যাবর্তকদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব নিরসনও সহজসাধ্য ছিল না। বঙ্গবন্ধু এই সংকট নিরসন করতে গিয়ে কোনো পক্ষেরই পূর্ণ আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হলেন না।

৭. এ ছাড়া স্বাধীনতার কিছুকাল পরে যুবলীগের প্রধান শেখ ফজলুল হক মনি সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী প্রচার করতে লাগলেন যে আইয়ুব-মোনায়েমের আমলা দিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রশাসন চলতে পারে না। এ ধরনের প্রচার আমলাবাহিনীকে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধ অবস্থানে ঠেলে দেয়।

৮. স্বাধীনতার মৌল লক্ষ্য শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু প্রশাসনকে ঢেলে সাজাতে চাইলে ডাক সাইটে আমলাগণ মুখে যাই বলুন না কেন ভেতরে ভেতরে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে তারা বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠকদের মদদ জোগাতে থাকে। সরকারি যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পূর্বেই তা ঢাকার সাধারণ লোকের মুখে মুখে শোনা যেত। এমন হতো যে, গুরুত্বপূর্ণ কোনো অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত যার গুরুত্ব ও কার্যকারিতা নির্ভর করত গোপন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর- তা পূর্বে প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং তাতে বঙ্গবন্ধু ও তার সরকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে।

৯. বঙ্গবন্ধু কথা প্রসঙ্গে প্রায়ই বলতেন আমার প্রশাসনের শতকরা ৮০ ভাগ কলাবোরেটর। সেই প্রশাসন বঙ্গবন্ধু সরকারের জন্য কোনো ক্রমেই শুভ ছিল না।

১০. ১৯৭৪ সনে দেশে আর্থ–সামাজিক, আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতি ঘটলে বঙ্গবন্ধু অভিজ্ঞ আমলাদেরকে কনফিডেন্স নেবার প্রয়াসে তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে উন্নীত করেন। বঙ্গবন্ধুর ধারণা ছিল এই সমস্ত আমলারা তাদের পূর্বের বদনাম মোচন করার জন্য দেশ ও জাতির জন্য যথাসাধ্য কাজ করবে এবং দেশ সেবায় অবদান রাখবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থায় প্রমাণিত হয়েছে পাক আমলের আমলাদের না ছিল কোনো চরিত্র, না ছিল কোনো আদর্শ। ফলে বঙ্গবন্ধু এদের উপর ভরসা করে ঠকেছেন বারবার।

১১. প্রশাসনকে গণমুখী, কার্যকর, জনগণের আস্থাভাজন করার জন্য বঙ্গবন্ধু বললেন, "নতুন সিস্টেম চাই, সেক্রেটারিয়েট থেকে থানা পর্যন্ত প্রশাসনকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে।" আমলাগণ সতর্ক হলো।
বঙ্গবন্ধু যখন প্রচলিত আমলাতন্ত্র বাতিল করে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেবার লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো জেলা গভর্নরদের মনোনীত করলেন তখন আমলাগণ ক্ষিপ্ত হলো। জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণকালে আমি ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য করেছি, বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন জেলার আমলাদের মধ্য থেকে যে সমস্ত গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন তারা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারা মনে করতেন, তাদের ডিগ্রেডেশন করা হয়েছে। লক্ষ্য করেছি জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন কালে জনৈক কবি সি, পি-গভর্নর ছড়া লিখতেন টিপ্পনী করতেন এবং হাসাহাসি করতেন।

১২. আর একটি কথা বলা এখানে একান্তই প্রয়োজনীয় যে, ব্রিটিশ উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া স্টিলফ্রেমে বাঁধা আমলাতন্ত্র সব সময়ই গণবিরোধী এবং গণবিচ্ছিন্ন। এরা জনগণের সেবক নয়, শাসক সেজে থেকেছে এবং থাকতে ভালোবাসে। সে জন্য বঙ্গবন্ধু ঘোষিত বাকশাল কর্মসূচির লক্ষ্য শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপযোগী প্রশাসনিক পরিবর্তন সকল শ্রেণীর আমলাকে করেছে সতর্ক ও বিক্ষুব্ধ।

১৩. এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু প্রশাসনের অভ্যন্তরে মার্কিন পন্থীদের আসন ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সচিব রফিক উল্লাহ চৌধুরীর বাড়িতে সন্ধ্যার পর প্রায়ই জমতো জমজমাট আড্ডা। আওয়ামী লীগের মার্কিনপন্থী নেতৃবৃন্দ, ডালিম চক্র, শিল্পপতি, সাংবাদিক, অফিসার ও বিদেশী দূতাবাসের মেহমানদের সম্মিলিত আড্ডায় নানা কেচ্ছা কাহিনী বিবৃত হতো। শেখ মুজিবকে নিয়ে ক্যারিক্যাচার হতো। ঠাট্টা হাসি হতো। তাদের টেবিলে দুর্নীতি, ষড়যন্ত্রের নির্ঘুম রাত কাটতে থাকে। ...

## সামরিক বাহিনী

১. ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ানদের সংখ্যা ছিল ৫৫ হাজার। তার মধ্যে পাকিস্তান প্রত্যাগত জওয়ানদের সংখ্যা ছিল ২৪ হাজার এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জওয়ান ও মুক্তিযুদ্ধে নতুন করে রিক্রুটদের মিলিয়ে সর্বমোট ছিল ২৭ হাজার। পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসারদের সংখ্যা ছিল ১১ শত। পাকিস্তান প্রত্যাগত সেনাবাহিনীর জওয়ানগণ এক কথায় বলতে গেলে রক্ষণশীল, ভারত বিদ্বেষী এবং স্বাধীনতা বৈরী মুসলিম বিশ্বের প্রতি অনুরক্ত ছিল।[১]

১.১ রক্ষীবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ২০ হাজার।

১.২ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকগণও ভারত বিদ্বেষী ছিলেন।
"Almost all members of the armed foreces who had balonged to the Libaretion Army had the feeling that the Indian Army Just walked into Bangladesh when we had already finished the job." এ ধারণাকে সামনে রেখে তারা মনে করত বাংলাদেশের সশস্ত্র এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে ভারতীয় বাহিনী ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

১.৩ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পিকিংপন্থী দল, উপদল, জাসদ, গণবাহিনী ও স্বাধীনতা বৈরী শক্তির সার্বক্ষণিক প্রচারে, সেনাবাহিনীর নিকট বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে যে, ভারত তাদের সকল হাতিয়ার নিয়ে গিয়েছে। তাদেরকে অথর্ব, শক্তিহীন করে রাখা হয়েছে।

১.৪ এই ধারণার সাথে রক্ষী বাহিনী গঠন, ভারতীয় ট্রেনার দ্বারা রক্ষী বাহিনীর অফিসারদের প্রথমে সাভারে ট্রেনিং এবং পরবর্তীকালে রক্ষী বাহিনীর অফিসারদের ভারতের দেরাদূনে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো ইত্যাদি মিলিয়ে সেনাবাহিনীর মানসিকতার অবিশ্বাস ও ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে।

১.৫ যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন, উন্নয়নশীল কার্যক্রমের দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর আমলে প্রতিরক্ষা খাতে সমগ্র বাজেটের শতকরা ১৩ ভাগের বেশি বরাদ্দ করা জাতীয় নীতির সহায়ক নয় বলে বিবেচিত হয়েছিল। আর্থ–সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় না রেখে সেদিন সেনাবাহিনীর ভেতর ও বাইরে থেকে প্রচারিত হতে থাকল যে, বঙ্গবন্ধু ও তার সরকার সেনাবাহিনীকে দুর্বল ও পরনির্ভরশীল করে রাখতে চায়। সাধারণ জোয়ান অফিসারবৃন্দ পাকিস্তান আমলে তাদের প্রাপ্ত সুযোগ–সুবিধার তুলনামূলক বিচার করে মানসিকভাবে এই সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছিল যে, মুজিব ভারতের নির্দেশে সেনাবাহিনীকে পশ্চাদপদ, নিরুপায় ও দুর্বল করে রেখেছে। ফলে যে সব মিথ্যাচার বাজারে গুজব আকারে চালু ছিল তাতেই তারা বিশ্বাস স্থাপন করত।

১.৬ সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান ভারত বিদ্বেষী মনোভাব ক্রমান্বয়ে মুজিব বিরোধী মনোভাবে রূপান্তরিত হয়।

১.৭ মুজিব বিরোধী এই মনোভাবের আরো একটি কারণ ছিল আর তাহলো পাকিস্তানী প্রত্যাগত সামরিক জওয়ান ও অফিসারগণ পাক 'কনসেনট্রেসন ক্যাম্প'-এ যে ১৮ মাস আটক ছিলেন সে মাসগুলোর বেতন দাবী করেন। বলাবাহুল্য বঙ্গবন্ধুর সরকার সে দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে সেনাবাহিনী ও জওয়ানদের স্বার্থহানি হওয়ায় তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।[২]

১.৮ বঙ্গবন্ধুর সরকার অবিভক্ত বাংলার সিভিল সার্জেন্ট ও প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সচিব জনাব এ, রবকে প্রধান করে জাতীয় পে কমিশন গঠন করেন। কমিশনকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেতনের স্কেল নির্ধারণের পরামর্শ দেয়া হয়। কমিশন তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলকে বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও পূর্ব জার্মানিতে সে দেশের পে পলিসি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রেরণ করেন। সে দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন জিয়াউর রহমান। কমিশন পরামর্শ প্রদান করে এভাবে "Bangladesh should have pay policy involving sharing of hardship in an equitable manner."[৩]

অথচ এই পে কমিশনের একজন প্রভাবশালী সদস্যরূপে জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর জন্য যে গ্রেডের ও পে স্কেলের সুপারিশ করেন তা সেনাবাহিনীর বিক্ষোভকে আরো উত্তপ্ত করে তোলে। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর মনোভাব আরো বিরূপ হয়ে ওঠে।

জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর মাথা গরম করার জন্য এই কৌশল গ্রহণ করেছিলেন বলে সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অফিসারদের কেউ কেউ মনে করেন।[৪]

১.৯ বঙ্গবন্ধুর আমলে প্রতিরক্ষা খাতে সমগ্র বাজেটের মধ্যে ১৩ ভাগ ব্যয় হতো। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর জিয়া ক্ষমতায় এলে প্রতিরক্ষা খাতের বাজেটের পরিমাণ দাঁড়ায় সমগ্র বাজেটের ২৫–৩০% ভাগ।

১.১০ সেনাবাহিনীর মাথাব্যথার কারণ ছিল জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন। ১৯৭২ সনে রক্ষীবাহিনী গঠনের পর তাদের সদস্য সংখ্যা ১৯৭৫ সনে ২০ হাজারে উন্নীত হয়। প্রচার করা হতে থাকে রক্ষীবাহিনীকে নতুন নতুন গাড়ি ও অস্ত্র দ্বারা সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। প্রকৃত প্রস্তাবে জনশৃংখলার স্বার্থে প্যারামিলিটারি বাহিনী হিসেবে রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছিল। তাদের কোনো আর্মড কোর ও আর্টিলারি ছিল না। বঙ্গবন্ধু ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীকেও গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন। তিনটি ট্যাংকের জায়গায় মিশর থেকে আরো ৩০টি ট্যাংক নিয়ে এলেন। সোভিয়েত

থেকে এল এক স্কোয়াড্রন মিগ–২১। বিভিন্ন দেশ থেকে সামরিক সরঞ্জাম আসতে শুরু করে।[৫]

বিগ্রেডগুলোকে ডিভিশনে উন্নীত করার অনুমোদন তিনি প্রদান করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও ব্যাপক মিথ্যা প্রচারে সেনাবাহিনীতে বঙ্গবন্ধু বিরোধী মনোভাবের প্রসার ঘটতে থাকে। এ মনোভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে সেদিনের চতুরতা ও খলতা সম্পর্কে সামরিক বাহিনীর পদস্থ এক অফিসার লিখেছেন– "অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য জাতীয় রক্ষীবাহিনী নামে একটি নতুন আধাসামরিক বাহিনী গঠন করা হলো। রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে বিভিন্ন কথা আছে—পক্ষে ও বিপক্ষে। আইন–শৃঙ্খলা রক্ষা করতে যেয়ে এ বাহিনী যে কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করেছিল, তা বিতর্কের উর্ধ্বে ছিল না। তাছাড়া রক্ষী বাহিনী ভারত সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলে অনেকে মিথ্যা প্রচার করতো। রক্ষীবাহিনীর জলপাই সবুজ রংয়ের পোশাক এ অপপ্রচারে সাহায্য করতো। আর সেনাবাহিনীতে রক্ষীবাহিনী সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া ছিল অতন্ত বিরূপ। সেনাবাহিনীতে প্রচার হতে লাগলো যে, রক্ষীবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্র দেয়া হচ্ছে, যা সেনাবাহিনীকে দেয়া হচ্ছে না, রক্ষীবাহিনীকে নতুন গাড়ি দেয়া হচ্ছে, তাদের রেশন ও বেতন সেনাবাহিনীর চাইতে বেশি। এ রকম প্রচারণাও ছিল যে বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করে রক্ষী বাহিনীকেই দায়িত্ব দেবেন। প্রকৃতপক্ষে এ সব প্রচারণার কোনোটাই সত্য ছিল না। অনেকটা ছিল উদ্দেশ্যমূলক, আর কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির ফল। আর সেনাবাহিনীর কিছু উচ্চপদস্থ অফিসার এ প্রচারণার নেতৃত্বে ছিল। পয়লা নম্বরে ছিল প্রয়াত রাষ্ট্রপতি সেনাবাহিনীর তৎকালীন উপ-প্রধান জিয়াউর রহমান। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরপর যখন রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত হয়ে সেনাবাহিনীর সাথে একীভূত হয় তখন সেনাবাহিনী সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত রক্ষীবাহিনীর একীভবন সম্পর্কিত একটি সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। জিয়াউর রহমান তখন সেনাবাহিনীর প্রধান বা চীফ অব আর্মি স্টাফ। জিয়াউর রহমান উক্ত সভায় এক পর্যায়ে বলেছিল, "রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই ভ্রান্ত ছিল। এখন দেখছি তাদের কিছুই নেই। তাদের অস্ত্র সেনাবাহিনীর চাইতে অনেক নিম্নমানের। গাড়ি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ছিল।" অনিচ্ছাসত্ত্বেও জিয়াউর রহমান উক্ত স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রক্ষীবাহিনী ছিল একটি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী বা আধা-সামরিক বাহিনী। সেনাবাহিনীর মতো ট্যাংক, কামান, বিমান-বিধ্বংসী কামান, ট্যাংক–বিধ্বংসী কামান, মাইন ইত্যাদি তাদের থাকার কথা নয়, ছিলও না। নতুন বাহিনী হিসেবে কিছু নতুন গাড়ি তাদের দেয়া হয়েছিল, কিন্তু

প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অপ্রতুল। সে তুলনায় সেনাবাহিনীকে অনেক অনেক বেশি নতুন গাড়ি দেয়া হয়েছিল, যদিও সেনাবাহিনীর জন্যও তা যথেষ্ট ছিল না। রেশন ও বেতনের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী ও রক্ষী বাহিনীর মধ্যে কোনো তারতম্য ছিল না।

স্বাধীনতার পর সেনাবাহিনীর প্রথম চিফ অব স্টাফ নিয়োগ নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে জিয়াউর রহমানের কথাবার্তা ও কার্যকলাপে তার রাজনীতি বিরোধী মনোভাব ধরা পড়েছিল। তাছাড়া ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে প্যাক বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নেতিবাচক। তাই জিয়াউর রহমান সিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও তাকে ডিঙিয়ে কে, এম শফিউল্লাহকে সেনাবাহিনীর প্রধান বা চিফ অব স্টাফ নিয়োগ করা হয়। সরকার সশস্ত্র বাহিনীত্রয়ের প্রধান সেনাপতি নিয়োগে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এটা চিরাচরিত নিয়ম। জিয়াউর রহমানকে ডিঙিয়ে কে, এম শফিউল্লাকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করা সঠিক হয়েছিল কিনা জানি না। তবে যা সঠিক হয়নি বলে মনে করি, তা হচ্ছে অতঃপর জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীতে রাখা। জিয়াউর রহমানকে যদি দীর্ঘদিন ধরে সেনাবাহিনীর দুই নম্বর; অর্থাৎ উপ-প্রধান পদে রেখে কে, এম শফিউল্লাহ– এর সাথে একটার পর একটা পদোন্নতি দিয়ে মেজর জেনারেল বানানো যায়, তাহলে তাকে এক নম্বর; অর্থাৎ সেনাবাহিনী প্রধান না করার যুক্তি অনেকটা দুর্বল হয়ে যায় বৈকি! জিয়াউর রহমান স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ ছিল। যে কেউ তার জায়গায় হলে অনুরূপভাবে ক্ষুব্ধ হতো, কিন্তু সে খুব একটা ধরা দিতো না। বঙ্গবন্ধু থেকে শুরু করে তোফায়েল আহমদ পর্যন্ত সকলের সাথে সে নিয়মিত সাক্ষাৎ করতো। সকল উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নেতার বাড়ি মাঝে মাঝে সে যেতো তার আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য। এটা ছিল তার বাইরের রূপ। ভেতরে ভেতরে সে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার এবং অপপ্রচার চালানোর জন্য সে বিভিন্ন স্তরে কাজ শুরু করে। অফিসারদের মধ্যে কাজ করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে তার প্রতি অনুগত, এমন কিছু অফিসারকে সে নিয়োগ করে। অনুরূপভাবে জেসিও, এনসিও এবং সৈনিকদের মধ্যে কাজ করার জন্য কয়েকজন জেসিওকে নিয়োগ করে। সেনাবাহিনীতে অশুভ কিছু ঘটলে তার দায়িত্ব পড়তো কে, এম শফিউল্লাহর কাঁধে। আর শুভ কিছু ঘটলে সাথে সাথে সেনাবাহিনীতে প্রচার হয়ে যেতো যে, তা জিয়াউর রহমানের কারণেই ঘটেছে। সিনিয়ার অফিসারদের মধ্যে মীর শওকত আলী, এম, এ, মঞ্জুর

এবং নূরুল ইসলাম শিশু জিয়াউর রহমানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল। ভারত বিরোধী প্রচারণায়ও এরা সক্রিয় ছিল। ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের নায়কদের সাথেও এদের যোগাযোগ হয় এবং ষড়যন্ত্রকারীরা অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

অন্যদিকে লেঃ কর্নেল আবু তাহের ও কর্ণেল জিয়াউদ্দিন (জাসদের মেজর জিয়াউদ্দিন নয়) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে তাড়িত হয়ে সেনাবাহিনীতে কিছু কিছু শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। উভয়েই এম. এ. মঞ্জুরের সাথে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। উভয়েই বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে আবু তাহের মারাত্মকভাবে আহত হয়ে একটি পা হারায়। দক্ষ তরুণ অফিসার হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে জিয়াউদ্দিনের যথেষ্ট সুনাম ছিল। সে ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে, আর আবু তাহের ছিল বেলুচ রেজিমেন্টে। স্বাধীনতার পর জিয়াউদ্দিন ঢাকাস্থ ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার থাকাকালীন সময় তার একটি বিতর্কিত নিবন্ধ প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে ইংরেজি সাপ্তাহিক 'হলিডে'তে ছাপা হয়। নিবন্ধে তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে জিয়াউদ্দিন বঙ্গবন্ধু এবং তার সরকারের সমালোচনা করে। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে হৈ চৈ হয়। বঙ্গবন্ধু তখন বিদেশে। দেশে ফিরে এসে তিনি জিয়াউদ্দিনকে ডেকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে তার এ কাজটি সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলাভঙ্গের আওতায় পড়ে এবং সে লিখিতভাবে দুঃখ প্রকাশ করলেই বিষয়টি শেষ হয়ে যাবে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত জিয়াউদ্দিন দুঃখ প্রকাশ করেননি এবং সে চাকুরিচ্যুত হয়। পরবর্তীকালে জিয়াউদ্দিন প্রয়াত কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন গুপ্ত সংগঠন পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টিতে যোগ দেয় এবং সম্ভবত এখন সেই গুপ্ত সংগঠনের একটি অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আবু তাহেরও সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত হয়ে বেসামরিক সরকারি চাকুরিতে যোগ দেয়। সেনাবাহিনীতে থাকতেই সে জাসদের সাথে সম্পৃক্ত হয়। সেনাবাহিনীতে জাসদের সংগঠন 'সৈনিক সংস্থা' তারই সৃষ্টি, যার সাহায্যে যে ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বরের তথাকথিত সিপাই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়ে জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতায় আনেন। পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমান তাকে ফাঁসি দেয়। বলাবাহুল্য আবু তাহেরের মাধ্যমে জাসদের সাথেও জিয়াউর রহমানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধারা সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে দুইবছরের জ্যেষ্ঠত্ব নিয়ে নেয়। এর ফলে পাকিস্তান

থেকে প্রত্যাগমনকারীগণ বিক্ষুব্ধ হয়। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধারা সাময়িকভাবে সন্তুষ্ট হলেও অন্যান্য কারণে তাদের অসন্তোষ বাড়তে থাকে; কারণ তাদের আরো অনেক বেশি প্রাপ্য ছিল বলে অনেক মুক্তিযোদ্ধা মনে করতো। ষড়যন্ত্রকারীরা ঠিক এটাই চেয়েছিল। অসন্তোষ, ক্ষোভ, বিক্ষোভ, ভুল বুঝাবুঝি, গ্রুপিং বা দলাদলি সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে এ রকম পরিস্থিতিতে তাদের সরকার বিরোধী প্রচারণা চালাতে সুবিধে হয়েছিল।

পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের প্রত্যাগমনের পর সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা আর প্রত্যাগতদের মধ্যে দ্রুতগতিতে বিভেদ ও ভুল বুঝাবুঝি শুরু হয়। এ ব্যাপারে জিয়াউর রহমানের অবদান সবচেয়ে বেশি, কিন্তু সে তার কার্যব্যবস্থা পরিচালনা করতো অত্যন্ত সুচতুরভাবে। সে প্রত্যাগতদের সাথে সুসম্পর্ক রেখে চলতো, কিন্তু গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের উস্কিয়ে দিতো প্রত্যাগতদের বিরুদ্ধে। প্রত্যাগতদের মধ্যে কিছু অফিসারের আস্থা অর্জন করে অনুরূপভাবে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলতো মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে। এখানে একটি ছোট ঘটনা প্রাসঙ্গিক হবে। চুয়াত্তরের প্রথম দিকের কথা। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত পুরাতন বন্ধুদের সাথে আমার সদ্ভাব অক্ষুণ্ন ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাদের সাথে আমার মেলামেশার বিষয়টি জিয়াউর রহমানের চোখ এড়ায়নি। একদিন তার অফিসে আলাপ প্রসঙ্গে একজন বন্ধুর নাম উল্লেখ করে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, "তার সাথে তোমার সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ কেন?" আমি উত্তরে বললাম যে, "আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু।" এরপর জিয়াউর রহমান আমাকে জিজ্ঞাসা করলো "তার বাড়ি কি ফরিদপুর জেলায়?" বুঝতে পারলাম জিয়াউর রহমান আমাদের বন্ধুত্ব জেলাভিত্তিক সম্পর্ক কিনা জানতে চাইছে। আমি উত্তরে বললাম, "তার বাড়ি ফরিদপুর জেলায় নয় এবং আমি জেলাভিত্তিক চিন্তা-ভাবনার ঊর্ধ্বে। সে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু এটাই যথেষ্ট।" জিয়াউর রহমান একটু মুচকি হাসলো এবং সাথে সাথে একবার তার নিজের চোখে টিপ মারলো। কথা বলার সময় বিশেষ মুহূর্তে নিজের চোখে টিপ মারা জিয়াউর রহমানের একটা দুষ্ট মুদ্রাদোষ বলে আগেই আমার কাছে ধরা পড়েছিল। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে সে বললো, "শওকত, কোন প্রত্যাগত অফিসার তোমার বন্ধু হতে পারে না।"

তোমার মতো একজন মুক্তিযোদ্ধার পাকিস্তানীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। হঠাৎ করে আমি যেন দিব্যদৃষ্টি পেলাম। সেনাবাহিনীতে তখন যে সকল ঘটনা ঘটেছিল আমার কাছে তার অনেক কারণ পরিষ্কার

হয়ে উঠলো। অবশ্য আগেও কিছু কিছু জানতাম, কিন্তু এভাবে জিয়াউর রহমান আমার কাছে ধরা দেবে তা আশা করিনি। আমি কিছুটা উত্তেজিত হয়ে তাকে বললাম, "স্যার আমি দুঃখিত। আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। যারা পাকিস্তানে আটক ছিল তারা এ মাটিরই সন্তান, তারাও বাঙালি তাদের মধ্যে অনেক দেশপ্রেমিক বাঙালি আছে। আপনি যার কথা বলেছেন, সে একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। পাকিস্তানে যারা আটক ছিল আপনিও তাদের একজন হতে পারতেন। যারা পাকিস্তানে আটক ছিল তারা এখানে থাকলে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো, এ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আর বন্ধুত্বের কথা বলছেন? পাকিস্তানে আটক থাকার কারণে তার সাথে আমার বন্ধুত্ব এতটুকু খাদ ধরেনি। আমাদের বন্ধুত্ব অটুট আছে এবং থাকবে। স্যার, অনুগ্রহ করে আপনি খেলা বন্ধ করুন। জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করে সেনাবাহিনীতে বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান। আপনি যদি এ ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক কাজে লিপ্ত হন, তাহলে আমাদের জুনিয়ারগণ কি করবে?" কথাগুলো বলে আমি চলে আসি। কড়া কথা ইচ্ছে করেই বলেছিলাম। এ জন্য অবশ্য আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে। খন্দকার মোশতাকের আমলে সেনাবাহিনীর প্রধান হয়ে জিয়াউর রহমান প্রথমেই আমাকে সেনাবাহিনী থেকে অবসর দেয়। পরবর্তীকালে ক্ষমতার শীর্ষে বসে জিয়াউর রহমান আমার বিরুদ্ধে যে সব হয়রানিমূলক পদক্ষেপ নেয়, তার জের এখনো চলছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আমিও বিতর্কের ঊর্ধ্বে ছিলাম না। বঙ্গবন্ধুর সাথে ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন আসামী থাকাকালীন সময় থেকে তাঁর সাথে যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে; তা স্বাধীনতার পরও ছিল। এ কারণে কারো আক্রোশ, কারো বিদ্বেষ আবার কারো ঈর্ষার লক্ষ্যবস্তু ছিলাম। তাছাড়া সেনাবাহিনীতে বিভেদের কারণে অনেক প্রত্যাগত বন্ধু আমাকেও তাদের বিরোধী দলভুক্ত বলে মনে করতো। আবার প্রত্যাগতদের প্রতি পূর্বোল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আমাকে ভুল বুঝেছে। আমি এ সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও কিছু করার ছিল না। গায়ে পড়ে কারো কাছে কোনো কৈফিয়ত দেয়াও প্রয়োজন মনে করিনি। ফলে অনেক খেসারত দিয়েছি।

জিয়াউর রহমানের আরেক দিনের ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। জিয়াউর রহমানের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের অনেক খবরই বঙ্গবন্ধু রাখতেন, কিন্তু বঙ্গবন্ধু মোটেই বিচলিত হতেন না। একবার তাঁকে

হাসতে হাসতে বলতে শুনেছি, "জিয়া একজন মুক্তিযোদ্ধা। এখনো ছেলেমানুষ। দেশের অবস্থা ভালো না। তাই মাঝে মাঝে আমার উপর অভিমান করে একটু আধটু ষড়যন্ত্র করে। যাহোক যে ঘটনার কথা বলছিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডিস্থ ৩ নং রোডের বাড়ির তিন তালার একটি কামরায় কে, এম, শফিউল্লাহ, জিয়াউর রহমান, শাফাত জামিলের সাথে আমি ছিলাম। আমরা বঙ্গবন্ধুর সাথে একটি জরুরি বিষয় আলোচনা করতে গিয়েছিলাম। জিয়াউর রহমানই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। আলোচনা শেষে হঠাৎ জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বললো, "স্যার আমার বুক বিদ্ধ না করে বুলেট আপনার গায়ে লাগতে পারবে না।" জিয়াউর রহমানের বঙ্গবন্ধু বিরোধী ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম, বলে বঙ্গবন্ধু ও আমরা বাকী তিন জন জিয়াউর রহমানের কথাগুলো উপভোগ করেছিলাম। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, জিয়াউর রহমানের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের তথাকথিত অভ্যুত্থান ঘটাতে কেউ সাহস পেতো না এবং জিয়াউর রহমানের উপরোক্ত কথাগুলো ছিল নিছক ভাওতা।[৬]

### ফুসে থাকা শিল্পপতি

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম মৌল লক্ষ্য ছিল শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তানের কথিত বাইশ পরিবারের শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত বাঙালি জাতি শোষণমুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম করেছে এবং স্বাধীনতা এনেছে। লরেন্স জে, হোয়াইট দেখিয়েছেন বাইশ পরিবার নয় ৪৩ পরিবার সমগ্র পাকিস্তানের স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কার্যসমূহের ৭২.৮ ভাগ, ম্যানুফাকচারিং প্রতিষ্ঠানসমূহের ৭৭.৩ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করত। এরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাইভেট ফার্মের ৪৫.১ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করত।

১.২ এই ৪৩ পরিবারের মধ্যে একটি মাত্র বাঙালি পরিবার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৪৩ পরিবারের মধ্যে তার স্থান ছিল ২৯ তম। পরিবারের ১৪টি কোম্পানি বীমা পরিসম্পদের ৭৫ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করত। এ, কে খান এই ১৪টি বড় ধরনের কোম্পানির মধ্যে শতকরা ২ ভাগের মালিক ছিলেন, অর্থাৎ বাঙালি শিল্পপতিদের মধ্যে এ, কে, খান ছিলেন বিশিষ্ট।[১] শিল্পপতি ছাড়াও এ, কে, খানের রাজনৈতিক পরিচয় ছিল। তিনি জেনারেল আইয়ুব খানের আমলে পাকিস্তানের মন্ত্রী হয়েছিলেন।

১.৩ স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু এ, কে, খানসহ বাঙালি শিল্পপতিদের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষকরে পাট, বস্ত্র, চিনি ও ভারী শিল্প জাতীয়করণ করেন।

১.৪ ফলে বাঙালি শিল্পপতিগণ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারের ঘোরতর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

২. এই শিল্পপতিদের উন্নতি ও বিকাশ ঘটেছিল মুসলিম লীগ সরকার ও নেতাদের বদৌলতে। শুধু তাই নয়, বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে এ সব শিল্পপতির সব সময়ই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল পাকিস্তানী শাসকদের সঙ্গে। পাকিস্তানী শাসকদের জীবনাচরণ এরা রপ্ত করেছিল।

২.১ পাকিস্তানী অভিজাত শ্রেণীর সাথে পাক সামরিক অফিসারবৃন্দের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ ও পারস্পরিক পরিপূরকমূলক।

২.২ সে জন্য দেখা যায়, স্বাধীনতা যুদ্ধে এ সকল শিল্পপতিদের অধিকাংশই নিরাপদে জীবন যাপন করেছে। পাক সামরিক বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে।

৩. এ, কে, খানের কন্যার পাণি গ্রহণ করেছেন আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা ও বঙ্গবন্ধু সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী এম, আর সিদ্দিকী। বাণিজ্য মন্ত্রী থেকে এম, আর সিদ্দিকীকে সরিয়ে বঙ্গবন্ধু তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ করেন। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর এম, আর সিদ্দিকী রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে কুখ্যাত শান্তি বাহিনী চুক্তি করলে তাকে পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

৪. এ, কে, খানের এক ভাই, এম, এস, খান। এই ভাইয়ের দুই মেয়ের দুই স্বামী কর্নেল রশিদ ও কর্নেল ফারুক।

৫. এই সকল পাকিস্তানী ও দেশী শোষক দালালদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বললেন যে, আমি ব্যাংক, বীমা, পাট, বস্ত্র, চিনি, রসায়ন শিল্পকারখানাসহ সকল মৌল ও ভারী শিল্পকে জাতীয়করণ করে শোষণের চাবিকাঠি ভেঙ্গে দিয়েছি। বড় বড় শোষক গোষ্ঠীর কালো হাতকে বঙ্গবন্ধু বেঁধে ফেললেও আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় কালোবাজারী, মজুতদার, মুনাফাখোর, চোরাচালানী চলতে থাকে। দেশে গড়ে উঠে নব্য এক অসাধু বণিক গ্রুপ। এ সব বিজনেসম্যান বা ব্রিফকেস ব্যবসায়ী শ্রেণী অবাধে দেশের অর্থনীতিকে অবনতির পথে নিয়ে যায়। মুনাফা অর্জনের জন্য হেন পন্থা নেই যা তারা গ্রহণ করত না। এদের অধিকাংশই ছিল 'সিক্সটিন ডিভিশনের' লোক।

৫.১ এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুর্নীতি চলত সরকারি অফিসসমূহে। টিসিবি প্রায় তিন শত পণ্য আমদানি ও সারা দেশে বাজারজাত করার দায়িত্ব লাভ

করে। দেখা গেল টিসিবি হয়ে দাঁড়াল দুর্নীতির বিরাট আখড়া।

৫.২ বঙ্গবন্ধুর সরকার রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য প্রতি থানায় দশটি করে স্বল্প অংকের আমদানি লাইসেন্স প্রদান করেন। এর বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে অপপ্রচার চলতে থাকে। এরা ব্যবসা না করে প্রকাশ্যেই লাইসেন্স বিক্রি করতে থাকে। লাইসেন্স আমদানিকৃত মালামাল নির্ধারিত এলাকায় গেল না। পথেই বিক্রি হয়ে যেতে থাকে। বলাবাহুল্য, এই স্কিমের অধীনে ইস্যুকৃত পাঁচ হাজার লাইসেন্সে আমদানির পরিমাণ ছিল মোট আমদানির মাত্র ২৩ ভাগ। বাকী ৭ ভাগের সিংহ ভাগ পাকিস্তানী আমলে আমদানিকারকদের হাতেই ছিল।[২] সে জন্য ভোগ্য পণ্যের কৃত্রিম সংকট যদি কেউ তৈরি করে থাকে তাহলে পুরাতন আমদানিকারকেরাই করেছে। যার অধিকাংশই ছিল মুসলিম লীগ সমর্থক এবং স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি। নব্য উটকো ব্যবসায়ী এদের সাথে যুক্ত হয়েছে মাত্র।

৫.৩ পরবর্তীকালে বাণিজ্যমন্ত্রী এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান অভিযোগ করেছেন যে ২৫ হাজার লাইসেন্সের মধ্যে ১৫ হাজার ভূয়া। অসৎ নব্য রাজনৈতিক কর্মীদের লাইসেন্সের সংখ্য ৫ হাজার হলে বাকী ১০ হাজার ভূয়া লাইসেন্সের অধিকারী কারা ছিলেন? নিশ্চয়ই পুরাতন লাইসেন্সধারীগণ। কিন্তু যত দোষ নন্দ ঘোষ, এর পুরো সমালোচনার বলি হল আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু।

৫.৪ জনগণ আমদানিকৃত কৃত্রিম পণ্যের সংকটে দুর্ভোগে পড়েছে। শিশুর জন্য দুধ পায়নি, খাবার তেল পায়নি, লবণের সংকট, তার পুরো দায় দায়িত্ব সরকার ও বঙ্গবন্ধুর ঘাড়ে পড়েছে।

৫.৫ রাজনীতির নামে দেশ জুড়ে মুনাফাখোর চোরাকারবারীদের অবাধ লাইসেন্স চলতে থাকে। ম্যান ছেরু মিয়া ধরা পড়লেও এ রকম হাজারো বড় বড় ছেরু মিয়ারা চোরাচালানী ও কারবারি, মুনাফাখোরী চালাতে থাকে। এদের জন্য, অবৈধ অস্ত্রধারীদের জন্য 'ফায়ারিং স্কোয়াড' আইন সংসদে পাস করা হলেও একজনও এ আইনে শাস্তি পেল না।

৬. বঙ্গবন্ধু এ সকল দিক বিবেচনা করে ১৯৭৪ সনের ডিসেম্বরে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলে এ সব নব্য অসৎ ব্যবসায়ী, কলকারখানা বে-হাত হয়ে যাওয়া শিল্পপতিগণ বঙ্গবন্ধু ও তার সরকারকে উৎখাতের জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে। এরা বঙ্গবন্ধু বিরোধী শিবিরে মোটা রকমের চাঁদা ও অন্যান্য সহযোগিতা দিতে থাকে।[৩] শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণী পুরোটাই বঙ্গবন্ধুর উপর ছিল ক্ষিপ্ত। একজন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীও তাঁর স্বপক্ষে ছিল কিনা তা গবেষণার বিষয়।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## আমি আলেন্দে হবো...

কিসিঞ্জারের ঢাকা সফরের পর পরই 'ক্যু প্লানিং সেল'–এর সঙ্গে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের 'কন্টাক্ট' হয়।

এই কন্টাক্ট পেতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলকাতাস্থ দূতাবাস ও সি. আই.-এর সঙ্গে এদের যথারীতি যোগাযোগ হয়েছিল। এর কিছুটা বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।

বঙ্গবন্ধু হত্যার ব্যাপারে মার্কিনীদের এত আগ্রহ কেন?

১ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার প্রাক্তন কর্মকর্তা রজার্স মরিস 'হেনরি কিসিঞ্জার ও মার্কিন ফরেন পলিসি' নামক একটি তথ্যবহুল বই লিখেছেন। তিনি ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের কিসিঞ্জারের স্টাফ এসিস্ট্যান্ট হিসেবে কয়েক বছর কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৭৫ সনের প্রথমার্ধে অর্থাৎ কিসিঞ্জারের ঢাকা সফরের পর কিসিঞ্জারের বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ এক সাহায্যকারীর ইন্টারভিউ গ্রহণ করেন। ইন্টারভিউ গ্রহণের সময় আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কিসিঞ্জারের বিদেশনীতির সমালোচক হিসেবে নয়, তিনি বললেন যে, কিসিঞ্জারের আমলে মার্কিন বিদেশ নীতিতে তিনটি 'ফরেন এনেমি'–র তালিকাভুক্ত নাম এবং কিসিঞ্জারের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তিত্ব : তারা হলেন– আলেন্দে, থিউ এবং মুজিব।[১]

১.১ কেন ঘৃণিত?

এর উত্তর কিসিঞ্জার নিজেই দিয়েছেন। বলেছেন তার ভাষায়, "এ কাইন্ড অব অবসট্রিপরাস হু ওয়াজ নট্ বিহেভিং ইন এ প্রপার ওয়ে।" ১৯৭০ সনের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের পর পরই তদানীন্তন পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত যোশেফ ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় মার্কিন নীতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাকে যুক্তরাষ্ট্র কোনোক্রমেই সমর্থন দেবে না।

১.২ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন নীতির ও সমর্থনের তোয়াক্কা না রেখে, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি বিরোধিতা ও শেখ মুজিবকে ফাঁসিতে লটকানোর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিবের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার 'ক্লায়েন্ট' পাকিস্তানের জন্য প্রকৃত পরাজয় এবং মার্কিন প্রশাসনের নিকট এটি ছিল বড় রকমের বিড়ম্বনা।[২]

১.৩ ব্যক্তিগত চরিত্রে কিসিঞ্জার ছিলেন অত্যন্ত 'ভিন্‌ডিকটিভ' প্রকৃতির।[৩] পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে তিনি ব্যক্তিগত পরাজয় হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন।[৪]

১.৪ কিসিঞ্জারের আমলে তার গৃহীত বিদেশ-নীতির মূল কথাই ছিল, নো পারমানেন্ট ফ্রেন্ডস অব এনিমিজ, অন্‌লি পারমানেন্ট ইন্টারেস্টস। এই 'চিরস্থায়ী স্বার্থের' কথা বিবেচনা করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে তার আসন পাকাপোক্ত করার জন্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।[৫]

১.৫ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পরই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এ দেশের মূল ও ভারী শিল্পসমূহ এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি জাতীয়করণ করলেন। ব্যক্তিপুঁজির বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে গণমানুষের স্বার্থে পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলেন। একই সাথে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি যা বললেন তা আরো মারাত্মক। বললেন, পাকিস্তান কর্তৃক গৃহীত ঋণের বোঝার দায় দায়িত্ব তিনি নেবেন না। ঢাকায় সফররত বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দলকে ডেকে বললেন : ভদ্র মহোদয়গণ, শর্তযুক্ত ঋণের কথা বললে আপনারা যেতে পারেন। বললেন : তৃতীয় বিশ্বের শোষণের কথা। বললেন ঃ শোষণ বন্ধের কথা। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় বিশ্বব্যাপী সোচ্চার হলেন। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুললেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেখল : মুজিব আর তাদের লোক নন। সুতরাং কিসিঞ্জারের নীতি হলো—"গেট আওয়ার পিপ্‌ল ইন্‌ এন্ড দেয়ার পিপ্‌ল আউট।" সি. আই.-এর খেলাই হলো 'গেট ইন্‌' আর 'গেট আউটের' খেলা। অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে মুজিবকে আউট করো। মোশতাককে বসাও। জিয়াকে বসাও।

১.৬ কিসিঞ্জার আরো মনে করতেন শেখ মুজিব জীবিত থাকলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন নীতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। কথাটির যথার্থতা ছিল। বাংলাদেশই প্রথম রাষ্ট্র যে মার্কিন প্রভাব বলয়কে উপেক্ষা করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং বাংলাদেশে তাদের মিশন খুলবার অনুমতি দেয়। বঙ্গবন্ধু পি. এল. ও.

কে. মিশন খোলার অনুমতি প্রদান করেন এবং একই সঙ্গে ইসরাইলের মিশন স্থাপনের জন্য মার্কিনের মৌন ইংগিতকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাছাড়া কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি, আলজিয়ার্স-এর জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা প্রকৃতপক্ষেই দক্ষিণ-পূর্ব মার্কিন বিদেশী নীতির প্রতি বঙ্গবন্ধু হয়ে দাঁড়ান 'জলন্ত থ্রেট'। ফিদেল ক্যাস্ট্রো যেমন ল্যাটিন আমেরিকায় মুজিব তেমনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক সার্বক্ষণিক 'সমস্যা' হয়ে দাঁড়াবে। এটাই ছিল সি. আই.-এর এসেস্‌মেন্ট।

১.৭ এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ধারণা যে একেবারেই ছিল না তা নয়। তাছাড়া জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর দুই পৃথিবীর তত্ত্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রমাদ গুণলো। বঙ্গবন্ধু ঐ সম্মেলনে ভাষণে বলেছিলেন, "পৃথিবী আজ দুই ভাগে বিভক্ত শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।" সেই ভাষণের পর পরই ফিদেল ক্যাস্ট্রো তাঁকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে আজ থেকে একটি বুলেট অহরহ তোমার পিছু নেবে। ক্যাস্ট্রো ব্যাতীত ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুকে বিভিন্নভাবে সতর্ক করে দেবার চেষ্টা করেছেন।[৬]

কিন্তু চারিদিকে তখন মহাবিপদ সংকেত।

প্রচণ্ড দাবদাহ ...

জমির ফসল পুড়ে গেল।

পর পরই আকাশ ভেঙে নামল অবিরাম বর্ষা।

হল বন্যা।

দেশ ডুবল। ফসল ডুবল।

ডুবল ঢাকা শহর।

বঙ্গবন্ধু থমকে দাঁড়ালেন।

মানুষকে বাঁচাতে হবে।

অথচ তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে রাজকোষ শূন্য।

মুদ্রাস্ফীতি পৃথিবীর সর্বত্র আঘাত হেনেছে।

বেশি আঘাত করল যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে।

এরই মধ্যে খরা আর বন্যা।

বাংলাদেশ মহাসংকটে।

বঙ্গবন্ধু ভাবলেন।

সুর নরম করলেন।

শিল্প বিনিয়োগের সিলিং বাড়িয়ে দিলেন।

বিশ্ব ব্যাংক বলল : টাকার দাম কমাও।
বঙ্গবন্ধু নিরন্ন জনগণকে বাঁচানোর স্বার্থে টাকার অবমূল্যায়ন করলেন।
রেশনের দাম বাড়ালেন।
বেসরকারি মালিকানায় শিল্প প্রত্যাবর্তন পুঁজি প্রতাহারের নীতি বিবেচনা করে দেখলেন।
দেশের ভয়াবহ অবস্থা দেখে এই প্রথম বারের মতো শেখ মুজিব ভেঙে পড়লেন।
বঙ্গবন্ধু মার্কিন–যুক্তরাষ্ট্রের দিকে হাত বাড়ালেন দ্রুত। ছুটলেন ওয়াশিংটনে।
Bangladesh crumbled before aid dooner pressure.
কিসিঞ্জার ঢাকায় এলেন।
তাজউদ্দিনের বিদায় পর্ব সমাপ্ত হলো।
মনে হলো বঙ্গবন্ধু মার্কিন–সাম্রাজ্যবাদের হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন।
নতজানু ... আত্ম সমর্পিত ...
পরাজিত সিপাহসালার। আসলে কি তাই?

২. বঙ্গবন্ধু কোনোদিন পরাজয়ের পরাভবকে মেনে নেননি। দুর্ভিক্ষে মার্কিনীদের বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা তাঁর মনে বড় রকমের দাগ কেটে গেল। বঙ্গবন্ধু আঘাত সামলে নিলেন। সাতাশ হাজার বুভুক্ষু লোকের লাশ, বিবেক দংশনে অহরহ জর্জরিত তিনি।
পথ খুঁজতে লাগলেন।
মুক্তির পথ কোথায়?
সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের হাত থেকে স্বনির্ভর সোনার বাংলা গড়ার মন্ত্র আবিষ্কারে তিনি ব্যস্ত। যেমন বাঙালির জাতীয় স্বাধীনতার জন্য তিনি প্রণয়ন করেছিলেন ৬ দফা কর্মসূচি এবারও তাকে মুক্তির লক্ষ্যে দিতে হবে কর্মসূচি। বঙ্গবন্ধু পথ অন্বেষায় অস্থির ...[৭]

২.১ বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সি. আই.–এর এসেসমেন্ট অত্যন্ত নির্ভুল ছিল। ১৯৭৪ সনের দুর্ভিক্ষের ক্রান্তিলগ্নে শেখ মুজিবের মার্কিনীদের প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং কতিপয় গৃহীত কার্যক্রমকে পেন্টাগণ 'সংকটজনক অবস্থার সাময়িক প্রবণতা' বলে চিহ্নিত করলেন। তাদের ধারণা

Mujib's concessions, were in a sense, a desperate reaction to the crisis not a firm commitment to the principle and not a necessarily a position a patron would bank on the future.[৮] সে বাংলাদেশে অত্যন্ত সংগোপনে সি. আই. এ. তার পরিকল্পনা মাফিক এগুতে থাকে।

২.২ এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ফিলিপ চেরী ১৯৭৪ সনের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশের সি. আই.-এর স্টেশনচিপ হিসেবে ঢাকায় বদলী হয়ে আসেন। ১৯৭১ সনের মার্চে বাংলাদেশে পাকবাহিনীর হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। উপমহাদেশে সংকট ঘনীভূত হলো। বাংলাদেশে গেরিলা যুদ্ধ চলতে থাকে। এমন অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিল্লী কলকাতায় সি. আই.-এ-এর নেটওয়ার্ক যখন আরো বিস্তৃত করছিল তখন ১৯৭১ সনের জুন মাসে ফিলিপ চেরী– নয়াদিল্লীস্থ কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সনের আগস্ট মাসে, কিসিঞ্জারের আগমনের ও তাজউদ্দিনের বিদায়ের দুই মাস পূর্বে তিনি সি. আই. এ–এর প্রধান হয়ে বাংলাদেশে বদলী হয়ে আসেন। তারপর থেকেই সি. আই. এ আরো বেশি তৎপর হয়ে উঠে। ঢাকায় কিসিঞ্জারের সফরের সময় মুজিব হত্যার গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে সি. আই. এ নেট ওয়ার্ক অবিলম্বে তাদের পুরনো কনটাক্টদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে।

২.৩ এই যোগাযোগ পেতে তাদের বিলম্ব হয়নি। কেননা বাংলাদেশে তাদের যে সব পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন মাহবুব আলম চাষী তাদের অন্যতম। মাহবুব আলম চাষী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মোশতাকের অধীনে পররাষ্ট্র সচিবের পদে কাজ করছিলেন। সি. আই. এর সঙ্গে তার যোগসাজশ প্রকাশিত হয়ে পড়ল তাকে যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেব ঐ পদ থেকে অপসারিত করেন। দেশ স্বাধীন হলে মাহবুব আলম চাষী প্রধানত মার্কিন সাহায্যে পরিচালিত সংস্থা কুমিল্লার বোর্ডে যোগদান করেন। সি, এস, পি, অফিসার হিসেবে চাকুরীর প্রথম ধাপেই তিনি পাকিস্তানের কূটনৈতিক মিশনের একজন অফিসার হিসেবে ওয়াশিংটনে অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধে তার ভূমিকা পাকিস্তানের চেয়ে মার্কিন স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে এবং সি. আই. এর রিক্রুটি হিসেবে কাজ করার ঘটনা প্রমাণিত হলে ১৯৬৭ সনে তাকে চাকুরী হারাতে হয়। চাকুরীচ্যুতির অভিযোগ ছিল "He is to Pro-American even for Pakistan."[৯]

২.৪ ১৯৭১ সনের এপ্রিল।

মোশতাক পররাষ্ট্র মন্ত্রী আর মাহবুব আলম চাষী পররাষ্ট্র সচিব।

১৯৭৫ সনের আগস্ট মাসে মোশতাক প্রেসিডেন্ট আর চাষী প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি।

আর মাঝখনে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ফিলিপ চেরী বাংলাদেশের সি. আই. এ স্টেশন চিফ।

২.৫ আসলে লিফস্যুজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে চেরী মুজিব হত্যার সঙ্গে তার

সম্পর্ক অস্বীকার করলেও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, ১৯৭৪ সনের শেষ দিকে মুজিবকে উৎখাত করার প্রস্তাব নিয়ে তাদের 'এপ্রোচ' করা হয়েছিল।[১০]

২.৬ প্রকৃত ঘটনা পূর্ব পরিচয় ও বন্ধুত্বের কারণে ফিলিপ চেরী ব্লুপ্রিন্ট মোতাবেক চাষীকে কাজে লাগায়। চাষী গোপনে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। জিয়াউর রহমান পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন। এই স্তরে জিয়াউর রহমানের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সাহায্য না পেয়ে অনন্যোপায় হয়ে মোশতাক গ্রুপ মেজর রশীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে।

৩. খন্দকার মোশতাক আহমদের ভাগিনা মেজর রশীদকে সহজেই হাত করা সম্ভব হয়। বলাবাহুল্য, মেজর রশীদের ভায়রা হলো মেজর ফারুক রহমান। মেজর ফারুক রহমান জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সরকার পরিবর্তনে তাদের সাহায্য করার জন্য আবেদন জানায়। ফারুক রহমান এক সাক্ষাৎকারে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও অলোচনাকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা নিম্নরূপ—

**এ্যান্থনী মাসকারেনহাস** : শেখ মুজিবকে সরিয়ে তার স্থলে তরুণ কর্নেলবৃন্দ সেনাবাহিনীর একজন লোককে সেখানে বসানোর সিদ্ধান্তে তারা মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

**ফারুক রহমান** : দেখুন, আমি সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফের সঙ্গে কথা বলছিলাম। আমি সরাসরি দেশের প্রেসিডেন্টকে উৎখাতের কথা বললে হয়ত তিনি আমাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠাতে পারতেন। সে জন্য আমি কথাটি ঘুর পথে শুরু করেছিলাম। দুর্নীতি, সব কিছুই বিশৃংখলা ইত্যাদির কথা তুলে বলেছিলাম দেশ পরিবর্তন চায়। এ কথা শুনে তিনি বললেন, চলুন বাইরে চলুন, লনে কথা বলা যাক। এ্যান্থনী মাসকারেনহাসঃ জিয়া এরূপ বলল?

**ফারুক রহমান** : হ্যাঁ, আমরা লনে আসলাম। তাকে বললাম আমরা পেশাগত সৈনিক, আমরা দেশকে সেবা করব, কোন ব্যক্তিকে নয়। সেনাবাহিনী, সিভিল সার্ভিস, সরকার সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এগুলোর পরিবর্তন করতে হবে। আমরা জুনিয়ার অফিসারবৃন্দ ইতিমধ্যেই অগ্রসর হয়েছি। এখন প্রয়োজন আপনার সমর্থন এবং নেতৃত্ব।

**জিয়া বললেন** : আমি দুঃখিত, আমি এ সব ব্যাপারে জড়াতে চাই না। যদি তোমরা কিছু করতে চাও তাহলে এটা জুনিয়র অফিসারদেরই করা উচিত।[১১]

৩.১ তদানীন্তন প্রধান সেনাপতি বঙ্গবন্ধুর হত্যার সঙ্গে জিয়াউর রহমানের জড়িত থাকার বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

৩.২ নির্বাচিত সরকার উৎখাত এবং প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যা সংক্রান্ত এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর উপপ্রধান হিসেবে যে দায়িত্ব পালনের কথা ছিল জিয়া তা পালন করেনি। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের সঙ্গে যোগসাজশ অব্যাহত দেখে সেনাবাহিনীর নীতি-ধর্ম ও সেনাবাহিনীর আইনের একত্রিশ ধারাকে[১২] অবমাননা করে জিয়াউর রহমান প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিশেষ একজন হয়ে আছেন।

৩.৩ সামরিক আইন বিধি ভঙ্গ করে পাবনা জেলা গভর্নর হওয়ার পর তিনি আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি পত্র লেখেন।[১৩]

৩.৪ স্বাধীনতা যুদ্ধে তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঘোষণা যুদ্ধকালীন সময় তার রহস্যজনক আচরণ, স্বাধীনতা উত্তর যুগে তার বিভিন্ন বক্তব্য কার্যক্রম থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, জিয়াউর রহমান একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন। জিয়াউর রহমানের শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিবরণ কর্নেল তাহের তার জবানবন্দীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।[১৪]

৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কিসিঞ্জারের বিশেষ আস্থাভাজন ব্যক্তি হ্যারল্ড স্যানডার্স ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের ডেপুটি ছিলেন। তিনি ১৯৫৯ সনে সি. আই. এ যোগ দেন। ১৯৬১ সনে তিনি হোয়াইট হাউজের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল-এ চলে আসেন। কিসিঞ্জার স্টেট ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করলে সৌভাগ্যবান কয়েকজন অফিসারদের মধ্যে স্যান্ডার্স এখানে চলে আসেন। কিসিঞ্জার তাকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের গোয়েন্দা ও গবেষণা বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত করেন। ওয়াশিংটন সূত্রে কথিত যে স্যান্ডার্স কলকাতায় মোশতাক গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

এই যোগাযোগের ক্ষেত্রে কলকাতাস্থ কনসাল জেনারেল হার্বটি গর্ডন অথবা নয়া দিল্লীস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফিটিংকে অন্ধকারে রাখা হয়। এদেরকে নিরপেক্ষ থাকার নামে চক্রান্ত হতে সরিয়ে রাখা হয়। কলকাতাস্থ কনস্যুলের জর্জ গ্রিফিনকে মোশতাক গ্রুপের সংগে যোগাযোগের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। গ্রিফিন ছিলেন স্যান্ডার্সের ঘনিষ্ঠ। তাই দেখা যায় ১৯৭৫ সনে স্যান্ডার্স তাকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের গোয়েন্দা ও গবেষণা ডিভিশনের চিফ হিসেবে নিয়ে আসেন এবং সাউথ এশিয়া ডিভিশনের চিফ হিসেবে নিয়োগ করেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক লিফস্যুজের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি কতিপয় বাঙালি নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।[১৫]

৪.১ ১৯৭৩ সনের শেষের দিকে পেন্টাগণ বিশেষকরে দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার ঘটনাবলির নিয়ন্ত্রণে কিসিঞ্জার চক্র অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়। স্যান্ডার্স, গ্রিফিন ফিলিপ চেরি পেন্টাগণ কলকাতা ও বাংলাদেশে তাদের অবস্থান তখন সুদৃঢ়। সি. আই. এ নেট ওয়ার্ক পুরোদমে চালু হলো। প্লানিং সেল গঠিত হলো। ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হলো। সংগোপনে কাজ শুরু হলো। নেটওয়ার্কের আওতায় ক্ষুব্ধ মেজর জেনারেল জিয়াকে গেঁথে নেয়া হলো। ফারুক আর রশীদকে টানা হলো। এ প্রসঙ্গে বলে নেয়া ভালো যে, ফারুক–রশিদ মনে করতে পারে যে তারাই ঘটনার মূল শক্তি ও নিয়ন্ত্রক এবং তারাই খন্দকার মোশতাককে রিক্রুট করেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে বলা যেতে পারে "More accurate it was Mastaque and his political nexus who had taken these Majors on board."[১৬]

৪.২ ১৯৭৫ সনের আগস্টের প্রথম সপ্তাহ। সি. আই. এর শক্তিধর ব্যক্তিত্ব জর্জ গ্রিফিন তখন কলকাতায়। একটি দল বাংলাদেশ থেকে বেড়াতে কলকাতায় গেল। গোপনে যোগাযোগ করল গ্রিফিনের সাথে। ঐ দলের মধ্যে ছিল মেজর (অব.) ডালিম। দলের অন্যান্যদের একদিন সে কথা প্রসংগে বলেই ফেলেছে এ মাসেই আর্মি ক্যু হবে। ক্ষমতা আমাদের হাতে আসবে। ঢাকায় ফিরে এসে দলসংগীদের একজন এ কথা বললে, ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে ঐ দিন রাতে আমি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ও বাকশালের সেক্রেটারি জেনারেল এম, মুনসুর আলীকে বিষয়টি রিপোর্ট করি।

প্রধানমন্ত্রী সেদিন যশোহর ক্যান্টনমেন্টে সেনাবাহিনী পরিদর্শন করে এসেছেন। উৎপাদনশীল কাজে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। তাদের দ্বিতীয় বিপ্লবের ক্যাডার হওয়ার উপদেশ দিয়ে এসেছেন। তিনি বেশ ক্লান্ত ছিলেন। আমার এই রিপোর্ট শোনার পর তিনি স্প্রিং-এর মতো চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। আমার হাত ধরে লনে নিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করাতে বলেছিলাম, খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে ক্যু সংগঠিত হবে। তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন।

বহুক্ষণ পায়চারী করার পর তিনি বললেন : ক্যু করলে মোশতাক করবে না—করবে তাজউদ্দিন। ক্যু–এর পরে মুনসুর আলীকে মোশতাক প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মুনসুর আলী ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখান করেছিলেন।

ইতিহাসে প্রমাণ করেছে রাজনীতিতে ব্যক্তিগত সম্পর্কের তেমন কোনো মূল্য নেই। মুনসুর–তাজুদ্দিনকে প্রাণ দিতে হলো সি. আই. এ–এর বিশ্বস্ত লোক মোশতাকের হাতে। যদিও মোশতাকের সংগে মুনসুর আলীর

ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত চমৎকার।

আমার ধারণা বঙ্গবন্ধুও বিষয়টি বোধ হয় জানতেন। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার পুত্র আনোয়ার হোসেন মঞ্জু কলকাতায় ছিলেন। ১২ই আগস্ট আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ঢাকায় ফিরে এলে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহকারী তোফায়েল আহমদ তাকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করার পরামর্শ প্রদান করেন। ১৩ই আগস্ট আনোয়ার হোসেন মঞ্জু গণভবনে গমন করেন।

বঙ্গবন্ধু শেষ বিকেলে ছড়ি হাতে গণভবনের লনে পায়চারী করছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন তাহের উদ্দিন ঠাকুর। বঙ্গবন্ধু হাতের ছড়িটি উঁচিয়ে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর মুখের সামনে বললেন, টেল ইয়োর ফ্রেন্ডস আই অ্যাম নট এফ্রেইড।[১৭]

৫.১ বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর ভারতীয় লোক সভায়, এই উপমহাদেশে সি. আই. এ এজেন্টদের নামের তালিকায় বাংলাদেশের স্বনাম ধন্য সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

৫.২ বাকশাল ঘোষণার পর ইত্তেফাক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এক বৈঠকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন; দেশে রক্ত গংগা বইয়ে যাবে।[১৮]

৫.৩ সচেতনভাবে ইত্তেফাক পাঠ করলে দেখা যাবে পত্রিকাটি পুরোপুরিভাবে এ দেশের শোষিত মানুষের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে চলছে। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু দৈনিক ইত্তেফাকের জাঁদরেল সম্পাদক।

৫.৪ বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুকে জাস্টিফাই করে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ইত্তেফাকে এক উপ সম্পাদকীয় লেখেন[১৯] (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

৬. ১৪ই আগস্ট ১৯৭৫। গভর্নরদের প্রশিক্ষণ চলছে। শেখ ফজলুল হক মনি সেদিন গভর্নরদের সামনে আবেগ নির্ভর এক ভাষণ প্রদান করেন। তার বক্তব্যের মাঝে একটি কথা এখনো আমার মনে দাগ কেটে আছে। তার বক্তব্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক বেসামরিক–আমলাগণ একজোট হয়ে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমাজ প্রগতির ধারাকে বানচাল করার অশুভ তৎপরতায় লিপ্ত, বাংলাদেশের বর্তমান ক্রান্তিকালে সমাজ পরিবর্তনের ধারায় উত্তরণের সময় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আঘাত করতে পারে, সবাইকে সতর্ক, সাবধান ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে ইত্যাদি।

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস আমার সঙ্গে এ আলোচনায় বলেছেন, ১৪ আগস্ট বিকেলে তিনি যখন নবগঠিত বাকশাল কার্যালয়ে উপস্থিত তখন পূর্ব ইউরোপের দূতাবাসের জনৈক কর্মকর্তা বাকশাল

সম্পাদক ফজলুল হক মনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তার প্রস্থানের পর আমি রুমে ঢুকলাম। ফজলুল হক মনি তখন অত্যন্ত উত্তেজিত। এটাচিকেস বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। কক্ষ থেকে প্রস্থানের প্রাক্কালে খন্দকার ইলিয়াসকে বলেন, সি. আই. এ-এর সাহায্যে মোশতাক ক্যু করার পরিকল্পনা করেছে : আমি গণভবনে যাচ্ছি। ফজলুল হক মনি দ্রুত বেগে প্রস্থান করেন। খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস আরো বলেছেন, তিনি ঘটনার পরিণতি কি হলো তা জানার জন্য মনির সঙ্গে সন্ধ্যার পরে দেখা করলে শেখ ফজলুল হক মনি বললেন : মামাকে বলেছি। উনি যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছেন। চিন্তার কারণ নেই।[২০]

৭. ১৪ই আগস্ট অপরাহ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কয়েকটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা বিস্ফোরিত হয়। এটাকে জাসদ বা গণবাহিনী অথবা উগ্রপন্থী সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী চৈনিক গ্রুপের কাজ বলে অনেকই ধারণা করেন। সন্ধ্যার পূর্বেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট রিপোর্ট এল, এই বোমা কোনো বিশেষজ্ঞর, পক্ষেও হাতে তৈরি সম্ভব নয়। কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর কাছে এ ধরনের বোমা মজুত আছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলানোর নির্দেশ দেয়া হয়।[২১]

৮. ১৫ই আগস্ট সকালে প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্বর্ধনা। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সম্বর্ধনায় নবরূপে সুসজ্জিত। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা অবস্থা জোরদার করা হলো। পর্যাপ্ত পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীকে মোতায়েন করা হলো। রাত আটটায় প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে টেলিফোনে বললেন : দুই জনে একত্রে যাওয়া ঠিক হবে না। তাকে ১০.৪৫ মিনিটে টি. এস. সি-তে যাবার নির্দেশ দিলেন। আজ প্রশ্ন থেকে যায়, বঙ্গবন্ধু কেন এ নির্দেশ দিয়েছিলেন?

৯. ১৪ আগস্ট সন্ধ্যেয় সবকিছুই যেন খাপছাড়া। সন্ধ্যে সাতটায় নব নিযুক্ত গভর্নরদের সম্বর্ধনা উপলক্ষে বেতার বাংলাদেশ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, কিন্তু আটটা বেজে গেলেও অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছিল না। আমিই নই অনেকেই বিরক্ত বোধ করছিলেন। অনেকেই উঠে চলে গেলেন।
রাত সাড়ে আটটার দিকে হন্তদন্ত হয়ে তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এলেন। অস্থির।
অনুষ্ঠান শুরু হলো।
মন্ত্রী প্রবর ভাষণ দিয়ে তড়িঘড়ি কেটে পড়লেন। মনে হলো তিনি অসম্ভব ব্যস্ত।

**কিছু প্রাসঙ্গিক কথা**

১০. এই সময়ে জেনারেল ওসমানীর আচরণ ষড়যন্ত্রকারীদের উৎসাহিত করে তোলে। সেদিনের কথা আমার আজো মনে আছে।

নতুন গণভবনে পার্লামেন্টারি পার্টি ও আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির যৌথ সভায় আমরা উপস্থিত। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে দেশের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন। সিস্টেম পরিবর্তনের কথা বললেন। বললেন ঃ দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো ও তাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্য রাষ্ট্রীয় মৌলনীতির অন্যতম সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করার লক্ষ্যে জাতির নিকট প্রদত্ত পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর জেনারেল ওসমানীকে কিছু বলতে বলা হলে তিনি তার নিজস্ব ভঙ্গীতে বক্তব্য রাখলেন। বললেন ঃ আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খানকে সরিয়ে বাংলাদেশে আমরা মুজিব খানকে দেখতে চাই না।

মনে হলো তিনি ধমকের সাথে কথা বলছেন। তিনি প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকারের ও বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপের সরাসরি বিরোধিতা করে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বললেন ঃ এতে কারো মঙ্গল হবে না। বাকশাল গঠিত হলে সংসদ সদস্য পদ হতে তিনি পদত্যাগ করেন। পদত্যাগ করেন বুর্জোয়া পদ্ধতির একনিষ্ঠ সেবক বলে চিহ্নিত মঈনুল হোসেন।

১১. আজো আমার মনে পড়ে ঐ সভায় 'প্রবীণ' আওয়ামী লীগ নেতা কোরবান আলী বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বললেন : কামানের গোলার সামনে দাঁড়িয়ে জুঁই ফুলের গান গেয়ে লাভ নেই। নূরে আলম সিদ্দিকী 'গণ দেবতা' 'বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গ' ও 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রের' মাহাত্ম্য বর্ণনা করে স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বক্তব্য রাখলেন। গণতন্ত্রের পূজারী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মানসপুত্র শেখ মুজিবকে তথাকথিত গণতন্ত্রের ধ্বজা আরো শক্ত করে ধরার দাবী জানালেন।

১২. প্রকাশ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক এই মিটিং ডাকার পূর্ব রাতে এবং মিটিং–এর দিনগত রাতে ওবায়দুর রহমান, নূরে আলম সিদ্দিকী, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ একমত হন যে, বাকশাল সিস্টেমকে তারা মেনে নেবেন না।[২২]

১৩. বাকশাল গঠন হবার পর নতুন করে মন্ত্রীসভা গঠন ও মন্ত্রীদের শপথ নিতে হলো। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ না করে বিদেশে থেকে গেলেন। বাজারে গুজব রটে গেল ড. কামাল হোসেন বাকশাল কর্মসূচি ও পদ্ধতির সঙ্গে একমত হতে পারছেন না। শোনা গেল, বঙ্গবন্ধুর বারবার তাগিদে তিনি দেশে এসে শপথ নিয়ে

পুনরায় বিদেশে চলে গেছেন। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের দিন তিনি দেশে ছিলেন না। বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভার প্রায় সকলেই বাকশাল বিরোধী ছিলেন।[২৩]

১৪. জনাব এ, এইচ এম কামরুজ্জামান হেনা সাহেবের সরকারি বাসভবনে প্রায়ই জলসা বসে।
১৯৭৫ সন। ১৪ই আগস্ট। রাত।
সেদিনও তাঁর বাসায় সঙ্গীতের আসর।
অনেক রাত হলো।
আসর আরো জমে উঠল।
এমন সময় মেজর (অবঃ) ডালিম ঘরে ঢুকল।
বলল জরুরি কথা আছে।
কামরুজ্জামান সাহেব তখন গানের সুরে জমে আছেন।
বলল রাখ্ তোর জরুরি কথা!
ডালিমের কথায় পাত্তা দিলেন না কামরুজ্জামান সাহেব।
বললেন ঃ সকালে আসিস।[২৪]

১৪.১ লক্ষ্য করেছি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বচিত হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে ফজলুল হক মনির আক্রমণ পরিচালিত হয়।

১৪.২ স্বভাবতই তিনি বিব্রত হন। মুষড়ে পড়েন। তাঁকে তখন হতাশাগ্রস্ত বলে মনে হতো। বাকশাল হবার পর বাজেট অধিবেশনে একদিন পার্লামেন্ট ভবনে তার সাথে আমি, বগুড়ার হাসন আলী তালুকদার ও মোজাফফর হোসেন দেখা করি। তিনি পান খাচ্ছিলেন এবং কবিতা লিখছিলেন। কি ধরনের কবিতা লিখছেন আগ্রহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে তা জানতে চাইলে তিনি বললেন, মৃত্যুর কবিতা। বললেন, আমি মরব, তুমি মরবে, বঙ্গবন্ধু মরবে... ইত্যাদি।

১৫. সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীপরিষদ সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, বঙ্গবন্ধুকে সরিয়ে দেবার চক্রান্তের বিষয়টি তদানীন্তন উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব ওয়াকিফহাল ছিলেন।[২৫]

## সপ্তম অধ্যায়

### ব্যক্তি আক্রোশের ডুগডুগি

শুধু তৃতীয় বিশ্ব নয়, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্ব প্রায় সকল দেশেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। চলনে, বলনে, কাজকর্মে তার বিশালতার ছাপ ছিল আকর্ষণীয়। এমন একজন বিরাট ব্যক্তি মানুষকে হত্যা করার নেপথ্যেও থাকে এক ব্যাপক সূক্ষ্ম, নিপুণ ও বিশাল পটভূমিকা এবং নির্ভুল ব্লুপ্রিন্ট। বঙ্গবন্ধু হত্যার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তও ছিল অনুরূপ—

১. কেউ যদি বলেন, সামরিক বাহিনীর কতিপয় অফিসার ব্যক্তিগত আক্রোশে কিংবা হঠকারী উচ্চাভিলাষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে অথবা কথাটিকে ঘুরিয়ে যদি এভাবে বলা যায়—

মানুষ মাত্রেরই ভুল ত্রুটি থাকে। মানুষ মুজিবের ভুল ত্রুটি থাকবে না এটা হতে পারে না। তবে তাঁর এমন কোনো ভুল ভ্রান্তি দৃশ্যমান কিনা যা পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়—মুজিব হত্যা ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলশ্রুতি।

নিচে দুই একটি উদাহরণ তুলে ধরা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কেননা বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর আন্তর্জাতিকভাবে প্রচার করা হয়েছে ব্যক্তিগত আক্রোশে শেখ মুজিব নিহত হয়েছেন। এ সব আন্তর্জাতিক রিপোর্ট থেকে সমগ্র বিশ্বে বিশেষকরে বাংলাদেশের মানুষের কাছেও এ কথা বিশ্বাসযোগ্য করার প্রয়াস চলেছিল যে, মুজিব হত্যা ব্যক্তিগত আক্রোশের নির্মম ফলশ্রুতি।

১১. যেমন বিখ্যাত সাংবাদিক এন্থনী মাসকারেনহাস 'কিসে ভুল হল' শিরোনামে লন্ডনের সানডে টাইমস-এ এক বিরাট রিপোর্ট প্রকাশ করেন। রিপোর্টটি নিম্নরূপ।[১]

"১৯৭২ সালে নব প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে ফিরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান বীরের সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। তিনি তখন সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। গত সপ্তাহে এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছেন। দুটি ঘটনার মাঝখানে কয় বছর তার সম্পর্কে বাংলাদেশের

জনগণের মোহ কেটে গেছে এবং সোনার বাংলার স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে। কিসে ভুল হলো? মুজিবের ট্র্যাজেডি এই যে, চার বছরের কম সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর উচ্চতর মর্যাদা হারিয়ে বঙ্গদুশমনে পর্যবসিত হলেন। তার বিপর্যয়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রধানত তিনটি উপকরণ মিশে আছে।

প্রথমত সামরিক বাহিনীর প্রধান হওয়া সত্ত্বেও মুজিব সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করতেন। সেনাবাহিনীর এবং বাংলাদেশ আন্দোলনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে এমন অনেক সামরিক অফিসারের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার কোনো সুযোগ তিনি ছাড়তেন না।[২]

মুজিবের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অনুগত উচ্চ ট্রেনিং প্রাপ্ত সুসজ্জিত ইউনিফরমধারী রক্ষীবাহিনীকে অস্ত্রেশস্ত্রে বেতন ভাতায় ব্যয় বরাদ্দে সামরিক বাহিনীর চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়া হতো। উভয়ের মধ্যে স্বার্থের অনেক সংঘাতেই মুজিব অন্ধভাবে রক্ষীবাহিনীকে সমর্থন করতেন।[৩]

অদ্ভুত ব্যাপার এই যে সেনাবাহিনী সম্পর্কে দীর্ঘদিনের সন্দেহ ও ভীতি থাকা সত্ত্বেও মুজিব গত বছর পাচার ও দুর্নীতি উচ্ছেদ অভিযানে সেনাবাহিনীকেই নিয়োগ করেছিলেন। তার এই রাজনৈতিক চাতুরী মারাত্মকভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

এতদিন সেনাবাহিনী সরকারের অবৈধ কার্যকলাপের কথা গল্প গুজব শুনছে মাত্র। এবার তারা এর ব্যাপকতার মুখোমুখি দাঁড়াল। দুর্নীতি নির্মূল অভিযানে বাধা আসল রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে। এতে তাদের অসন্তোষ আরও বেড়ে গেল, তার অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের আক্রোশ নিবদ্ধ হলো মুজিবের উপর।

সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুজিবের বিরোধের ফলে একটা ঘটনা যাতে গত শুক্রবারের সামরিক অভ্যুত্থানের মুখপাত্র মেজর ডালিম জড়িত ছিলেন। এক বিয়ের অভ্যর্থনা মজলিশে 'মুক্তিবাহিনী'র এই বীর যোদ্ধার পত্নীকে ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের প্রধান ও মুজিবের বিশ্বস্ত প্রিয়পাত্র গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলে একদল গুণ্ডা এনে সমবেত মেহমানদের সামনে ডালিম দম্পতিকে বল পূর্বক উঠিয়ে মোস্তফার বাড়িতে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে অবিলম্বে তিনটি লরী বোঝাই যুবক সিপাহী মোস্তফার বাড়ির উদ্দেশ্যে ধাওয়া করে। গোলমাল আশংকা করে মোস্তাফা মেজর ডালিম ও তার পত্নীকে নিয়ে মুজিবের বাসভবনে উপস্থিত হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুইপক্ষ মুখোমুখি হলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ডালিম দম্পতিকে মুক্তি দিলেও মুজিব তরুণ অফিসারদের বিশৃংখলার জন্য তীব্র ভৎর্সনা করেন। এখানে শেষ নয়, কয়েকমাস পর মুজিব নয় জন অফিসারকে

বরখাস্ত করেন এবং প্রশংসনীয় সার্ভিস রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও মেজর ডালিমকে ২৮ বছর বয়সে অবসর করিয়ে দেন। এই ভূতপূর্ব মেজরই গত শুক্রবার ভোরে মুজিবের স্বৈরতন্ত্রের অবসানের খবর ঘোষণা করেন।

১.২ বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সানডে টেলিগ্রাফ, লন্ডন থেকে এক বিশেষ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সে রিপোর্টে বলা হয় যে সমস্যার মোকাবেলা না করে মুজিব গুণ্ডা বদমাইস নিয়ে ৫ হাজার লোকের রক্ষী বাহিনী খাঁড়া করেছিলেন যাতে সেনাবাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস না পায়। উক্ত রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, মুজিবের এ সব ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন হলো গাজী গোলাম মোস্তফা, যিনি বাংলাদেশে বড় চোর বলে কুখ্যাত। মুজিবের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে তিনি আইনের উর্ধ্বে ছিলেন। প্রকাশিত রিপোর্টে আরো বলা হয়, বিগত চার বছরে শেখ মুজিবের আপন ভাই শেখ আবু নাসের যতবার ঢাকা থেকে স্বীয় আদি ব্যবসা কেন্দ্র খুলনায় গিয়েছেন তার চেয়ে বেশি বার লন্ডনে এসেছেন। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সম্পাদক জিল্লুর রহমান লন্ডনে বেড়াতে আসেন। ফেরার সময় তিনি ২৩টি বড় বড় বাক্স বোঝাই করে সওদা নিয়ে গেছেন।[৪]

বিজ্ঞ আন্তর্জাতিক রিপোর্টারগণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে শেখ মুজিবের পাশে কে কি করেছেন তার বিশদ বিবরণ ছাপিয়ে মুজিব হত্যাকে জাস্টিফাই করতে চেয়েছেন ব্যক্তিগত আক্রোশ রূপে।

১.৩ এ প্রসংগে এ, এল খতিব–এর লেখা হু কিল্ড মুজিব[৫] বইতে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন, কলকাতা হতে প্রকাশিত সানডে পত্রিকায় ডালিম ও তার 'ফেয়ার লেডি' তাসমিন– এর ছবি ছাপিয়ে একটি চমকপ্রদ গল্প ফাদা হয়। গল্পে বলা হয়েছে ডালিমের স্ত্রী তাসমিন বিবাহ উত্তর সম্বর্ধনায় গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলে কর্তৃক উত্যক্ত হয়। এর বিরুদ্ধে ডালিম শেখ মুজিবের নিকট বিচার প্রার্থনা করলে বিচার তো শেখ মুজিব করেননি বরং ডালিমকে তিরস্কৃত করেন। ফলে প্রতিবেদনের ভাষায়, "And Major Dalim come out with a vow to revenge. A vow that was Serupulously observed (emphasis added)."[৬] রিপোর্টটি কিছুটা ভুল তথ্যের উপর দাঁড়ানো। ডালিমের বিয়ে হয় ১৯৭১ সনে। স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যে। ঘটনা ডালিমের বোনের বিয়েতে গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলে তাকে উত্যক্ত করলে ডালিম উক্ত ছেলেকে চড় মারে।

তখন ডালিমকে গাজী গোলাম মোস্তফার অনুগত সমর্থকগণ ঘেরাও করে রাখে। গাজী এ কথা জানতে পেরে এবং পরিস্থিতি অনুধাবন করে ডালিম

ও তার স্ত্রীকে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে নিয়ে আসেন। বঙ্গবন্ধুর মধ্যস্থতায় বিরোধের নিষ্পত্তি হয় এবং গাজী এবং ডালিম পরস্পর হাত মিলায় এবং এক সংগে মিষ্টি খেয়ে প্রায় মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধুর বাসা হতে বিদায় নেয়। কিন্তু ঘটনার এখানেই শেষ নয়। মধ্যরাতে ডালিম সেনানিবাস থেকে এক ট্রাক সৈন্য এনে গাজীর নয়া পল্টনস্থ বাড়ি তছনছ করে এবং কতিপয় আর্মি অফিসার এই বলে হুমকি প্রদান করে যে, ডালিমের কিছু হলে শহরে ভায়োলেন্স সংঘটিত হবে।

সেনাবাহিনীর অফিসারদের এ ধরনের আচরণের বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে জি এইচ কিউ তদন্ত চালায়। তদন্তে যে সমস্ত অফিসার গাজীর বাড়ি আক্রমণে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়। সেনাবাহিনীতে শৃংখলা ভঙ্গ গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। শেখ মুজিবের কিছু করার ছিল না। কেননা– It is the decision of the Army GHO এবং আর্মি হেডকোয়ার্টারের সিদ্ধান্ত— "The officers who had taken law into their own hands could not be allowed to go unpanished." তারপরও বঙ্গবন্ধু ডালিমের ব্যবসা–বাণিজ্যের ব্যাপারে সাহায্য করেন। ডালিম বেগম মুজিবকে মা বলে সম্বোধন করত এবং প্রায়শই বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাতায়াত করত। ডালিম, ডালিমের স্ত্রী এবং স্ত্রীর মা হেনা ভাবী ঘন ঘন বেগম মুজিব ও শেখ হাসিনার নিকট যেত।[৭]

যাহোক এখানে প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় গাজী গোলাম মোস্তফা ১৫ই আগস্টে নিহত হননি— পরবর্তীতে হয়েছিলেন বন্দি। ডালিম তাকে হত্যা করেনি কেন? ব্যক্তিগত আক্রোশে মুজিবকে নয় গাজী গোলাম মোস্তফাকে হত্যা করাই ছিল ডালিমের পক্ষে যুক্তিযুক্ত।

১.৪ ব্যক্তিগত আক্রোশে শেখ মুজিব নিহত হয়েছেন এ কথাটি প্রমাণ করার জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাংবাদিকগণ ডালিম, ডালিমের স্ত্রী, গাজী গোলাম মোস্তফা, কামাল, নাসের প্রমুখের নামে গল্প ফেঁদেছেন নামীদামী সব সংবাদপত্রের পাতায়। এ সব গল্পের ভিত্তি কতটুকু তার বিচার ভবিষ্যৎ গবেষকগণ করবেন— তবে এ সব গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের কোনো ত্রুটি সেদিন হয়নি। এ সব গল্পের উৎস সম্পর্কে একটি তথ্য প্রদান করা হয়েছে "কনফিডেনসিয়াল ডায়েরিতে।[৮] উক্ত বই হতে এখানে কিছু উদ্ধৃত করা প্রয়োজন— "এনায়েতুল্লা খান আমাকে বললেন, বাজারে সবাই বলছে যে, মেজর ডালিমের সঙ্গে শেখ সাহেবের ঝগড়া ছিল এবং ঐ কারণবশত সে শেখ মুজিবকে খুন করেছে। খবরটি ভুল। দুনিয়ার সংবাদপত্রের কাছে এই খবরটি এবং পরবর্তীকালে আর একটি

খুব গুরুত্বপূর্ণ খবরের রং ফলিয়ে বলা হয়েছিল যে মেজর ডালিম ছিলেন হত্যাকারীদের নেতা। এই খবরটি প্রচার করেছিলেন বি. বি. সি এবং রয়টার সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশের সংবাদদাতা আতিকুল আলম। ২০শে আগস্ট প্রায় দুই ডজন বিদেশী সাংবাদিক ঢাকাতেই একটি বিশেষ প্লেনে করে ঢুকেছিলেন। কোনো কারণবশত এই সাংবাদিকদের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আটকে রাখা হয়। কিন্তু আতিকুল আলম গিয়ে এদের সঙ্গে দেখা করেন এবং সবাইকে বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে খুন করার প্রধান কারণ কোনো রাজনৈতিক নয়, ব্যক্তিগত।

আর এই ব্যক্তিগত কারণটি হলো শেখ মুজিবুর রহমান এবং মেজর ডালিমের ঝগড়া। কি উদ্দেশ্যে আতিকুল আলম এই মিথ্যা খবরটি প্রচার করেছিলেন তার সঠিক কারণ জানা যায়নি। আতিকুল আলম মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান রেডিওতে কাজ করতেন এবং আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী কাজ করতেন। যুদ্ধের পর বেশ কিছুদিন তাকে জেলখানায় আটক রাখা হয়। পরে শেখ মুজিবুর রহমানের আদেশে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।"[৯]

২. আবার অনেকে বলেন দুর্নীতির জন্য শেখ মুজিবকে নিহত হতে হয়েছে। পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ সংবাদ পত্রগুলোতে রং মাখিয়ে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, লুটপাট ও কালোবাজারের কাহিনী ফলাও করে ছাপানো হতে থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই সমস্ত সংবাদপত্রগুলো পুঁজিবাদী দেশ থেকে প্রকাশিত। তাদের ঐ সব প্রকাশিত রিপোর্ট দুই একটি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন–

২.১ এ ব্যাপারে কারোর সন্দেহ নেই যে দুর্ভিক্ষ সামলাবার জন্য বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু সাহায্যকারী দেশগুলোর ধারণা এই যে বন্যার অজুহাতে বাংলাদেশ সরকার অধিকতর খয়রাত আদায় করে নিজেদের দুর্নীতি খোরাক যোগাতে চাচ্ছে। 'নিজের সাহায্যের জন্য নিজেও সাহায্য কর—এ কথা বাংলাদেশে অর্থহীন। কেননা যত সাহায্য এসেছে তা আওয়ামী লীগ নেতাদের ব্যক্তিগত পকেটে গিয়েছে। মিঃ টনি হেগেন— যিনি বাংলাদেশের জাতিসংঘের দেয়া সাহায্যের কাজে ছিলেন— প্রকাশ করেছিলেন যে যাবতীয় খয়রাতি শিশুখাদ্য ও কম্বলের অতি অল্পই ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে। বাদবাকী কালো বাজারে বিক্রি হয়েছে অথবা পাচার হয়ে ভারত চলে গেছে। সে অবস্থার আজও পরিবর্তন হয়নি। ঢাকার সংবাদ পত্রে ঘোষণা করা হলো যে, বন্যা পীড়িতদের জন্য এক উড়োজাহাজ ভর্তি গুড়ো দুধ বিমান

বন্দরে আসছে ঠিক তার পরদিনই ঢাকার হোটেল ম্যানেজারেরা এগুলো কিনতে বাজারে তাদের লোক পাঠিয়ে দিলেন। বস্তুত এই ভাবেই বাংলাদেশে বন্যার্তদের জন্য দেয়া বিদেশী সাহায্য বিতরণ করা হয়ে থাকে।

যে সকল শিয়ালকে হাঁস পাহারা দিতে দিয়েছেন; অর্থাৎ যে সরকার কুখ্যাত জোচ্চোর (দেশে ও বিদেশে) গাজী গোলাম মোস্তাফাকে জাতীয় রেডক্রসের সভাপতি নিযুক্ত করেছেন, সে সরকার সম্পর্কে কোনো কিছুতেই বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। মোস্তফা ও পদ পেয়েছেন যেহেতু তিনি ঢাকা আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকায় তার অনেক বেশি মওকা মিলেছে। তিনি শুধু গুড়োদুধই কালো বাজারে বিক্রি করেননি, অনেক ওষুধপত্রও আত্মসাত করেছেন। বাংলাদেশের রেডক্রস সভাপতি এখন ৩৭টি ওষুধের দোকানের মালিক।[১০]

২.২ আজ দেশের সচেতন নাগরিক মাত্রই বুঝতে পারবেন যে ঐগুলো ঐ সময়ের যথার্থ রিপোর্ট না নির্লজ্জ মিথ্যা কাহিনী।

১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্টের পর গাজী গোলাম মোস্তফাকে গ্রেফতার করে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়—যা কোর্টে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। শুধু তাই নয় ৩৭টি ওষুধের দোকানের মালিক নাকি গাজী গোলাম মোস্তফা। তার মালিকানা আছে কোথায়? তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে গাজীর এমন কোনই সম্পদ ছিল না।

২.৩ অন্য একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে—

দেশের সম্পদ বিদেশে চলে যাচ্ছে। তা সম্ভব হচ্ছে সরকারের অভ্যন্তরে ব্যাপক দুর্নীতির জন্য। বাংলাদেশের 'জর্জ ওয়াশিংটন' প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান নিজে হয়ত কোনদিনই ঘুষ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু সর্বত্র গুজব ছড়িয়ে রয়েছে যে, প্রধান মন্ত্রীর স্ত্রী ঘুষ খান। সরকারি কর্মকর্তারা যে ঘুষ খান তাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে তারা যদি ঘুষ না খেতেন তাহলে হয়ত চোরাচালান সম্ভব হত না।[১১] জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে যাই প্রচার করা হোক না তার মূল লক্ষ্য ছিল প্রকৃত ঘটনা এবং ষড়যন্ত্রকারীদের কারসাজিগুলো যেন সহজে বেরিয়ে না আসতে পারে। বলাবাহুল্য সার্বিকভাবে তাদের এই উদ্দেশ্য সাধনে তারা সক্ষম হয়েছিল। কোন সত্যকে হাজার মিথ্যার প্রলেপ দিয়েও যেমন আড়াল করা যায় না। সত্য আজ হোক কাল হোক তা যেমন বেরিয়ে আসবেই, মুজিব হত্যার প্রকৃত ঘটনা ও লক্ষ্য ধীরে হলেও প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

৩. মুজিব হত্যা সম্পর্কে ওয়াশিংটন পোস্ট লিখছে, "The young officers were motivated more personal grivences with Mujib than by ideological and political differences"[১২] এখন দেখা যাক এই আদর্শিক ও রাজনৈতিক পার্থক্যগুলো কি?

৪. ১৯৭৯ সনের ৪ঠা আগস্ট, 8' Days' পত্রিকায় 'দি ম্যান হু কিল্ড মুজিব', শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উক্ত পত্রিকায় এক সাক্ষাতকারে মেজর রশীদ বলেছেন ঃ তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করা।[১৩]

৫. বঙ্গবন্ধু হত্যার পরবর্তী পাশ্চাত্য সংবাদ জগতে অত্যন্ত কৌশলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকে কতিপয় সেনা–অফিসারদের কারসাজী হিসেবে উপস্থাপন করার অপপ্রয়াস চালালেও সম্প্রতি আত্ম-স্বীকৃত খুনী চক্র বঙ্গবন্ধু হত্যা সম্পর্কে সকল গালগল্প ও ব্যক্তি আক্রোশের কথা দ্ব্যার্থহীনভাবে অস্বীকার করেছে। খুনী রশীদ দাবী করেছে তাদের হত্যা পরিকল্পনা ছিল রাজনৈতিক।[১৪] বঙ্গবন্ধু হত্যার এই রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে সমাজ প্রগতির ধারা থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী ধারায় নিয়ে যাওয়া।

# অষ্টম অধ্যায়

## হত্যার কালরাত

১৪ আগস্ট ১৯৭৫।
বৃহস্পতিবার।
দিনের আলো নিভে এল।
রাত এল। কাল রাত।

২. মার্চ ১৯৭৫।
বঙ্গবন্ধুকে বলা হলো : সেনাবাহিনীকে বসিয়ে রাখা সঠিক নয়।
সে জন্য নির্দেশ গেল : ট্রেনিং কোর্স চালু কর। বিশেষতঃ ট্রেনিং প্রয়োজন পুনর্গঠিত ট্যাংক বাহিনীর ও গোলন্দাজ বাহিনীর; অর্থাৎ সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারি এবং বেঙ্গল ল্যান্সারের।
কিন্তু তাদের নিকট ট্রেনিং বড় কথা ছিল না।
তাদের মনে ছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র।[১]

২.১ সে জন্য তারা ১৯৭৫ সনের মার্চ মাস থেকেই একত্রে ট্রেনিং শুরু করে। সেই সাথে তারা এ নির্দেশ ও অনুমতি লাভেও সক্ষম হয় যে অন্যান্য ট্রেনিং ব্যতিরেকও প্রতিমাসে তারা দুইবার নাইট ট্রেনিং করতে পারবে।[২]

৩. ১৯৭৫ সনের ১৪ই আগস্ট।
ট্রেনিং-এ ট্যাংক রেজিমেন্ট ও বেঙ্গল ল্যান্সার-এর সাথে সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারির সমন্বয় সাধন করা হয়।[৩]

৩.১ এ সব বাহিনীর সর্ব সাকুল্যে সেনাশক্তি ৪০০ জন মাত্র ছিল।[৪]

৩.২ টি–৫৫ ট্যাংক ৩০টি, কামান ১৮টি, এর মধ্যে দুটি ট্যাংক নষ্ট, অকেজো ছিল। কামানের ক্যাটাগরি ছিল ১০৫ এম, এম যুগোশ্লাভিয়া তৈরি হাউটজার।[৫]

৪. ষড়যন্ত্র চলছিল অন্যভাবেও।
সেকেন্ডে ফিল্ড আর্টিলারি ব্যাটালিয়ানের কম্যান্ডিং অফিসার তখন লে. কর্নেল আনোয়ার হোসেন।
আর ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সার বাহিনীর; অর্থাৎ ট্যাংক বাহিনীর কম্যান্ডিং অফিসারের দায়িত্বে ছিলেন লে. কর্নেল আবদুল মোমেন।

৪.১ কিন্তু ১৪ আগস্ট রাতে নাইট ট্রেনিং—এ যাবার সময় দেখা গেল লে. কর্নেল আনোয়ার হোসেন পূর্বেই প্রেসিডেন্টের স্পেশাল মিলিটারি সেলের ডেপুটেশনে সেখানে কর্মরত আছেন। আরো দেখা গেল, বেঙ্গল ল্যান্সার বা ট্রাংক বাহিনীর কম্যান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল আবদুল মোমেন ছুটিতে বাইরে আছেন।

৪.২ সুতরাং সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারি কম্যান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব অর্পিত ছিল মেজর রশিদের উপর এবং বেঙ্গল ল্যান্সার বা ট্যাংক বাহিনীর কমান্ডারের দায়িত্ব ন্যস্ত হলো মেজর ফারুক রহমানের উপর।

৪.৩ সেনাবাহিনীর কোনো উর্ধ্বতন অফিসারের ষড়যন্ত্রে এরূপ 'সুবর্ণদায়িত্ব' মেজর রশিদ—ফারুকের হাতে গিয়ে পড়েছিল আজো তা প্রকাশিত না হলেও ভবিষ্যৎ নিশ্চয় তা বলে দেবে।

৫. সুতরাং ট্যাংক বাহিনী ও আর্টিলারি রেজিমেন্টের দায়িত্ব পেয়ে দুই ভায়রা পরিকল্পনা মাফিক বর্তমানে জিয়া অন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সৈন্য সামন্ত, কামানসহ গমন করে।[৬]

৫.১ জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে যাওয়ার পূর্বে তারা সেনাবাহিনী হতে বহিষ্কৃত কতিপয় অফিসারকে শেখ মুজিবের ও তার সরকারের উপর যাদের 'ব্যক্তিগত আক্রোশ' ছিল তাদের ঐ বিমান বন্দরে আসার জন্য সংবাদ প্রেরণ করে।[৭]

৫.২ বঙ্গবন্ধু হত্যার মাত্র একঘণ্টা পূর্বে প্রাক্তন অফিসারবৃন্দ তাদের সাথে যোগ দেয়।

৬. ১৫ই আগস্ট ভোর ৪—৪০ মিঃ থেকে পাঁচটার মধ্যে উপস্থিত সেনাশক্তিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হলো। পরিকল্পনামাফিক কাজ শুরু হয়। ১২টি ট্রাকে কালো যমদূতের দল। ট্যাংক গর্জন করে উঠল।
চাঁদ ডুবে গেছে তখন। বিশাখা চলে গেছে।
অনুরাধা এসেছে লক্ষ কোটি তারার মিটমিটি রহস্য নিয়ে।
স্তিমিত আলো আঁধারের ছায়াছায়া মূর্তিগুলো বিভীষিকার মতো জ্বলছে।
জুপিটার আর মার্চ বাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে।

৭. ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান ও প্রথম প্রতিবন্ধকতা রক্ষীবাহিনী। ঢাকায় তখন তিন হাজার রক্ষীবাহিনী মোতায়েন।[৮]

৮. ফারুক দায়িত্ব নিল রক্ষীবাহিনীকে নিউট্রালাইজ করার।[৯]

৯. ডালিমের মেজর মহিউদ্দিনের দায়িত্ব ছিল এক কোম্পানি ল্যাকসার নিয়ে মেজর নূর ও বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাওয়া। সেরনিয়াবাতকে হত্যার।

১০. আর শাহরিয়ার অন্যদের রেডিও দখলের দায়িত্ব।

১১. নায়েক সুবেদার মোসলেমের দায়িত্ব ছিল শেখ মনিকে হত্যার।

১২. ফারুক জানত ঢাকায় তখন তিন হাজার রক্ষীবাহিনী, কিন্তু তাদের হাতে ভারী অস্ত্র নেই। সবই হালকা অস্ত্র। ট্যাংক বিধ্বংসী নেই।

১৩. ট্যাংকে কোন প্রকার গোলাবারুদ ছিল না। সে জন্য রশিদের বাহিনীর নিকট হতে পর্যাপ্ত অন্যান্য অস্ত্র, কামান সরবরাহ নেয়া হয়।[১০]

১৪. রশিদকে বলা হয়েছিল, শেখ মুজিবের বাসার দিকে গোলা নিক্ষেপ করতে যাতে রক্ষী বাহিনীর মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। এবং তারা শেখ মুজিবের সাহায্যে অগ্রসর হতে না পারে।[১১]

১৫. ফারুক রহমান ২৮টি ট্যাংক নিয়ে সম্ভাব্য প্রতিরোধ দমনের উদ্দেশ্যে ক্যান্টনমেন্ট গ্যারাজ হতে বের হয়, কিন্তু তেজগাঁও বিমান বন্দরের নিকট এসে সে দেখল তাকে শুধু একটি মাত্র ট্যাংকই অনুসরণ করতে সমর্থ হয়েছে।

১৬. ফারুক এক সাক্ষাৎকারে বলেছে, "তাতেও আমি ভড়কে যায়নি। আমার' ট্যাংক নিয়ে বিমান বন্দরের সীমান্ত প্রাচীর ভেঙ্গে কয়েকটি গাছকে দুমড়িয়ে আমি যখন রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের নিকটে চলে এলাম তখন দেখলাম তিন হাজার রক্ষীবাহিনীর একটি ব্রিগেড লাইন আপ হয়ে আছে। তারা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত, হেলমেট পরিহিত। এ সব দেখে আমার ট্যাংকের ড্রাইভার আমাকে জিজ্ঞেস করল, তার করণীয় কি? আমি তাকে বললাম যে, ৬´ ইঞ্চি ব্যারেল তাদের নাক বরাবর উঁচু করে ধর। গানারকে বললাম : তোমার 'গান'কে তাদের দিকে তাক কর। দেখলাম তারা বেশ সাহসী দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে। আমরাও তাই করলাম। আমি ড্রাইভারকে বললাম, যদি তারা আমাদের কিছু করতে চায় তাহলে তুমি ডান দিকে স্টিয়ারিং কেটে সরাসরি চালিয়ে দেবে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কিছুই ঘটল না রক্ষীবাহিনী পরিস্থিতি বিবেচনা করছে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আমার স্থির প্রতীতি ছিল যে, তার আর সহসা কোনো প্রকার রিয়াক্ট করবে না।"[১২]

১৭. সি. আই. এ. ও আর্মি ক্যু প্লানারদের একটি মাত্র মাথাব্যথা ছিল আর তা হলো রক্ষীবাহিনী। রক্ষীবাহিনীকে জনগণের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং সেনাবাহিনীকে রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার কৌশল গ্রহণ করা ছাড়াও তারা রক্ষীবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় রাখার জন্য বাস্তব ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। রক্ষীবাহিনী প্রধান ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডিফেন্স সম্পর্কিত একটি কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ব্রিগিডিয়ার নূরুজ্জামান সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। রটনা করা হলো, রক্ষীবাহিনীর জন্য ট্যাংক যোগাড় করতে ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান বিদেশে যাচ্ছে। ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

উদ্দেশ্যে ১২ই আগস্ট রওনা হন। পথে লন্ডনে জানলেন বঙ্গবন্ধু নিহত। তার আর কিছু করণীয় ছিল না।

১৭.১ সি. আই. এ রক্ষীবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য মোক্ষম সময়ে রক্ষীবাহিনীর প্রধানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এটা আজ অত্যন্ত পরিষ্কার। ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান যে ক্যুদেতা সংগঠকদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না তার বড় প্রমাণ ২রা নভেম্বর খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে যখন খুনী মেজরদের হটানো হচ্ছিল তখন তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৭.২ রক্ষীবাহিনীর চার্জে তখন লেঃ কর্নেল আবুল হাসান। পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসার। ভীত। আতঙ্কগ্রস্ত। পলাতক।

১৭.৩ রক্ষীবাহিনীকে অর্ডার দেয়ার কর্তৃত্ব পাওয়া গেল না।

১৭.৪ দীপক তালুকদার সিনিয়র লিডার রক্ষীবাহিনীর। সেদিন তিনি ডিউটি অফিসার। অতি প্রত্যুষে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ব্যবস্থাদি দেখতে গেলেন। সহসা বিকট কামানের আওয়াজ। মিৎসুবিসি মাঝারি ট্রাকে তার সাথে এক সেকশন রক্ষী। আওয়াজ লক্ষ্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলেন। না, বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে যাওয়া যাচ্ছে না। গোলাগুলি চলছে। গাড়ি ঘুরিয়ে তারা সদর দপ্তরের দিকে রওনা হয়।

১৮. তোফায়েল আহমদ তখন জেগে গেছেন। ফজলুল হক মনিকে এর মধ্যে হত্যা করা হয়েছে। তোফায়েল আহমদ ফজলুল হক মনির বাড়িতে টেলিফোন করলেন, শেখ সেলিম টেলিফোন ধরলেন। বললেন কালো পোশাক পরে এক দল সশস্ত্র লোক মনি ভাই ও ভাবিকে গুলি করেছে। ওরা এখনো বাড়ি ছেড়ে যায়নি। তোফায়েল আহমদ ফোন করলেন বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে। বঙ্গবন্ধু বললেন, "আমার বাড়িও আক্রান্ত, যা পারিস কর।"

তোফায়েল ফোন করলেন আবদুর রাজ্জাককে।

ফোন করলেন, "তিনি রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরে।" রক্ষীবাহিনীর ডেপুটি ডাইরেক্টর একজনকে তিনি ফোন করে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ও ফজলুল হক মনির বাড়িতে দ্রুত যাবার জন্য অনুরোধ করেন। ফোন করেন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে। ফোনে তিনি জানালেন "আই এ্যাম সারাউন্ডেড বাই ট্যাংকস্।"

আবার রক্ষীবাহিনীকে তিনি অনুরোধ করেন দ্রুত বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাবার জন্য। রক্ষীবাহিনী বলল, তাদের ট্যাক দ্বারা ঘিরে ফেলা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে তিনি পুনরায় ফোন করেন। তখন কেউ সে সময় ফোন ধরেনি।

রেডিওতে তখন বঙ্গবন্ধু হত্যার খবর ডালিম ঘোষণা করেছে।

পুনরায় ফোন করাতে রক্ষীবাহিনীর একটি গাড়ি এসে তাকে রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরে নিয়ে যায়।[১৩]

১৮.১ রক্ষীবাহিনী তাদের গাড়িতে করে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের হত্যার প্রাক্কালে স্পেশাল এসিস্ট্যান্ট তোফায়েল আহমদকে কেন সদর দপ্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন? তোফায়েল আহমদ সেখানে রক্ষীবাহিনীর বা সামরিক কোনো নেতার সঙ্গে কথা বলেছিলেন? কি বলেছিলেন? আজ পর্যন্ত তা পরিষ্কার করে তোফায়েল আহমদ কোথাও বলেছেন বলে আমার জানা নেই। রক্ষীবাহিনী কেন নিষ্ক্রিয় থাকল? বঙ্গবন্ধুকে বাঁচানোর জন্য কেন তারা ত্বরিৎ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলো? কারা দায়ী তাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। অথচ ফারুকের জবানীতে জানা যায়, রক্ষীবাহিনী যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত ছিল।

১৮.২ রক্ষীবাহিনীর ব্যর্থতার বিষয়টি নিয়ে নানাভাবে কথা চলে আসছে। 'হু কিল্ড মুজিব' বইতে এ এল খতিব রক্ষীবাহিনীর ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, তোফায়েল আহমদ রক্ষীবাহিনীকে ফাইট করার নির্দেশ দিতে পারেননি কেননা তিনি বড্ড বেশি ভেঙ্গে পড়েছিলেন।[১৪]

খ. তোফায়েল আহমদ অন্যত্র বলেছেন? রক্ষীবাহিনীকে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু রক্ষীবাহিনী সে নির্দেশ পালন করেননি।[১৫]

গ. ঐ সময়ে উপস্থিত রক্ষীবাহিনীর জনৈক সদস্য বলেছেন, তোফায়েল আহমদ পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান না করায় আমরা কিছুই করতে পারলাম না।[১৬]

ঘ. ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আবদুর রশিদ বঙ্গবন্ধু হত্যার সংবাদ শুনে তোফায়েল আহমদকে টেলিফোন করেছিলেন। তোফায়েল নাকি তাকে বলেছেন, ওবায়দুর ভাই বলেছেন, যা হবার হয়েছে আর কি করার আছে![১৭]

১৯. ফারুক রক্ষীবাহিনীর দ্বিধাগ্রস্ততা বুঝতে পেরে ট্যাংক নিয়ে ধানমণ্ডির দিকে অগ্রসর হয়। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে ফারুকের লোকেরা তাকে থামায় এবং বলে যে সব ঠিকঠাক মতো সম্পন্ন হয়েছে।[১৮]

ধানমণ্ডির স্বচ্ছ লেকের জলে তখন শেষ রজনীর জ্বলজ্বল নক্ষত্রগুলো শিহরিত বত্রিশ নম্বর রোডের সবুজ আকাশ প্রদীপ জ্বলা বাড়িটির মাথা বাড়িয়ে বেতস পাতার কচি কচি ডগাগুলো তখন দুলছে। পাশের নিষ্প্রভ বাতিগুলো শেষ রাতের অন্ধকারকে দুই হাতে সরানোর প্রয়াসে ব্যস্ত।

২০. বত্রিশ নম্বর সড়ক ধরে রশীদের গোলন্দাজ বাহিনীর লোক এগিয়ে আসে দ্রুততার সঙ্গে। মেজর মহিউদ্দিন ও মেজর (অবঃ) নূর-এর নেতৃত্বে একই সঙ্গে এক কোম্পানি ল্যান্সার বাহিনী অগ্রসর হয়।

২০.১ প্রথমেই বাধা পায় তারা প্রেসিডেন্টের গার্ডদের তরফ থেকে। কিন্তু মেজর মহিউদ্দিন গাড়ি হতে নেমে আসে। তাদের পথ ছেড়ে দেবার আদেশ দিলে ল্যান্সার বাহিনীর লোকেরা তাদের স্যালুট করে পথ ছেড়ে দেয়। গার্ডদের ভেতরে কিছু ছিল বেঙ্গল রেজিমেন্টের, তারা সংখ্যায় অল্প ছিল। তারা নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

২০.২ পরিকল্পিতভাবে পূর্বেই ফারুক এদের প্রেসিডেন্টের পাহারায় নিয়ুক্ত করেছিল।[১৯] ব্রিগেডিয়ার মশারুল হক এদের ডিউটিতে নিযুক্ত করে। বলাবাহুল্য মশারুল হক মোনায়েম খানের মিলিটারি সেক্রেটারি ছিলেন।[২০]

২০.৩ যাহোক প্রেসিডেন্টের সামরিক গার্ডবাহিনী বাধা প্রদান করেনি। বাধা প্রদান করেন একজন পুলিশ ডি. এস. পি। ঘটনা স্থলেই তাকে হত্যা করা হয়।

২১. এরপর সৈন্যরা বাড়িটি ঘিরে ফেলে এবং চারিদিক থেকে গুলিবর্ষণ করতে থাকে।

২২. পুলিশ ডি. এস. পি নিহত হলে মেজর মহিউদ্দিন, মেজর নূর, হুদা সদলে ঘরে ঢুকে পড়ে। এ প্রসঙ্গে ফারুক বলেছেন, 'শেখকে নিচে এসে আত্মসমর্পণের জন্য বলা হলো। কিন্তু শেখ বাইরে না এসে ঘরের মধ্যে গিয়ে অবিলম্বে ফোন করলেন আর্মি চীফ জেনারেল শফিউল্লাহকে, প্রেসিডেন্টের মিলিটারি সেক্রেটারি কর্নেল জামিলকে, রক্ষাবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্সে। তারা তাকে দ্রুত উদ্ধারের আশ্বাস দিয়েছিল। সেজন্য তিনি উৎসাহিত হয়ে পুত্রদের প্রতিরোধ করার জন্য অস্ত্র তুলে নেয়ার নির্দেশ দেন। এতে ঘটনাস্থলে আমাদের একজন লোক নিহত ও চারজন গুরুতর আহত হন। ফলে আমরা গুলি বর্ষণ করি এবং ঘরের মধ্যে গ্রেনেড নিক্ষেপ করি, সকলেই নিহত হন।[২১] ফারুকের এই বিবৃতি সম্পূর্ণ নয়। সেদিন ঘটনার পর পর অনেকেই সে বাড়িতে ঢুকেছিলেন। তারা যা বলেছেন তা হলো—

পাহারারত পুলিশের লোকটি অভ্যর্থনা কক্ষে নিহত হয়েছেন। শেখ কামালের লাশ পড়েছিল দরজার পাশে বারান্দায়। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি বাঁক নিয়ে যেখানে সমান জায়গা সেখানে বঙ্গবন্ধুর লাশ পড়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ঘরের সামনে বেগম মুজিব হাঁটু ভেঙ্গে যেন পড়ে আছেন। আর

বঙ্গবন্ধুর বড় খাটের পাশে জামালের মৃত দেহ পড়েছিল।[২২]

২৩. ফারুক বলেছে, বঙ্গবন্ধু ডি. এফ. আই. চিফ কর্ণেল জামিলকে টেলিফোন করেছিলেন। কথাটি সত্যি। ফোন পেয়েই কর্ণেল জামিল কয়েক জায়গায় ফোন করলেন।[২৩]

২৩.১ কর্নেল জামিল তখন গণভবনের সরকারি কোয়ার্টারে থাকতেন। বঙ্গবন্ধুর ফোন পেয়েই তিনি ড্রাইভার আইনুদ্দিনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু সোবহানবাগ মসজিদের নিকট তাকে বাধা দেয়া হয় এবং তাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে ফেলা হয়। বঙ্গবন্ধুর প্রাক্তন সামরিক সচিব ও ডি. এফ. আই চিফ কর্তব্য নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করে জীবন বিসর্জন দিলেন।[২৪]

২৪. পূর্বে ডি এফ আই চিফ ছিলেন ব্রিগেডিয়ার রউফ। কিছুদিন পূর্বে তিনি আমেরিকা থেকে ঘুরে এসেছেন। বঙ্গবন্ধু তাকে অন্যত্র বদলী করেন। তার জায়গায় কর্নেল জামিলকে নিয়োগ করেন। ব্রিগেডিয়ার রউফ ডি. এফ. আই-এর চার্জ তখন হাতে আটকে রেখেছে, দেই দেই করেও চার্জ দিচ্ছিলেন না।[২৫]

শেষ পর্যন্ত ১৫ তারিখে চার্জ হ্যান্ড ওভার করার কথা ছিল এবং ঐ দিন কর্নেল জামিলের ব্রিগেডিয়ার পদে প্রমোশনের কথা ছিল।[২৬]

২৫. বঙ্গবন্ধু হত্যার ঐ দিন সকালে যে সকল অফিসার প্রত্যক্ষভাবে হত্যাকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করেছেন তারা হলেন- মেজর (অবঃ) ডালিম, মেজর আজিজ পাশা, মেজর শাহরিয়ার, মেজর বজলুল হুদা, মেজর রশীদ চৌধুরী, মেজর মহিউদ্দিন, মেজর নূর, মেজর শরীফুল হোসাইন, ক্যাপ্টেন কিসমত হোসেন, লে. খায়রুজ্জামান ও লে. আবদুল মজিদ।

২৫.১ এরাই মূলত চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ব্লুপ্রিন্ট মোতাবেক আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মনি এবং বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আক্রমণ করে। লে. কর্নেল ফারুক ট্যাংকসহ দায়িত্ব গ্রহণ করে রক্ষীবাহিনীকে নিউট্রলাইজ করার। মেজর রশিদ তেজগাঁও বিমান বন্দরের পাহারা দেয়। মেজর (অব.) ডালিম ও ক্যাপ্টেন কিসমত যায় রেডিও দখল করতে। মেজর শাহরিয়ার ও লে. আবদুল মজিদ যায় মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায়। সুবেদার মুসলেম উদ্দিন তিন ট্রাক সৈন্য নিয়ে শেখ ফজলুল হক মনির বাসায় গমন করে। লে. কর্নেল রশীদ, মেজর হুদা, মেজর আজিজ পাশা, মেজর মহিউদ্দিন, মেজর নূর, লে. খায়রুজ্জামান সবাই বাকি সৈন্যদের নিয়ে ধানমণ্ডির ৩২ নং সড়কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

২৬. ধানমণ্ডি ৩২ নং রাস্তার প্রবেশ পথে মিরপুর রাস্তায় কালভার্ট। সেখানে কিছু সৈন্য রেখে তারা বঙ্গবন্ধুর পুরা বাড়িটি ঘিরে ফেলে এবং চারদিক থেকে গুলি বর্ষণ করে। গুলির শব্দে কামাল ছুটে নেমে আসে। কাউকে টেলিফোন করতে চেষ্টা করে। সেই অবস্থায় খুনীদের হাতে সে মারা যায়।

২৬.১ দরজা খোলাই ছিল। মেজর মহিউদ্দিন, মেজর হুদা, নূর কতিপয় সৈনিক নিয়ে উপরে উঠতে থাকে। সিঁড়ির বাক নিতেই দেখল বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে। তাদের দেখে বঙ্গবন্ধু কি বলেছিলেন তা আজও অজ্ঞাত। তবে ফারুকের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, বঙ্গবন্ধুকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু আত্মসমর্পণ না করে পুনরায় ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেন এবং কয়েক জায়গায় টেলিফোন করেন।[২৭] পাঞ্জাবীটি পরে নেন। নেন তার প্রিয় পাইপটি।

২৬.২ কাগজপত্র বিবৃতি ও সাক্ষাৎকার থেকে যদ্দুর বোঝা যায় বঙ্গবন্ধু নিজেই নিচে নেমে আসছিলেন, কিন্তু কামালকে মেরে ফেলেছে এ সংবাদ পেয়ে ঘুরে পুনরায় উপরে উঠতে থাকেন।

২৬.৩ যতদূর জানা যায়, সুবেদার মোসলেম উদ্দিন শেখ মনিকে খুন করে এসে এই অবস্থা দেখে সাথে সাথেই বঙ্গবন্ধুকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। বঙ্গবন্ধু থমকে দাঁড়ান। তারপর পড়ে যান সিঁড়ির উপর।[২৮]

সময় সকাল ৫–৪০ মিনিট।[২৯] পড়ে যাওয়া পুরা দেহটার উপর চলে ব্রাস ফায়ার। তারপর মেইন সুইচ অফ করে দিয়ে চলতে থাকে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। দুই কন্যা ব্যতীত সপরিবারে সবাই নিহত হন [পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য]

২৭. মোসলেম উদ্দিন মৃত্যুর পূর্বে তার জবানবন্দিতে স্বীকার করেছে যে সেই শেখ মুজিবকে প্রথম গুলি করে। মোসলেম উদ্দিন ১৯৭৩ সনের পাকিস্তান প্রত্যাগত সুবেদার। ১৯৭৫ সনের ২রা নভেম্বর খালেদ মোশাররফ ক্ষমতা দখল করলে সে দেশ ত্যাগ করে এবং পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান তাকে তৃতীয় সচিবের মর্যাদা দেয় ও অনারারি কাপ্টেন পদে উন্নীত করে। কিন্তু এতে মোসলেম উদ্দিন সন্তুষ্ট না হয়ে ১৯৭৭ সনের ২রা অক্টোবরের ক্যু-তে জড়িয়ে পড়ে। ক্যু ফেল করে এবং সে ধৃত হয়। স্পেশাল মিলিটারি ট্রাইবুন্যালে রায়ে তার ফাঁসি হয়। মৃত্যুর পূর্বে তার জবানবন্দীতে সে আরো বলেছে যে, শেখ মুজিবকে হত্যা করার জন্যই আজকে তার ফাঁসি হচ্ছে। ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট রাতে সে মাতাল ছিল।[৩০]

২৮. বঙ্গবন্ধুর শরীরে ২৮টি গুলি লাগে। মুখে কোনো গুলি লাগেনি। গায়ে সাদা পাঞ্জাবী ও স্যাণ্ডো গেঞ্জি ছিল। পাঞ্জাবীর সাইড পকেটে ছিল তাঁর প্রিয় পাইপটি। বুক পকেটে ছিল চশমা, যার একটি কাচ ভাঙা। কাঁধের উপর ছিল দুই আড়াই হাতের তোয়ালে।[৩১]

২৯. ফারুক বলেছে, শেখকে জীবিত বন্দি করে রাখা সম্ভব ছিল না। তাহলে তার প্রতিক্রিয়া হতো ভয়াবহ। রশিদ–ফারুক অন্য এক সাক্ষাৎকারে বলেছে, শেখকে যে হত্যা করা হবে এটা দলের সকলে জানত না।[৩২]

৩০. অন্য এক তথ্য হতে জানা যায়, শেখকে হত্যা করার পরামর্শ দেয় গণবাহিনীর নেতৃবৃন্দ। অভ্যুত্থান এক সংগে যৌথভাবে ঘটানোর কথা ছিল, কিন্তু মোশতাক চক্র পূর্বেই ঘটনাটি ঘটিয়ে ফেলে [পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য]।[৩৩]

## নবম অধ্যায়

### রক্তমাখা বুক জুড়ে স্বদেশের ছবি...

ভোর ৬টা ১ মিনিট।

১. বেতার থেকে ঘোষিত হলো ঃ আমি মেজর ডলিম বলছি, স্বৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।

২. খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি হয়ে বসেন এবং সারা দেশে সামরিক শাসন জারী করা হয়।

৩. কর্নেল (অব.) আবু তাহের তার জবানবন্দিতে বলেছেন ঃ বাংলাদেশ বেতার ভবন থেকে বারবার আমাকে অনুরোধ করার পর সকাল ৯ ঘটিকায় আমি সেখানে গমন করি। কর্নেল রশীদ আমাকে একটি রুমে নিয়ে গেল সেখানে আমি (খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে উপবিষ্ট দেখি। সেখানে তিনি তাহের উদ্দিন ঠাকুর ও মাহবুবুল আলম চাষীকেও দেখতে পান।[১]

৩.১ মাহবুবুল আলম চাষী ১৩ই আগস্ট কুমিল্লা থেকে উধাও হয়। ১৪ তারিখে তাকে কোথাও দেখা যায়নি। ১৫ তারিখে বেতার কেন্দ্রে তাকে পাওয়া যায়।

৪. ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

চারদিক থমথমে। জোয়ানরা সব নিশ্চুপ। সবারই মনে প্রশ্ন ব্যাপার কি?
সত্যই কি শেখ মুজিব নিহত?
বাংলাদেশ বেতার তখন বলে চলেছে?
আমি মেজর ডালিম বলছি— শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।
প্রচণ্ড বিস্ময়ের আঘাতে সবাই স্তব্ধ। বিমূঢ়।
ক্যান্টনমেন্টের আট দশ হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র দুটি ব্যাটলিয়নের এই কাজকে যেন সকলে মেনে নিতে পারছে না। কেউ যেন বিশ্বাস করছে না।
পাথরের মতো নিশ্চুপ সব।
সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কিছুই অবগত নন। অথচ বেতারে

সেনাবাহিনী কর্তৃক দেশের সর্বময় ক্ষমতা দখলের কথা বলা হচ্ছে। এ এক গোলক ধাঁধা। কৌশলী প্রচার। সবাই যেন বুঝেও বোবা। তখন চারদিকে মেঘ ভাঙ্গা রোদের নিষ্প্রভ আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ আগেই হঠাৎ করে বৃষ্টি এল। সারা প্রাঙ্গণ কান্নার মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

৪.১ সাতটা পনেরো মিনিট।

ডেপুটি চিফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান অফিসে এল। স্বাভাবিক। যেন কিছুই হয়নি। এতটুকু পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া নেই। এর পর পরই সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ এল। তার সামনে পেছনে ল্যান্সার এবং আর্টিলারি গার্ড। হেড কোয়ার্টার অফিস তখন কৌতূহলের আর উৎসুক্যের দৃষ্টিতে ছেয়ে আছে। এর পনের মিনিট পরে—

মেজর ডালিম এল—মেজর রশিদ এল।

দুটো এম, জি জিপ-স্কট্ নিয়ে তারা হেড কোয়ার্টারে এল।

সোজা ঢুকে গেল শফিউল্লাহর রুমে।

পাঁচ মিনিট পরে শফিউল্লাহর রুম থেকে তারা বেরুল।

শফিউল্লাহ বেরুল—পেছনে জিয়াউর রহমান।

জিয়াউর রহমান একটু এগিয়ে এসে ডালিমকে বলল, কাম হিয়ার, আবেগের কণ্ঠে জিয়া ডাক দিলো ঃ য়্যু হ্যাভ ডান্ সাস্—এ গ্রেট জব! কিস্ মি! কিস্ মি!!

জিয়া ডালিমকে জড়িয়ে ধরলো পরম উষ্ণতায়।

জিয়া বলল ঃ য়্যু কাম্ ইন মাই কার্—

নো স্যার থ্যাঙ্ক য়্যু ভেরি মাচ্। য়্যু আর মেজর জেনারেল এন্ড আই য়্যাম সিম্পল মেজর, আদারওয়াইজ য়্যু আর দ্য হিরো অফ ইন্‌ট্যায়ার শো। সো প্লিজ য়্যলউ মি টু মাই জিপ্।[২]

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান স্ট্যাফ কারে উঠল। মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে মেজর রশীদ ও মেজর ডালিম গার্ড করে রেডিও স্টেশনে নিয়ে গেল।

৫. অন্যদিকে সকাল পৌনে ছয়টা।

ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম আর প্রধানমন্ত্রী এম. মনসুর আলীর বাসার লাল টেলিফোন তখন ভীষণ ব্যস্ত।

ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলা শেষ হলো।

হ্যাঁ মোশতাককে ইমিডিয়েট য়্যারেস্ট কর আর বঙ্গবন্ধুকে যেমন করে যেখান থেকে পারো উদ্ধার কর।

প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলীর দৃঢ় কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল।
আমি দেখছি স্যার! প্রধান সেনাপতি শফিউল্লাহর গলা শোনা গেল।
কিছুক্ষণ পর বিমানবাহিনীর প্রধান খন্দকারকে পাওয়া গেল।
আমি এক্ষুণি বাংলাদেশ বেতারে বোম্বিং করছি।
স্পেশাল ব্রাঞ্জের ডি, আই, জি, ই, এ, চৌধুরীর কাছে নির্দেশ গেল পাল্টা ব্যবস্থার—
আই, জি–র সঙ্গে কথা বলে আমি ব্যবস্থা করছি স্যার।
রক্ষীবাহিনীর চার্জে তখন লেঃ কর্নেল আবুল হোসেন। ফোনে তার গলা নিষ্প্রাণ। ভীত। আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠস্বর। স্পষ্ট কিছু বোঝা গেল না।

৬. ঘটনার আরেকদিকে—
স্যার? আপনাকে প্রধানমন্ত্রী হতে হবে।
সাতমাথা মেইন রোডের পাশে জনাব তাজুদ্দিন সাহেবের বাসায় তখন ডালিম কথা বলছিল।
তাজুদ্দিন সাহেব মৃদু হাসলেন।
তোমার চেয়ে আমি বেশিদিন রাজনীতি করি বুঝলে?
তাজুদ্দিন সাহেবের কণ্ঠে দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠলো।
তার চোখে মুখে ঘৃণা।
ডালিমকে দরজা দেখিয়ে দিলেন। তার কণ্ঠের রাগ গরগর করে উঠল।
মৃত্যুর পোশাকে সজ্জিত একটি প্লাটুন তখন থেকে তাঁর বাসার প্রহরী হলো।[৩]
রক্ষীবাহিনীর প্রধান ক্যাম্পে তখন তুমুল উত্তেজনা।
অগ্নি–পরীক্ষা ঃ বিশ্বস্ততা, আনুগত্য আর আদর্শের।
সবাই ইয়ুনিফর্ম পরে নিল।
সজ্জিত সবাই প্রস্তুত।
বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে।
প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে তখন সারা বাংলায় জ্বলছে।
রক্ষীবাহিনীর প্রধান ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান বিদেশে।
লে. কর্নেল আবুল হাসান। ভীরু। কাপুরুষ। পলাতক। তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
নির্দেশ দেবে কে?
—নির্দেশ চাই।
রক্ষীজিপ্ সিক্যুরিটি দিয়ে স্পেশাল এসিস্ট্যেন্ট তোফায়েল আহমদকে নিয়ে এল। রক্ষীবাহিনীর পরিচালনার অলিখিত কিন্তু প্রতিষ্ঠিত দায়িত্ব তার উপর।

নির্দেশ চাই।
প্রতিশোধের নির্দেশ। প্রতিরোধের নির্দেশ।
উনসত্তুরের গণ অভ্যুত্থানের যুবরাজ তখন শোকে বিহ্বল।
সক্রন্দন। অস্থির মস্তিষ্ক। সিদ্ধান্তে অপারগ। সাহসহীন।
পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, চিটাগাং, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, টাংগাইল, পটুয়াখালী, রক্ষী ক্যাম্পগুলো তখন উত্তেজনায় কাঁপছে। হাজার হাজার যুবক ছাত্র-জনতা, একাত্তুরের বিপ্লবী আত্মারা তখন এ সব ক্যাম্পের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। পুলিশ নিষ্ক্রিয়। সেনাবাহিনী বিহ্বল এবং ইতিহাস স্থির সংকটে প্রতি মুহূর্তে কাল গুণছে...
হতাশায়, নৈরাশ্যে বিশাল এবং সজ্জিত রক্ষীবাহিনী মৃত বাঘের মতো বাংলার নরম মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে নিসাড় স্পন্দনহীন হয়ে গেল। ইতিহাসের চাকা তখন ঘুরছে।...

৭. খন্দকার মোশতাকের ঐতিহাসিক(!) ভাষণ তখন শেষ হয়েছে। একটু পরেই বাংলাদেশ বেতারে নতুন প্রেসিডেন্টের (!) প্রতি আনুগত্যের ভাষায় কথা বললেন একে একে সেনাবাহিনীর প্রধান শফিউল্লাহ, বিমানবাহিনীর প্রধান এ.কে. খন্দকার, নৌবাহিনীর প্রধান এম. এইচ খান, বি. ডি. আর প্রধান খলিলুর রহমান, পুলিশ প্রধান নূরুল ইসলাম, রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান লে. কর্নেল আবুল হাসান।
এল বিভ্রান্তি। বিক্ষোভের পরিবর্তে এল হতাশা। প্রতিশোধের বদলে এল ক্ষোভের নিষ্ক্রিয়তা। সবাই ভাবল তাহলে কি? সত্যিই কনসলিডেটেড আর্মি ক্যু!

৮. কর্ণেল শাফায়াতে জামিল শক্ত হাড়ের মানুষ। ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার। প্রত্যেক ইউটিকে নির্দেশ দিলেন স্ব স্ব ডিফেন্সিভ পজিশনে যেতে। প্রত্যেক ইউনিটে আর্মস গার্ড। রাইফেলের চকচকে নলগুলো যেন নতুন ভাষায় কথা বলতে চায়।[৪]

৯. সেনাবাহিনীর প্রধান সাড়ে এগারোটার দিকে হেড কোয়ার্টারে ফিরে এল। অফিসারদের য়্যাড্রেস করে বললেন ঃ যা হয়েছে—হয়েছে। বাট নাউ য়্যুঅল রিমেইন ইন ইয়োর রেসপেকটিভ ইউনিটস, নো ওয়ান স্যুড গো আউট অব ক্যান্টনমেন্ট স্টিল ফারদার অর্ডার...

১০. সারা দিন চলে গেল ঃ আবেগে, উত্তেজনায় অস্থিরতায় আর গুমোট ক্ষোভে! বাংলার গ্রামে গ্রামে।
টিমটিম বাতির আলো।
চাপা ক্রোধ তখনো ছড়িয়ে আছে।

বধূর চোখে জল।

মায়ের কণ্ঠে প্রার্থনার সুর।

রক্তসন্ধ্যা চারিদিকে ঘিরে আছে।

বিষণ্ণ! বিবর্ণ সন্ধ্যা।

সন্ধ্যার টি. ভি. কথা কয়ে উঠল!

শয়তানের মতো বদমাইস মোশতাকের কুটিল এবং খুনি চেহারা ভেসে উঠল।

তার পাশে একে একে দাগী এবং খুনী আসামীদের মতো চেহারার মন্ত্রীরা।

চারদিকে ব্যাপক বিভ্রান্তির হাওয়া।

সে হাওয়া ছড়িয়ে পড়ল বাংলার প্রান্তরে।

সেদিন যদি মন্ত্রীরা শপথ না নিতেন! রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করতেন? খুনীদের বয়কট করতেন? আন্দোলনের ডাক দিতেন? তাহলে?

প্রবাহিত ইতিহাস কি রায় দিত?

বঙ্গবন্ধুর লাশ রক্তের সিঁড়িতে।

বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীগণই শপথ নিলেন। গঠিত হলো নতুন মন্ত্রীসভা। উপরাষ্ট্রপতি হলেন বাকশাল গঠনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ উল্লাহ্। মন্ত্রীসভায় যোগ দেন বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভার সর্বজনাব আবু সাঈদ চৌধুরী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, ফনিভূষণ মজুমদার, মনোরঞ্জন ধর, আবদুল মোমেন, আসাদুজ্জামান খান, ড. এ.আর. মল্লিক, ড. মোজাফ্ফর আহম্মদ চৌধুরী, আবদুল মান্নান ও সোহরাব হোসেন।

প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, দেওয়ান ফরিদ গাজী, তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিনঠাকুর, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর এবং জে. এম. ওবায়দুর রহমান।

২০শে আগস্ট আরো ৫ জন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তারা হলেন, সর্বজনাব মোসলেম উদ্দিন খান, ক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডল, রিয়াজ উদ্দিন আহমদ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন ও মোমিন উদ্দিন আহমদ।

সব যেন ঠিক থাকলো।

সবাই থাকলো।

থাকলেন না শুধু একজন।

একটি লোক—একটি ইতিহাস—সংগ্রামী তিনটি দশককে যেন একটি দিনের দস্যুতায় ওরা মুছে দিতে চাইল।

এ নামের কেউ যে কোনোদিন ছিলেন এ কথা যেন ওরা ভুলিয়ে দিতে চায়।

১১. পরের দিন সকালে আর্মি হেড কোয়ার্টারের মিটিং।

সেনাবাহিনীর প্রধান চেয়ারে। জিয়াউর রহমান, ব্রিঃ খালেদ মোশারফ, ব্রিঃ সি আর দত্ত, ব্রিঃ মীর শওকত আলি, কর্নেল শাফায়াত জামিল, কর্নেল নাসিম, কর্নেল হুদা, কর্নেল আমজাদ হোসেন চৌধুরী, কর্নেল মৈনুল হোসেন চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত।

আলোচনা শুরু হলো। কর্নেল শাফায়াত জামিল সরাসরি ক্ষোভের কণ্ঠে বললেন, এটা আর্মি ক্যু হলে আমরা জানিনে কেন? আর একটা টোটাল আর্মি ক্যু না হয়ে থাকলে আমি মনে করি যারা এ জঘন্য কাজ করেছে তারা খুনী এবং দে শুড বি পানিশ্‌ড। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মেশারফ এবং কর্নেল হুদা এ বক্তব্য সমর্থন করে তাদের মতামত দিল।

শাফায়াত জামিল বলে চলল ঃ য়্যাজ য়্যু আর দি আর্মি চীফ, আই ওয়ান্ট অর্ডার ফ্রম য়্যু আই উইল ওয়াশড্‌ আউট্‌ অফ্‌ অল্‌ মার্ডারার্স উইথ্‌ইন হাপ য়্যান আওয়ার। শফিউল্লাহ নীরব নিশ্চুপ ঃ মাই ব্রিগেড ইজ রেডি এ্যান্ড ইফ্‌ য়্যু আর আনেরবল টু পাশ দ্যা অর্ডার দেন য়্যু লিভ দ্যা চেয়ার এন্ড আস্‌কড ডালিম টু সিট ইন ইয়োর চেয়ার য়্যাজ আর্মি চিফ।

শাফায়াত জামিলের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ আর তীব্র। আক্রোশের ভাষায় তার গলা আক্রমণাত্মক। রুমের ভেতরে তার কথা সবার মন চিরে চিরে যাচ্ছে। সবাই চুপ। থম্‌থমে ভাব। জিয়াউর রহমানের গলায় খসখসে আওয়াজ। শব্দ করে সিগারেট ধরাল। একটা দীর্ঘ টানে একমুখ ধুম্র উদগীরণ করে ঠাণ্ডা গলায় বলল, লুক শাফায়াত জামিল! ইট্‌ ইজ নট্‌ এ ম্যাটার অব্‌ সেন্টিমেন্ট—এটি এখন জাতীয় সমস্যা, ইফ্‌ য়্যু গো ট্যু ওয়াশ আউট আর্টিলারি এন্ড সেকেন্ড ফিল্ড ব্যাটালিয়ান ফ্রম ঢাকা সিটি দেন দেয়ার উইল্‌ বি কনফ্লিক্ট ইনসাইড দ্যা আর্মি—শুধু তাই নয় এটা একটা গৃহযুদ্ধে পরিণত হবে, এন্ড দ্যাট টাইম ইন্ডিয়ান আর্মি উইল কাম এন্ড উই ল্যুজ আওয়ার সভরেন্টি এন্ড ইনডিপেনডেন্টেস্‌।

জিয়ার বক্তব্যকে মীর শওকত আর আমজাদ হোসেন সমর্থন করে, ব্রিগেডিয়ার দস্তগীর নিশ্চুপ থাকে। কিছু দিনের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার দস্তগীর মেজর জেনারেল পদে প্রমোশন পান।

১২. বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর জিয়া পাকিস্তানের চেহারায় এবং ভাষায় কথা বলে উঠল স্বাধীনতাঃ সার্বভৌমত্ব ঃ ভারতীয় জুজু!

—এটা যে পরবর্তীকালে তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখলের কৌশলমাত্র অনেকেই তা বুঝতে পারেনি সেদিন।

জিয়ার পেছনে তখন পেন্টাগন দাঁড়িয়ে।

ব্লুপ্রিন্টের চিত্রিত ভাষা তার গলায়।

আপোষহীনতা। দুই দল মুখোমুখি। যুদ্ধের চেহারায়। প্রধান সেনাপতি জিয়ার গর্বিত আর অনমনীয় মুখের দিকে তাকাল। চশমা ছায়ার চোখ। ষড়যন্ত্র সেখানে স্পষ্ট খেলায় মত্ত।

কাপুরুষতার প্রতিমূর্তি হয়ে মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

জাতীয় সংকটে প্রধান সেনাপতির দায়িত্বহীনতা। আর জাতীয় কর্তব্য পালনহীনতার উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে ইতিহাসে তাঁর স্থান থাকবে।

১৩. সূচতুর জিয়াউর রহমান প্রধান সেনাপতির দায়িত্বে এল।
পেন্টাগণ মেপে মেপে টিপে টিপে সবখানে আটঘাট বাঁধলো—যেন কোনো ভুল না থাকে!

১৪. বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ১৬ই অক্টোবর পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থানরত, ন্যাটোর এয়ার ফোর্স স্কুলের ইনস্ট্রাক্টর পেন্টাগণের সি. আই. এর খাস বান্দা এম. জি. তোয়াবকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান করা হলো। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিমান বাহিনীর প্রধান এ.কে. খন্দকারকে বিদায় দেয়া হলো।

১৫. ২৪শে আগস্ট জেনারেল (অ.) এম. এ. জি. ওসমানী প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাকের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। তিনি হেলিকপ্টারে করে বিভিন্ন সেনানিবাসে মোশতাকের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। ২৪শে আগস্ট মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে সরিয়ে সেনাবাহিনীর প্রধানরূপে আবির্ভূত হন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। ঐ সময়ে মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে সি.জি. এস. পদে উন্নীত করা হয়। সি. ডি. এস. পদে বহাল রইলেন খালেদ মোশাররফ।

১৬. সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি হলেন জেনারেল এরশাদ। যদিও তিনি মিলিটারি একাডেমি হতে নয় বরং অফিসার ট্রেনিং স্কুল হতে পাস করেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যায় তবুও তার ভাগ্য হলো খুবই সুপ্রসন্ন। তিনি ১৯৭৩ সনে পাকিস্তান হতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭৫ সনে জুন মাসে তিনি ব্রিগেডিয়ার পদে প্রমোশন নিয়ে ভারতের দেরাদুনে স্টাফ ট্রেনিং–এ গমন করেন এবং আগস্ট মাসে রাতারাতি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন।

১৭. এ. বি এস. সফদর বঙ্গবন্ধু হত্যার পর পরই এন. এস. আই–এর ডিরেক্টর জেনারেল পদে প্রমোশন পেলেন।[৬]

১৮. বেসরকারি প্রশাসনেও গুরুত্বপূর্ণ পদে রাতারাতি রদবদল হয়। পাকিস্তানী আমলের সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য সচিব এবং ৭১–এর রাজাকার বাহিনীর সৃষ্টিকর্তা, রাও ফরমান আলীর অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি শফিউল আজমকে বানানো হলো ক্যাবিনেট সচিব।

মাহবুবুল আলম চাষী হলেন রাষ্ট্রপতির প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। তোবারক হোসেনকে বানানো হলো পররাষ্ট্র সচিব। বলাবাহুল্য, এই তিন জনই পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনীর বিশেষ সুনজরে ছিলেন যার উৎস ছিল পেন্টাগণ এবং সি. আই. এ।

কেরামত আলী হলেন সংস্থাপন সচিব। শুরু হলো চাকুরির ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিতভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের কোণঠাসা করার ব্যবস্থাদি।

১৯. ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের দক্ষ ব্যক্তি, পাক গোয়েন্দা বাহিনীর বিশ্বস্ত এজেন্ট এবং সি. আই. এ পুলিশ প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত আইয়ুব খানের ও ইয়াহিয়া খানের মন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক হলেন রাষ্ট্রপতির নতুন উপদেষ্টা।

২০. বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রূপে কলাবোরেটর জহির উদ্দিনকে পাঠান হলো ইসলামাবাদে।

২১. সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় এই যে, বঙ্গবন্ধু হত্যায় খবরটি বাংলাদেশের মানুষের জানার আগে আমেরিকা জানতে পেরেছিল। ১৫ই আগস্ট ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে ভয়েস অব আমেরিকা থেকে সর্ব প্রথম বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থানের খবর পরিবেশিত হয়। ঐ দিন ভোর ছটায় ঢাকায় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার অফিসে রয়টারের একটি ছোট খবর আসে যে বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। ওয়াশিংটন থেকে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রেরিত রয়টারের বার্তাটি টেলিপ্রিন্টার যোগে লন্ডন হয়ে ঢাকায় পৌছে। স্পষ্টতঃই ধারণা করা যায়, 'ভোয়া' এবং রয়টারের খবরের মূল উৎস ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। সি. আই. এ মুজিব হত্যার ব্যাপারে এত বেশি উদ্বিগ্ন ও জড়িত ছিল বলেই মুজিব হত্যার খবর অত তাড়াতাড়ি ওয়াশিংটনে পৌছে গিয়েছিল।

২২. ঢাকাস্থ মার্কিন কনস্যুল সূত্রে প্রকাশ, বঙ্গবন্ধুর হত্যার রাতে দূতাবাসের কতিপয় কর্মচারী বিনিদ্র ব্যস্ততার মধ্যে রাত কাটিয়েছে। সংবাদ প্রেরণে সমস্ত ব্যবস্থাদিই সর্বক্ষণ সতর্ক অবস্থায় ছিল।

সবচেয়ে মজার ঘটনা হলো এই যে, মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ঐ দিন রাতে এবং ভোরে এমবাসিতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিট বোস্টার বাংলাদেশের তৎকালীন অবস্থায় সামরিক শাসনের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন।

২৩. প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলেন লুকিয়ে থাকা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নেতাগণ। বেরিয়ে এলেন সবুর খান, মওলানা রহিম, আখতার ফারুকের দল।

মওলানা ভাসানীসহ চরম বামপন্থী পর্যন্ত সকলেই খন্দকার মোশতাক সরকারকে অভিনন্দন জানান।

করাচী হতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আল ফাত্তাহ্ পত্রিকার সম্পাদক মুজিব হত্যার পর পরই লিখলেনঃ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিবর্তন সি. আই. পরিকল্পিত এবং যা ১৯৬৯ সন থেকেই বাস্তবায়নের জন্য চলে আসছিল।[৭]

মুজিব হত্যার এক সপ্তাহের মধ্যেই ওয়াশিংটনে পোস্ট লিখল ঃ ঢাকা ক্যু প্রো-ওয়েস্ট।[৮]

দি নিউইয়র্ক টাইমস রিপোর্ট করল ঃ বাংলাদেশে সংঘটিত ক্যু সম্পর্কে ক্রেমলিন মনে করছে মুজিবের উৎখাতের ফলে সেখানে পশ্চিমা শক্তির প্রভাব বাড়বে।[৯]

২৪. কর্নেল তাহের তার জবানবন্দিতে বলেছেন ঃ দিন কয়েকের মধ্যেই বুঝতে পারলাম মুজিব হত্যার পেছনে রয়েছে পাক-মার্কিন ষড়যন্ত্র।[১০]

২৪.১ বঙ্গবন্ধু হত্যায় উল্লাসিত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে গোলাম আজম। তিনি জেদ্দায় বসে অনতিবিলম্বে এই নতুন সরকারকে স্বীকৃতিদানের জন্য মুসলিম দেশগুলোর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানায়।[১১]

২৪.২ খাজা খায়ের উদ্দিন আর মাহমুদ আলী বিবৃতিতে মোশতাক সরকারকে অভিনন্দন জানান। হামিদুল হক চৌধুরী মোশতাককে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র লেখেন। পাকিস্তান থেকে খাজা খায়ের উদ্দিন বলেন ঃ Let this be the begining ...

২৪.৩ ভুট্টো মুজিব হত্যায় দুঃখ প্রকাশ করলেন। পাশাপাশি সৌভ্রাতৃত্বের নিদর্শন স্বরূপ ৫০ হাজার টন চাল, এক কোটি গজ কাপড়, ৫০ লক্ষ গজ ভালো কাপড় মোশতাক সরকারকে উপঢৌকন পাঠান।

২৪.৪ সৌদি আরব ও সুদান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৬ই আগস্ট, চীন স্বীকৃতি দেয় ৩১শে আগস্ট।

২৫. ২২শে আগস্ট জনাব তাজউদ্দিনকে গ্রেফতার করে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

২৫.১ উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিমূঢ় হয়ে পড়েন। সরকারি ভবন থেকেই তিনি গ্রেফতার হয়ে যান।

২৫.২ প্রধানমন্ত্রী এম. মনসুর আলীর নির্দেশ কার্যকরী না হওয়ায় তিনি আত্মগোপন করেন। কিন্তু ওবায়দুর রহমান ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের আপাত আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে তাঁর সন্তানগণ মনসুর আলীর সঙ্গে উক্ত দুইজনের যোগাযোগ করিয়ে দেন। মোশতাকের মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রী না হওয়ায় তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ১৭ই আগস্ট প্রেরণ করা হয়।

২৫.৩ এইচ. এম. কামারুজ্জামান, কোরবান আলী, আবদুস সামাদ আজাদসহ ২০ জনকে গ্রেফতার করে ২৩শে আগস্ট কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

২৫.৪ ২৫শে আগস্ট তোফায়েল আহমদকে তার বাসা হতে গ্রেফতার করে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে নেয়া হয়। সেখানে গ্রেফতারকৃত অবস্থায় তিনি জিল্লুর রহমান ও আবদুর রাজ্জাকের সাক্ষাৎ পান।

২৬. জাতীয় সংসদের তদনীন্তন স্পিকার আবদুল মালেক উকিল ৩২তম আন্ত পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে ২২শে আগস্ট লন্ডনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

২৬.১ জনাব মহিউদ্দিন আহমদকে বিশেষ দূত হিসেবে মস্কোতে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পোদগর্নীর নিকট প্রেসিডেন্ট মোশতাকের একটি বার্তা পৌঁছিয়ে দেন। সোভিয়েত থেকে ফিরে এসে তিনি ৪ঠা নভেম্বর খন্দকার মোশতাকের বিরুদ্ধে প্রথম মৌন প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেন।

২৬.২ কয়েকজন এম. পি. মোশতাক সরকারের পক্ষে বিবৃতি দেয়।

২৭. খন্দকার মোশতাক ২৬শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না বলেন। ছাত্রলীগ, যুবলীগ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। সিরাজগঞ্জ থেকে নির্বাচিত এম.পি. সৈয়দ হায়দার আলী সাহেবের বাড়িতে আমি, মোস্তফিজুর রহমান পটল (৭ই নভেম্বর নিহত), মোজাফফর হোসেন, হাসান আলী তালুকদার, করিম বেপারী প্রমুখ বৈঠক করি এবং সিদ্ধান্ত নেই যে আসন্ন বৈঠকে এমপিরা যাতে উপস্থিত না হয় তার চেষ্টা করতে হবে। এমপি. ছাড়াও আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সেদিন কাজ করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা বিভাগের বজলুর রহমান ও টাঙ্গাইলের ফজলুল হক ভূঞা, সাহারা খাতুন, রওশন আরা মোস্তাফ্জির প্রমুখ।

২৭.২ ব্যাপক তৎপরতা চালানোর উদ্দেশ্যে বেগম সাজেদা চৌধুরী, শামসুদ্দিন মোল্লা, সিরাজুল হক, লুৎফর রহমান, আনোয়ার চৌধুরী, মফিজুল ইসলাম খান কামাল, ড. এস, এ, মালেক, কামরুজ্জামান মাস্টার, ডা. আবুল খায়ের, নূরুল আলম, রওশন আলী, এখলাস উদ্দিন আহমদ, কসিমুদ্দিন আহমদ, তফিজউদ্দিন আহমদ, দবির উদ্দিন, রাশেদ মোশরফ, সাইফুল ইসলাম, ডা. মেসবাহ উদ্দিন, আবদুর রশিদ (মাগুরা), সালাউদ্দিন ইউসুফ, সরদার আমজাদ হোসেন প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তারাও উৎসাহের সঙ্গে বঙ্গভবনে না যাবার পক্ষে মত দেন এবং সক্রিয়ভাবে কাজ করতে থাকেন।

২৭.৩ ছাত্র নেতৃবৃন্দ ইসমত কাদির গামা, রবিউল আলম চৌধুরী, মোমতাজ হোসেন, নূরুল ইসলাম, কাজী আকরম হোসেন, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম প্রমুখ বেশ তৎপর ছিলেন। তারা এমপিদের মোশতাকের বৈঠক বয়কট করার আবেদন জানান।

২৮. ১৬ই অক্টোবর সকাল ন'টায় তেজগাঁওস্থ এমপি হোস্টেলের নিচের তলায় এমপিরা সমবেত হন। সেখান থেকে বঙ্গভবনে যাবার কথা। সৈয়দ হায়দার আলীর বাসভবন থেকে টেলিফোনে আমরা যোগাযোগ রাখছিলাম।

বেলা দশটায় দেখা গেল প্রায় এক'শর বেশি এমপি. সেখানে উপস্থিত। অবস্থা বেগতিক দেখে আমরা তাড়াতাড়ি সেখানে উপস্থিত হয়ে বঙ্গভবনে না যাবার পক্ষে প্রকাশ্য লবিং শুরু করি। শুরু হলো চরম উত্তেজনা। অধ্যাপক ইউসুফ আলী ও সোহরাব হোসেন বঙ্গভবনে গিয়ে যা বলার তা বলার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া কথা দিয়েছিলেন তিনি বয়স্ক নেতা হিসেবে না যাবার পক্ষে জোর বক্তব্য রাখবেন। তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যার বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে উপসংহার টানলেন যার অর্থ হলো, গিয়েই দেখি না কি হয়? জেলখানার নেতৃবৃন্দের বরাত দিয়ে সংবাদ পেয়েছিলাম মোশতাকের মিটিং যেন সফল না হয়। অধ্যাপক ইউসুফ আলী, সোহরাব হোসেন ও রফিকুদ্দিন ভূঁইয়ার দ্বৈত ও দালালী ভূমিকার কারণে ও কতিপয় এমপির আগ্রহে এমপি গণ বঙ্গভবনে গমন করেন। যাবার আগে বঙ্গভবনে খুনীরা অস্ত্রসহ উপস্থিত থাকাতে সংসদ সদস্যগণ আপত্তি উঠায়। পরবর্তীতে তাদের সভাস্থল হতে সরিয়ে নেয়া হয়।

২৮.১ সিরাজুল হক সাহেবের সঙ্গে আমাদের কথা হয় যে, তিনি সদস্যদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখবেন এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিষয়টি উপস্থাপন করবেন। প্রেসিডেন্ট মোশতাককে 'মোশতাক ভাই' সম্বোধন করে, আমার আজো যতদূর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, "আমি আপনাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে সম্বোধন করতে পারি না। কোন্ আইনের বলে আপনি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন তাও জানিনে। যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে তাদের সাথে আপনি বঙ্গভবনে আশ্রয় নিয়েছেন এবং আমাদেরকে বলেছেন রাষ্ট্রপতি হিসেবে মেনে নিতে। আপনি যদি সত্যিই রাষ্ট্রপতি থাকতে চান, "তাহলে বঙ্গবন্ধুকে কেন হত্যা করা হয়েছে তা আমাদের জানাতে হবে। আইনানুযায়ী আপনাকে বৈধ রাষ্ট্রপতি বলা যায় না।" তিনি ইংরেজিতে বক্তৃতা করেন। সংসদ সদস্যদের নিকট থেকে মোশতাক বিরাট রকমের বাধার সম্মুখীন হয়।

২৮.২ অত্যন্ত বেদনার সংগে হলেও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চিফ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও হুইপ আবদুর রউফের আচরণ আমাদের নিকট বাড়াবাড়িরূপে প্রতীয়মান ছিল। শাহ মোয়াজ্জেম ও আবদুর রউফ মিটিং—এর বিরোধিতা করাতে আমাদের হুমকি প্রদান করে। আমার

আজো তা মনে আছে। অন্য হুইপ মোঃ হানিফ আমাদের পক্ষে নীরবে কাজ করেছিলেন।

২৯. সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক মোশতাকের এই বৈঠক ব্যর্থ হবার পর সেনাবাহিনীদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হয় মারাত্মক। শুরু হয়ে যায় ব্যাপক সেনা-ষড়যন্ত্র। ২রা নভেম্বর ক্যু, ৭ই নভেম্বর পাল্টা ক্যু! মাঝখানে জেল হত্যাকাণ্ড। নির্মম। নৃশংস। বর্বোরোচিত। স্বাধীনতার সংগ্রামে চার জাতীয় নেতা সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এম. মুনসুর আলী ও এ. এইচ. এম. কামরুজ্জান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিহত হন।

সেই থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও স্বাধীনতা বৈরী শক্তি বাংলাদেশকে কব্জা করে রেখেছে...

সে এক ভিন্ন কথা।

অন্য অধ্যায় ..

আরেক ইতিহাস...।

# দশম অধ্যায়

## প্রসঙ্গত : আরো কিছু তথ্য

১. ফারুকের পুরো নাম দেওয়ান এশায়েত উল্লাহ সৈয়দ ফারুক রহমান। ১৯৭০ সনের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন হিসেবে সুলতানের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য আবুধাবীতে গমন করে।

১.১ মুক্তিযুদ্ধ সময়কালীন মুজিবনগর প্রবাসী সরকারের সংস্থাপন বিভাগের সচিব জনাব নূরুল কাদের খান—ফারুকের চাচা, তাঁর চিঠি পেয়ে ফারুক ১৯৭১ সনের ১২ই নভেম্বর আবুধাবী থেকে লন্ডনের পথে যাত্রা করে।

১.২ ফারুক মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যোগদানের পূর্বে দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। সে জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণের হেতু অন্যান্য অফিসারগণ যে প্রমোশনে উন্নীত হন—তা তার ভাগ্যে স্বাভাবিকভাবে জোটেনি।

২. খন্দকার আবদুর রশিদ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কাশ্মীরের নিকটে হাজিরায় ক্যাপ্টেন হিসেবে কর্মরত ছিল। ১৯৭১ সনের ২৯শে অক্টোবর সে সীমান্ত পাড়ি দেয়। মুক্তিযুদ্ধের শেষলগ্নে সে জিয়াউর রহমানের 'জেড্' ফোর্সের একজন অফিসার হিসেবে যোগদান করে।

২.১ ১৯৭৪ সনের প্রথমার্ধে খন্দকার আবদুর রশিদ ১৪ মাসের প্রশিক্ষণের জন্য বোম্বের দিয়োলালীতে গানারি স্টাফ কোর্সে (gunnery staff course) যোগদানের জন্য ভারতে গমন করে। ১৯৭৫ সনের মধ্য মার্চে কোর্স সমাপ্তি করে সে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে।

২.২ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর স্বাভাবিকভাবেই রশিদের পোস্টিং ছিল যশোহরের গানারি স্কুলে। সেখানে রশিদের যোগদান ছিল পূর্ব নির্ধারিত ও অবধারিত, কিন্তু রশিদ সেখানে যোগদান না করে এক মাসের ছুটি গ্রহণ করে।

২.৩ যশোহরে তার নির্ধারিত পদে যোগদানের অর্থ হলো আর্টিলারি বাহিনীর কমান্ড হতে তার দূরে সরে যাওয়া।

২.৪ ১৯৭৫ সনের এপ্রিল মাসে সে সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারির কমান্ডিং পোস্ট দখল করে।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, রশিদের নির্ধারিত কর্মস্থল যশোহরের 'গানারি স্কুলে' যোগদান ছিল যেখানে অবশ্যম্ভাবী সেখানে কি করে, কাদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় সেনাবাহিনীর বিধি-নিয়ম ভঙ্গ করে তাকে ঢাকায় রাখা হলো? সে সময় রশিদের পূর্বতন বদলীর অর্ডার কে এবং কেন বাতিল করেছিলেন তা জানা প্রয়োজন।

[এ প্রসঙ্গে ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াৎ জামিলের সাক্ষাৎকার উৎসাহী পাঠকের জন্য পরিশিষ্টে সংযোজন করা হলো।]

২.৫ রশিদ ১৯৭৫ সনের ২রা আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় মোশাররফ হোসেন মুসু নামে মোশতাকের এক বন্ধুকে নিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করার বিষয়টি মোশতাককে জ্ঞাত করানো হয় এবং মোশতাক তাতে সম্মতি প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে এন্থনী মাস্‌কারেনহাস লিখেছেন, "He (Rashid) was well aware of Moshtaque from Dosphara, Rashid from Chandina, Rashid's uncle, Musharaf Hossain (Mushu) had also befriended Mushitaque while he was escaping to India in 1971 and they had been colse friends since then. Rashid asked "Mushu" to arrange an appointment for him with Khandaker Moshtaque Ahmed in Dhaka. This was easily done.

Dressed in civvies to avoid attention Rashid accordingly turned up at Mostaque's house in Aga Mashi Lane in the old quarter of Dhaka at 7 pm. on 2nd August. He took the precaution of carring with him an application for a permit to buy a scooter just in case he was noticed and someone wanted to know why an army officer was calling on a politician. Rashid was welcomed by Moshtaque in an upstairs room and after the normal courtesies, Rashid streered the conversation to the political situation. They spoke for almost two hours.

**Rashid recalls :** We discussed political matters for some time as I was indirectly finding out how he felt. Then I asked him, being closet to Sheikh Mujib and one of the seniormost. Awami League members, how did he feel? I asked him can the nation expect progress under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman?" He said, No they cannot. "Then I said", "If that is the case why don't you leave?" He Said That is also not so

easy?" It showed that they (the ministers) are quit afraid of taking such a decision though they know what he is doing. They are such cowards that they have accepted all his bad doings. Rashid convineced: "Then I asked, 'Will there be any justification at this stage if somebody take a decision to remove Sheikh by force? He said, Well, probably for the country's interest it is a good thing. But it is also very difficult to do it."

I asked Rashid to squeeze his mind and confirm if that was exactly what Mostaque said.

He answered : Yes He said, it was very difficult to do but in the country's interest if somebody could do it probably it would be a great thing.

**Question :** 'So he agreed?'

Rashid : "Yes, yes he agreed. Then Mostaque even asked me that if somebody removed him (Sheikh Mujib) who could be next? The altarnative should be there."

Rashid said his own reply was non committal. He explained to Khandaker Moshtaque that if anyone did think in terms of removing Sheikh Mujib he would also definitly think of a suitable replacement, particularly someone who could balance out the political side."

* * *

Rashid was satisfied that in Khandaker Moshtaque Ahmed he had found a willing replacement for Sheikh Mujib.

The revelations made by Rashid and Farooq concerning Khandaker Moshtaque's prior knowledge of there plans to kill Sheikh Mujibur Rahman were made under other in a series of separate tape recorded interviews, I had with them.'[১]

২.৬ রশিদ, মেজর (অবঃ) ডালিম এবং ডালিমের সঙ্গে অন্যান্য যে ২২ জন সামরিক অফিসার তাদের কার্যক্রমের কারণে বরখাস্ত হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রথমে মেজর (অবঃ) ডালিমের সঙ্গে এবং ডালিমের মাধ্যমে মেজর (অবঃ) নূর, মেজর (অবঃ) শাহরিয়ার এবং মেজর হুদার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

২.৭ শুধু তাই নয়, সামরিক বাহিনীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশকে নিয়ে রশিদ–ফারুক যে কুদেতা পরিকল্পনা করেছিল তাকে ব্যাপকতা দান করার জন্য

রশিদ ইনফেন্ট্রি গ্রুপের একাংশকে জড়ানোর চেষ্টা করেছিল। জয়দেবপুরে অবস্থিত ষোড়শ বেঙ্গল ইনফেন্ট্রির একটি দলের কার্যকরী কমান্ডিং অফিসার তখন মেজর শাহজাহান। পূর্ব নির্ধারিত আলোচনা থাকলেও ১৫ই আগস্ট রাতে মেজর শাহজাহান রশিদের অনুরোধে রাত দশটায় নতুন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উপস্থিত হতে সে অপারগতা প্রকাশ করে।[২]

২.৮ বেঙ্গল ইনফেন্ট্রিকে কুদেতার সঙ্গে জড়ানোর পাশাপাশি বিমান বাহিনীর স্কোয়ার্ডন লিডার লিয়াকতের সঙ্গে রশিদ যোগাযোগ স্থাপন করে। কিন্তু কুদেতার রাতে রশিদ স্কোয়ার্ডন লিডার লিয়াকতের বাড়ি গিয়ে তাকে মিগসহ প্রস্তুত হতে বলে। কিন্তু লিয়াকত কিছু করতে অস্বীকার করে এবং বলে যে বিমান বাহিনীর প্রধানের নির্দেশ ব্যতীত তার কিছু করার নেই।[৩]

৩. ফারুক আর্মি হেড কোয়ার্টার্সের GI-OPS-এর কর্ণেল আমিন আহম্মদ, ৪৬তম ঢাকা ব্রিগেডের ব্রিগেড–মেজর, মেজর হাফিজ, আর্টিলারির মেজর সেলিম, মেজর নাসির, মেজর গাফ্ফার-এর সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনা করে। তাদের সঙ্গে একত্রে বা একাকী আলোচনায় ফারুক বুঝতে পারে যে, তাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রয়েছে অথচ ফারুকের হাতে সময় ছিল না।[৪]

৩.১ ১৯৭২ সনে ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সার গঠিত হয়। ল্যান্সার বাহিনীর সেকেন্ড ইন্ কমান্ড হিসেবে ফারুক এই বাহিনীর মধ্য হতে কিছু সংখ্যক সদস্যকে নিয়ে কমান্ডো স্টাইলে প্রশিক্ষণ শুরু করে। সে এই গ্রুপের নাম দেয় 'হান্টার' কিলার টিম'। তাদের সংখ্যা ছিল ১৫০ জন, তারা ছিল ফারুকের প্রতি একান্ত অনুগত। তারা ফারুকের নির্দেশে যে কোনো কাজ সম্পাদনে পারঙ্গম ছিল।[৫]

৩.২ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী বলে কথিত নায়েক সুবেদার মোসলেম এই গ্রুপেরই অন্যতম সদস্য ছিল।

৪. ফারুক–রশীদ বহুবার শপথপূর্বক বলেছে যে, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিষয়টি মোশতাককে জুলাই মাসে জানানো হয়েছিল। ১৯৭৫ সনের ২রা আগস্ট অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু হত্যার ১৩ দিন পূর্বে মোশতাক কুদেতার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হবে তা জানতে পারে। এই ১৩ দিন মোশতাক কি করেছিল?

৪.১ এ ধরনের কাজে ১৩ দিন একটি দীর্ঘ সময়। এই সময়ের মধ্যে মোশতাক তার সহযোগী ও বিশেষকরে তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করে। এ রকম একটি দুঃসাহসিক ঘটনা সংঘটিত

হলে করণীয় কার্যাদি সম্পর্কে তারা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এমনও প্রমাণ রয়েছে যে তাদের গ্রুপের কেউ একজন মেজরকে এই প্লট সম্পর্কে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসকে অবগত করে।[৬]

৪.২ পূর্বেই বলা হয়েছে, সি. আই. এ নেট ওয়ার্কের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিল মাহবুব আলম চাষী। তার দ্বারাই মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছিল বলে প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ মনে করেন।

৪.৩ লরেন্স লিফশুলজ লিখেছেন, ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের উচ্চপদস্থ অফিসার ও বাংলাদেশের ওয়াকিফহাল মহলের সূত্র অনুয়ায়ী প্রতীয়মান হয় যে, মুজিব হত্যার বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্বেজ্ঞাত ছিল এবং এ ঘটনা ঘটার ছয় মাস পূর্বেই ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে তাদের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।[৭]

৪.৪ মার্কিন দূতাবাসের উচ্চ পদস্থ কূটনৈতিক সূত্রে প্রকাশ বঙ্গবন্ধুকে উৎখাত করার অভিলাষী ব্যক্তিবর্গ মার্কিন দূতাবাসের অফিসিয়ালদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। দূতাবাস সূত্রে প্রকাশ, ১৯৭৪ সনের নভেম্বর হতে ১৯৭৫ সনের জানুয়ারির মধ্যে ক্যুদেতার মাধ্যমে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব কি হবে তা নির্ধারণের জন্য ১৯৭৪ সনের নভেম্বর মাস হতে ১৯৭৫ সনের জানুয়ারির মধ্যে দূতাবাসে বহু মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।[৮]

৪.৫ লরেন্স লিফশুলজ বলেছেন, দূতাবাসের এই প্রকাশ্য মিটিং বন্ধ হয়ে গেলেও ঢাকাস্থ সি. আই-এর স্টেশন চিফ ফিলিপ চেরি তার চ্যানেল ওপেন রাখেন।[৯]

৫. ফারুক বলেছে, তার লোকেরা যখন হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল তখন মহানগরীর রাজপথে বহুসংখ্যক মার্কিন দূতাবাসের গাড়ির 'গুঞ্জরণ' ও আনাগোনায় সে অবাক হয়ে যায়।[১০]

৫.১ রশিদ-ফারুক বলেছে, তারা কোনোভাবেই মার্কিন দূতাবাসে কাউকে বিষয়টি জানায়নি এবং তাদের যোগাযোগও ছিল না।[১১]

৬. তাহেরউদ্দিন ঠাকুর বিদেশী পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছে, ঘটনা ঘটার দুইদিন আগে হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি তার বাসায় চূড়ান্ত করা হয়। এ প্রসঙ্গে ফারুক-রশিদ বলেছে, তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের বাসায় যে মিটিং হয় সেখানে উপস্থিত ছিল না। এবং তাহের উদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে তাদের পূর্বে যোগাযোগও ছিল না।[১২]

৬.১ আরেকটি ঘটনা হলো রশিদ কর্তৃক মোশতাককে রেডিও স্টেশনে নিয়ে আসার পূর্বেই তাহেরউদ্দিন ঠাকুর রেডিও স্টেশনে উপস্থিত ছিল।

মোশতাকের ভাষণ– যা তাহেরউদ্দিন ঠাকুর কর্তৃক লিখিত হয়েছিল তা নিশ্চয় পূর্ব–চিন্তিত বলে এন্থনী মাসকারেনহাস মনে করছেন।[১৩]

৭. গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার প্রধান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীরা রাখ ঢাক করে কথা বলেননি, প্রকাশ্যই ঘোষণা দিয়েছে, 'আমরাই তাকে হত্যা করেছি।'হত্যাকাণ্ডের দায়দায়িত্বের পুরোটাই তারা স্বীকারও করেছে।[১৪]

৭.১ তবু লক্ষণীয়, খন্দকার মোশতাক তাদের বলেছে সূর্য–সন্তান। এই সূর্য সন্তানগণ বহু ইন্টারভিউয়ে বলেছে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও ক্ষমতা দখলের প্ল্যানটি খন্দকার মোশতাক ১৫ই আগস্টে ১৯৭৫ সনের পূর্বেই অবগত। অথচ মোশতাক আজ সাফাই গাইছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি নাকি তিনি পূর্বাহ্নে জানতেন না।[১৫]

৭.২ অথচ মোশতাক প্রেসিডেন্ট হয়ে সূর্য সন্তানদের বিচার করা যাবে না বলে এক বিশেষ অধ্যাদেশ জারী করে। শুধু তাই নয়, এই খুনী চক্রকে নিরাপদে বিদেশে যাবার যাবতীয় ব্যবস্থা করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বোস্টার, কাইসার এবং মোশতাক।

৭.৩ প্রেসিডেন্ট জিয়া বিদেশে অবস্থানরত এই চক্রের ১২ জনকে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশে দূতাবাসে চাকুরী দেন ফরেন মিনিস্ট্রির ডেপুটেশনে এবং ১৯৮০ সালে তাদেরকে বিসি এস ফরেন সার্ভিস ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৮. ফারুক ও রশিদ চাকুরী না নিয়ে লিবিয়ায় অবস্থান করতে থাকে। ত্রিপোলীতে দুই জনে ব্যবসায় নেমে পড়ে। ব্যবসায় ছদ্ম আবরণে একটি ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করে এবং গাদ্দাফীর বিপ্লবী ইসলামিক সমাজতন্ত্র কায়েমে কার্যকর প্রয়াস চালাতে থাকে। শোনা যায়, এই ক্যাম্প থেকে ট্রেনিং পাওয়া বাংলাদেশীর সংখ্যা প্রায় শ' খানেক যারা এখন বাংলাদেশে তৎপর।[১৬]

৯. কর্নেল রশীদের ব্যবসায়িক পার্টনার জ্যাক উইলিস—(যিনি ইন্টারন্যাশন্যাল কনসোসিয়েটস ইনকর্পোরেটেড– এর প্রেসিডেন্ট, যার সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়ায়) এবং অন্য একজন মার্কিন নাগরিক টমাস গ্যারিটি উভয়ে মেসিন গান, রাইফেল, গ্রেনেড প্লাস্টিক বোমা রশিদ– ফারুকের জন্য জোগাড়ের প্রয়াস চালায়। এগুলো নিয়ে আই ডি বি কোস্টার ১৯৮৩ সনের ২৪শে এপ্রিল ব্রিটেন থেকে যাত্রা করে। তুরস্ক ও গ্রিসের মাঝামাঝি জায়গা থেকে ৫৪ কেস মেশিন গান, গ্রেনেড ও গোলাবারুদ পিরেউস বন্দরে গ্রিক কর্তৃপক্ষ আটক করে।[১৭]

৯.১ ১৯৮৫ সনের ১৭ই মে, পুনরায়, পানমার রেজিস্ট্রিকৃত অন্য একটি

জাহাজ ইটালি কর্তৃপক্ষ আটক করে। তল্লাসী করে পাওয়া যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি ২৭টি ৭.৬৫ মিলিমিটার মেশিন গান রাইফেল, ২৮৯৫টি ১০৫ মিলিমিটার কামানের গোলা, ১২৩৮ টি ১০৫ মিলিমিটার কামানের শেল চার্জ ও ১০৬ রিকেয়েলেস কামানের ৫০০টি গোলা।

৯.২ ঐ অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে জাহাজে দুই জন বাঙালিকে পাওয়া যায়। তাদের নাম মোহাম্মদ হায়দার আলী জমাদার ও এ. বি. কে. হামিদ। এ. বি. কে. হামিদ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের একজন সুপরিচিত কর্মী। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে ইসলামিক মৌলবাদী ভাবধারার সঙ্গে একীভূত করার ক্ষেত্রে মেজর জলিলের অনুসারী বলে কথিত।

১০. জিয়াউর রহমান কর্নেল তাহেরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। এক সাথে তিনি মোশতাক ক্যাম্পের সঙ্গেও সংযোগ রাখতেন মাহবুব আলম চাষীর মাধ্যমে।[১৮] শুধু তাই নয়, জিয়াউর রহমানের এ. ডি. সি ক্যাপ্টেন জিল্লুর ও ক্যাপ্টেন মোখলেসের দ্বারা তোফায়েল আহমদের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ রাখতেন।[১৯]

১০.১ 'রংপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর অপারেশন শিরোনামে সি. আই-এর ডকুমেন্ট ঃ (রিপোর্ট নং ৩১১/০৮৪১২-৭১ তাং ৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১), এখানে মেজর তাহের তদানীন্তন ব্রিগেডিয়ার জিয়ার ডেপুটি হিসেবে ময়মনসিংহ এলাকার সাব সেক্টর কমান্ডার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। সেই থেকে তাদের নিবিড় যোগাযোগ। জিয়া তাহেরকে সেই সময় থেকেই ব্যবহার করতে থাকে।[২০]

১০.২ সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু হত্যা পরিকল্পনার বিষয় ৫ মাস পূর্বেই জেনেছিলেন। হত্যাকারীদের অন্যতম মেজর ফারুক এ কথা তাকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু জিয়া কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। অথবা চলতি চক্রান্তের আসন্ন পরিকল্পনা রাষ্ট্রপতিকে জানাননি। যদিও সেনাবাহিনীর চাকুরির শর্তে এই ধরনের পরিকল্পনার বিষয় অবগত থাকা সত্ত্বেও তা না জানানো গুরুতর অপরাধ। এন্থনী ম্যাসকারেনহাস বলেছেন :

১০.৩ আমিই ফারুক ও রশীদের সাক্ষাৎকার নেই। এ সময়েই ফারুক আমাকে বলে সে জেনারেল জিয়াকে ১৯৭৫ সালের ২০শে মার্চ জানিয়েছিলেন তারা সরকার পরিবর্তন করতে চায়। জেনারেল জিয়া তাদের বলেন "দুঃখিত আমি জংগী কিছু করতে পারবো না। তোমরা ইয়ং অফিসার যা খুশী করো গিয়ে।"

"কোরান ছুঁয়ে ফারুক আমাকে এ কথা বলেছে। জুলাই মাসে ঢাকা এসে আমি জেনারেল জিয়াকে এ কথা ঠিক কিনা জিজ্ঞেস করি। তিনি

বলেছিলেন, ভেবে দেখবেন আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন কিনা।"[২১]

১১. "শেখ সাহেবের হত্যার সঙ্গে তাঁর (কর্নেল তাহের) জড়িত থাকার বিষয়টি বহুল আলোচিত। এই হত্যা ষড়যন্ত্রের কিছু আভাসতো শেখ সাহেবের জীবদ্দশাতেই পাওয়া গিয়েছিল। ঐ গ্রুপে কারা জড়িত থাকার সম্ভাবনা ছিল সেটা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর জেনারেল ওসমানী তাদের ছাপান্ন জনকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ সাহেব তাদের অনুমোদন দিলেন না। বরং তাদের বিভিন্ন জায়গায় উচ্চতর ধাপে বহাল করলেন। কর্নেল তাহেরকে তিনি আরো কাছাকাছি নিয়ে এলেন। অপরপক্ষে যে ভদ্রলোক ঐ হত্যা ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়েছিলেন উল্টা সেই ভদ্রলোককেই চাকুরীচ্যুত করা হয়েছিল।

তাঁর পরিচয়?

তিনি মেজর (অব.) মুজিব। বরিশালের অধিবাসী।

তাঁকে চাকুরী থেকেও শেষ করে দেয়া হল?

হ্যাঁ, তবে এটা শেখ সাহেব করেননি এ কাজ করেছেন সেনাবাহিনীর অফিসাররা।

মেজর মুজিব ঐ চাকুরীচ্যুতির বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। আমি শেখ সাহেবকে বললাম : মেজর মুজিবকে সেনাবাহিনী থেকে অপসারণ করে সেনাবাহিনীর লোককে এ জাতীয় ষড়যন্ত্রের জন্য পরোক্ষভাবে উৎসাহ দানই করা হলো। তাঁকেও তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে। তাঁকে বেসামরিক বিভাগে একটি চাকুরী দিন।

তখন তিনি কি জবাব দিলেন?

কাইয়ুম ভাই, আমি কি করব। তোফায়েলকে বলুন।'[২২]

১২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধানে বারবার রক্ষীবাহিনীর প্রসঙ্গটি এসে যায়। কারণ দেশে-বিদেশে অপপ্রচার চলেছিল রক্ষীবাহিনী হলো মুজিবের প্রাইভেট বাহিনী। বঙ্গবন্ধুর হত্যা প্রাক্কালে রক্ষীবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে বিতর্ক বিদ্যমান। আর রক্ষীবাহিনীকে কেন্দ্র করে তোফায়েল আহমদের ভূমিকাও পরিষ্কার নয়। যেমন জনৈক প্রাক্তন মন্ত্রী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "তোফায়েল ওয়াজ নট দি এডমিনিস্ট্রেটিভ হেড অফ রক্ষীবাহিনী এটা ঠিক। সে এডভাইজার ছিল। তিনি রক্ষীবাহিনী অফিসে নিজে গিয়েছিলেন, না তাকে অন্য কেউ নিয়ে গিয়েছিল তা আমার মনে নেই। তবে তার সাথে এই প্রসঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেন তখন এ ধরনের সিদ্ধান্ত তো জাতির জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারতো। আমি একা এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা ডিসিশন নিতে পারি না। তাই নেইনি।"[২৩]

১৩. বঙ্গবন্ধু আসন্ন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আঁচ করতে পেরেছিলেন। তিন ৩২ নং বাসাটাকে যাদুঘর করার কথা চিন্তা করেছিলেন, একই সাথে তিনি শেখ মুজিবের জন্য বনানীর একটি বাড়িতে থাকার ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। তিনি নিজেও বঙ্গভবনে থাকার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তার নিরাপত্তার ব্যাপারে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন।[২৪]

১৪. "একদিন রাত দশটার সময় আমরা গণভবন থেকে বেরিয়ে আসছি। হঠাৎ তাহের উদ্দিন ঠাকুর শেখ সাহেবের গাড়িতে উঠলেন। তারপর শেখ সাহেব অট্টহাসি দিলেন। মোশতাক ভাই ছিলেন, তোফায়েলও ছিল যদ্দূর মনে পড়ে। আমি মোশতাক ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম তাহের ঠাকুরকে বঙ্গবন্ধু গাড়িতে নিলেন কেন? গাড়িতে উঠিয়ে আবার অট্টহাসিই বা কেন দিলেন? মোশতাক ভাই বললেন, আমি কেমন করে বলব। মনে হচ্ছে তাহের ঠাকুরকে মন্ত্রীপদ থেকে ড্রপ করবে। ... শেখ সাহেব খুব ভোরে উঠতেন। আমি গেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে নাশতা করলেন। তার পর গণভবনে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলাম, কালতো গাড়িতে তাহের ঠাকুরকে সঙ্গে নিলেন মোশতাক ভাই বললেন, তাকে নাকি আপনি ড্রপ করবেন। এ কথায় রাগের কি হলো বুঝলাম না। উনি বললেন, সবগুলাকে দেখে নেবো। একটাকেও ছাড়ব না।[২৫]

১৫. বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের রাতে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যখন প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছিল তখন আশে পাশের বাড়ির লোক জেগে যায়। তদানীন্তন বাকশাল প্রেসিডিয়ামের সদস্য জনাব মহিউদ্দিন আহমদের বাড়ি বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে একটু দূরে। প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি অনুমান করলেন বঙ্গবন্ধুর বাড়ির আশে আশে গোলাগুলি চলছে। বঙ্গবন্ধুকে টেলিফোন করলেন। টেলিফোন এনগেজড। তিনি তাড়াতাড়ি সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী সাহেবের বাসায় টেলিফোন করেন, কিন্তু সেখানেও কেউ টেলিফোন ধরেনি। অতঃপর তিনি খন্দকার মোশতাককে টেলিফোন করলেন। খন্দকার মোশতাক টেলিফোন ধরলে জনাব মহিউদ্দিন বললেন, মোশতাক এদিকে খুবই গোলাগুলি হচ্ছে। মোশতাক জিজ্ঞেস করল– কোথায় গোলাগুলি হচ্ছে? মহিউদ্দিন আহমদ বললেন ঃ বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে। মোশতাক খট করে টেলিফোন রেখে দিল। বলাবাহুল্য, মোশতাকের রাত ২ টায় ঘুমানো ও সকাল ১০টায় ওঠার অভ্যাস। সেদিন ভোর ৫টায় জেগেছিল কেন?'[২৬]

১৬. ১৯৭৫ সনের ৪ঠা নভেম্বর। সন্ধ্যার সময় বঙ্গভবনে এল। মোশতাক এবং তার মন্ত্রী পরিষদ। কর্নেল শাফায়াত জামিল এলেন তার গ্রুপ নিয়ে। সশস্ত্র। মোশতাককে ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত

করলেন। ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যোগ থাকার জন্য অভিযুক্ত করলেন জেনারেল ওসমানী, মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে। বললেন তাদের ইউ অলসো পার্টি টু দেম। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর হত্যার সঙ্গে আপনারা জড়িত।[২৭]

১৭. প্রশ্ন জাগে, ঐ দিন মন্ত্রী পরিষদের অন্যান্য সদস্য বাদে শুধুমাত্র তাহের উদ্দিন ঠাকুর, কে. এম. ওবায়দুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, নূরুল ইসলাম মঞ্জুরকে কেন গ্রেফতার করে রাখা হয়েছিল? কেনই বা মন্ত্রীপরিষদের বাইরে ইত্তেফাকের অন্যতম মালিক মইনুল হোসেনকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল?

১৮. ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট। সকাল হতে আবছা মেঘের আঁধারে একটি গাড়ি বিশ্ববিদ্যালয় ঢুকলো। পূর্ব দিক থেকে, পশ্চিমে গেল, বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরল। তারপর চলে গেল। ওদিকে তখন শেখ মুজিবের বাড়িতে গোলাগুলি চলছে। গাড়িটির বিবরণ ও প্লেট নম্বর প্রফেসর সরদার ফজলুল করিম দেখলেন, গাড়িটি মার্কিন দূতাবাসের। অত সকালে গাড়িটি কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিল?[২৮]

# একাদশ অধ্যায়

## চক্রান্তের আবর্তে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়

১২ জুন। ১৯৯৬
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন। নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশসহ সকল কালাকানুন বাতিলের মাধ্যমে অইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অবাদ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায়ে আওয়ামী লীগ বিজয় অর্জন করে এবং ২৩ জুন সরকার গঠন বিশেষ কমিটিতে প্রেরণের জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু The Indemnity Ordinance ১৯৭৫-এর রহিতকল্পে আনীত বিল ১০ই নভেম্বর '৯৬ সনে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেন। বিলে বলা হয়, "এই আইন বলবৎ হবার পূর্বে যে কোনো সময় উক্ত Ordinance-এর অধীন কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোনো সার্টিফিকেট বা আদেশ-নির্দেশ অথবা অর্জিত কোনো অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা, অথবা সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষের জন্য সৃষ্ট কোনো দায়-দায়িত্ব, যদি থাকে, এর ক্ষেত্রে General Clauses Act. ১৮৯৭ (X of 1897)-এর Section 6-এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না এবং উক্তরূপ কৃতকার্য গৃহীত ব্যবস্থা, প্রদত্ত সার্টিফিকেট বা আদেশ-নির্দেশ বা অর্জিত অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা বা সৃষ্ট দায়-দায়িত্ব উপ-ধারা (১) দ্বারা Ordinance রহিতকরণের সঙ্গে সঙ্গে অকার্যকর ও বাতিল হয়ে যাবে।" উদ্দেশ্য ও কারণ-সংবলিত বিবৃতিতে বলা হয়-"১৯৭৫ সালের ইনডেমনিটি অধ্যাদেশটি মৌলিক মানবাধিকার এবং সংবিধানে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকার ও আইনের শাসনের পরিপন্থী। আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার সংরক্ষণ তথা দেশে আইনের শাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত অধ্যাদেশটি ব্যতিল সংরক্ষণ তথা দেশে আইনের শাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত অধ্যাদেশটি বাতিল করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বিধায় অত্র বিল অনীত হইয়াছে।"[১]

এই বিলটির ব্যাপারে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি ছয় সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। সাবেক

প্রধান বিচারপতি ড: এফ. কে. এম. এ মুনীম-এর নেতৃত্বে গঠিত একটি স্থায়ী আইন কমিশনে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের ব্যাপারে মতামত প্রদানর জন্য প্রেরণ করা হয়। বিচারপতি আমিন-উর-রহমান খান ও বিচারপতি নাইম উদ্দিন আহমেদও কমিশনে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা ১৭ অক্টোবর '৯৬ তারিখে নিম্নরূপ মতামত প্রদান করেছেন--- "The Law Commission has examined the Indemanity Ordinance, 1975, with reference to paragraph 18 of the 4th schedule to the constitution inserted by S.2 of the Con ution (Fifth Amendment) Act. 1979 and Article 142 of the Constitution.

The Commission is of opinion that the Indemnity Ordinance, 1975, can be repealed by an Act of Parliament passed by a simple majority under Article 80 the Constitution or by promulgation an Ordinance under Aticle 93 of the Constitution and for repealing the indemenity Ordinance, 1975, the procedure laid down in Article 142 for amendment of the constitution need not be followed."

১০ নভেম্বর ১৯৯৬ ইং তারিখে জাতীয় সংসদ ইনডেমনিটি বাতিল বিল উত্থাপিত হয়। উত্থাপনের সময় বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্যগণ অনুপস্থিত ছিল। সংসদে সর্বসম্মতভাবে বিলটি জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। বিশেষ কমিটির সভাপতি এডভোকেট রহমত আলী (আওয়ামী লীগ) বিলটি উত্থাপন করেন। কমিটির সদস্যরা হলেন, কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, কর্নেল অব. শওকত আলী, ড. মিজানুল হক ও শেখ ফজলুল করিম সেলিম। বিরোধী দলীয় সদস্যরা হলেন, খন্দকার দেলোয়ার হোসেন (বিএনপি), ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার (বিএনপি), এডভোকেট ফজলে রাব্বী (জাতীয় পার্টি), তাজুল ইসলাম। উল্লেখ্য যে বিএনপি এই কুখ্যাত অধ্যাদেশ যাচাই বাচাই করার জন্য বিশেষ কমিটির সদস্য হয়েও কমিটির সভাতে ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত ছিল।

১২ নভেম্বর, ১৯৯৬। সুদীর্ঘ ২১ বছর ১ মাস ১৬ দিনের মাথায় জাতীয় সংসদে ভাবগম্ভীর ও বেদনাবিধুর পরিবেশে ইনডেমিনিনটি (বাতিল) আইন '৮৬ সর্বসম্মতভাবে পাস হয়। বিলটি উত্থপিত হয় রাত ৮-৪৬ মিনিটে। পাস হয় রাত ১০-০৮ মিনিটে। বিএনপি যথারীতি খুনিদের পক্ষ অবলম্বন করে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের প্রক্রিয়ার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত না করার অভিপ্রায়ে সেদিনও জাতীয় সংসদে অনুপস্থিত ছিল।

জিয়াউর রহমান, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এবং বেগম খালেদা জিয়া জতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের বিচারের নিমিত্তে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করেননি।

জিয়াউর রহমান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত এবং বেনিফিসিয়ারী। হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করেছিল। এরশাদও বেনিফিসিয়ারী হিসেবে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের কোনো উদ্যোগ নেয়নি। আত্মস্বীকৃত খুনিদের বহাল তবিয়তে চাকুরিতে বহাল রেখেছিল এবং খুনিদের দল গঠণের সুযোগ করে দিয়েছিল এবং খুনি ফারুককে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য তথকথিত নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল।

অনুরূপভাবে বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯৬ সনের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রহসনের নির্বাচনে খুনি রশিদকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করে পবিত্র সংসদে বিরোধী দলীয় নেতার আসনে বসিয়ে সংসদকে কলংকিত করেছিল। খুনি মোশতাক অবৈধভাবে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করলেও জিয়াউর রহমান সংবিধানে সেই কালো আইন অন্তর্ভুক্ত করে এবং জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়া ঐ কুখ্যাত অধ্যাদেশ সংরক্ষণ করে। কিন্তু কালো আইন বাতিলের সময় বিএনপি-জামাতের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে তারা হত্যা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি অব্যাহত রাখতে চায়।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের মাধ্যমে আজ দেশবাসীর নিকট অত্যন্ত পরিষ্কার যে, একদিকে হত্যা ক্যু, ষড়যন্ত্র, চকান্ত ও স্বাধীনতা বিরোধী ধারা, অন্যদিকে স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র, ন্যায় বিচার, আইনের শাসন ও সমাজ প্রগতির ধারা। আওয়ামী লীগ জনগণের প্রত্যাশা পূরণে শেষোক্ত ধারা এগিয়ে নিয়ে চেয়েছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে সামরিক বেসামরিক খুনি চক্রের ষড়যন্ত্রে নিহত হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবাবর্গ। ২৬ সেপ্টেম্বর '৭৫ মোশতাক জারি করে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ। পরবর্তীকালে জেনারেল জিয়উর রহমান ১৯৭৯ সালে ৯ এপ্রিল তাঁর অনুগত জাতীয় সংসদে সংবিধানের ৫ম সংশোধনী পাস করিয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত জারি করা সকল সামরিক অইন-বিধি-কার্যক্রমকে বৈধতা দেন। ৭৫ পরবর্তী ক্ষমতাসীন চক্র খুনিদের পৃষ্ঠপোষকতা, পুরস্কৃত করেছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগসহ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের রাজনৈতিক দল ও শক্তি সব সময়েই ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের দাবিতে সোচ্চার।

১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়। ১৯৯৬ সালের ২রা অক্টোবর ধানমণ্ডি থানায় সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা দায়ের করেন পঁচাত্তরে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাসভবনের রেসিডেসন্ট পি.এ.আ.ফ.ম মহিতুল ইসলাম। এ দিনেই গ্রেফতার হয় মোশতাকের প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুর। এর আগেই বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৩ আগস্ট ভোরে গ্রেফতার হয় কর্ণেল ফারুক ও কর্ণেল শাহরিয়ার। পরবর্তীতে গ্রেফতার হয় আরো দুই লে. কর্ণেল মহিউদ্দিন

(আর্টিলারি) ও অনারারি লেফটেন্যান্ট আব্দুল ওয়াহাব জোয়ারদার। পরবর্তীকালে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল বিলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কর্ণেল ফারুকের মা মাহমুদা রহমান ও কর্নেল শাহরিয়ার সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দুটি পৃথক রিট মামলা করেন। '৯৭-এর ২৮ জানুয়ারি হাইকোর্ট এক রায়ে ঐ দুটে রিট মামলা খারিজ করে দেন। তদন্ত শেষে এএসপি এ. কাহার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলার চার্জশিট বা অভিযোগপত্র প্রদান করেন ১৫ জনুয়ারি '৯৭। সবার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০২, ৩৪, ১২০-বি ও ২০১ ধারায় হত্যা, হত্যার সহযোগিতা, হত্যার ষড়যন্ত্র ও হত্যার আলামত বিনষ্টের অভিযোগ আনা হয়। আসামি করা হয় ২০ জনকে। সাক্ষী ৭২ জন। খন্দকার মোশতাক, মাহবুব আলম চাষী, ক্যাপ্টেন সৈয়দ সারোয়ার হোসেন ও ক্যাপ্টেন এম মোস্তফা আহম্মদ এই ক'জনের আগেই মৃত্যু হওয়ায় আসামি তলিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। আসামিদের মধ্যে শেষ অবধি গ্রেফতার হয় ৬ জন, পলাতক থেকে যায় ১৪ জন। বিচার স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ রাখার জন্য সরকার প্রচলিত আইন সাধারণ আদালতেই বিচারের সিদ্ধান্ত নেয়।

এ অবস্থাতেই চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে মামলা ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিচারের জন্য স্থানান্তরিত হয় ১লা মার্চ '৯৭। আসামি, আইনজীবী ও বিচারকের নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে সরকার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন একটি ভবনকে ঢাকা জেলা ও দায়রা জজের আদালত চিহ্নিত করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ৩রা মার্চ '৮৭। ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুলের আদালতে মামলার চার্জ গঠন হয় ৭ই এপ্রিল '৯৭। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ৪ঠা মে '৯৭ সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার কার্যক্রম ৪ সপ্তাহের জন্য স্থগিত করে। হাইকোর্ট যোবায়দা রশিদকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়ার আদেশ দেয় ১৪ মে '৯৭। মামলার আসামি সংখ্যা ২০ থেকে কমে ১৯ হয়।

অবশেষে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে স্থাপিত ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুলের আদালতে মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ কার্যক্রম শুরু হয় ৬ জুলাই '৯৭। মামলার কার্যক্রমের প্রতিটি দিনে এই আদালত ও আশপাশের এলাকায় নেয়া হয় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পুলিশের পাশাপশি নিয়োজিত করা হয় বিডিআর। পলাতক ১৪ জন আসামির প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ১৪ জন আইনজীবী নিয়োগ করে। আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রেফতারকৃত ৫ আসামির নিকট-আত্মীয়, সাংবাদিক ও দর্শক-শ্রোতাদের মামলার কার্যক্রম অবলোকনের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়। কখনো সপ্তাহে ৫ দিন, কখনো ৩ দিন এভাবেই সাধারণত মামলার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কাঠগড়ায় উপস্থিত ৫ আসামির আইনজীবীরা মামলার কার্যক্রম ব্যাহত-প্রলম্বিত করার জন্য নানা কৌশল

অবলম্বন করে। বিচারক কাজী গোলাম রসুলের গুরুতর অসুস্থভাজনিক কারণেও মামলার কার্যক্রম বন্ধ থাকে প্রায় দেড় মাস। বিএনপি-জামায়াতসহ বিরোধী-দলীয় হরতাল আন্দোলনের কারণেও মামলার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

এতসব প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করে পরিচালিত হয় এ মামলার কার্যক্রম। সামরিক-বেসামরিক মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত ৬১ ব্যক্তি এ মামলার সাক্ষ্য প্রদান করেন। এদের মধ্যে ৩৯ জন সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত সদস্য, ২২ জন বেসামরিক ব্যক্তি। বিচারক কাজী গোলাম রসুল আসামিদের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পড়ে শুনিয়ে কাঠগড়ায় উপস্থিত ৫ আসামির মতামত নেন। এরা সবাই নিজদের নির্দোষ দাবি করে। সর্বশেষে হয় রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামিপক্ষের আইনজীবীদের আইনি যুদ্ধ-আরগুমেন্ট বা যুক্তিতর্ক প্রদর্শন। রাষ্ট্র পক্ষের মুখ্য আরগুমেন্ট উপস্থাপন করেন, সহযোগী আইনজীবীরা দেন সহায়তা।[২]

১৩ অক্টোবর '৯৮ শেষ হয় মামলার দীর্ঘ শুনানির পালা। প্রায় দেড় বছরব্যাপী ১৪৯ কার্যদিবসে অনুষ্ঠিত হয় এই শুনানি। শুনানির সমাপনী দিনে বিচারক কাজী গোলাম রসুল ৮ নভেম্বর '৯৮ সকাল ১০ টায় মামলার রায় ঘোষণার দিনক্ষণ নির্ধারণ করেন। রায়ে তিনি বলেন, "এই মামলায় প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ সেনাবহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ বিশেষ করে যারা ঢাকায় অবস্থান করেছেন তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করে নাই, এমনকি পালনের কোনো পদক্ষেপও গ্রহণ করেন নাই যথেষ্ট সমায় পাওয়া স্বত্ত্বেও। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন আদেশ পাওয়ার পরও তাঁরা নিরাপত্তার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সাক্ষ্য প্রমাণে ইহা পরিষ্কার যে মাত্র দুটি রেজিমেন্টের খুবই অল্প সংখ্যক জুনিয়ার সেনা অফিসার/সদস্য এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কেন এই কতিপয় সেনা সদস্যকে নিয়ন্ত্রণ/নিরস্ত্র করার চেষ্টা করেনি তা বোধগম্য নয়। ইহা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সেনাবাহিনীর জন্য একটি চিরস্থায়ী কলংক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

এই মামলায় প্রাপ্ত মৌখিক, দালিলিক, তথ্যগত, অবস্থাগত, সাক্ষ্য ও আলামত পরীক্ষা/পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণে আদাল এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই মামলায় আসামি ১. লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, ২. লে. কর্নেল সুলতান শাহ্‌রিয়ার রশিদ খান, ৩. লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক আহমেদ (আর্টিলারি), ৪. পলাতক আসামি লে. কর্নেল আব্দুর রশিদ, ৫. পলাতক লে. বজলুর হুদা, ৬. পলাতক লে. কর্নেল এ.এম. রাশেদ চৌধুরী, ৯. লে. কর্নেল মহিউদ্দিন অহমেদ (লান্সার), ১০. লে. কর্নেল এস.এইচ.এম.বি. নুর চৌধুরী ১১. লে. কর্নেল আব্দুল আজিজ পাশা, ১২. ক্যাপ্টেন মোঃ কিসমত হাশেম, ১৩. ক্যাপ্টেন নজরমুল হেসেন আনসার, ১৪. ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদ, ১৫. রিসালদার মোসলেমউদ্দিন ওরফে মোসলেমউদ্দিনগণ ১৯৭৫ সনে ১৫ আগস্ট অনুমান ভোর ৫টার সময় ধানমণ্ডিস্থিত

নিজ ৬৭৭ নম্বর বসভবনে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবারবর্গ আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্যকে ষড়যন্ত্র ও পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক গুলি করে হত্যা করার অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে দণ্ড বিধি ৩০২/৩৪ এবং দঃবিঃ ১২০-ক ধারার অভিযোগ সন্দেহাতিতভবে প্রমাণিত হয়েছে। ঘটনার পর কোনো কোনো আসামি দেশ-বিদেশে নিজেকে আত্মস্বীকৃত খুনি হিসেবেও পরিচয় দিয়ে দাম্ভিকতা প্রকাশ করে। ঘটনাটি কেবল নৃশংস নহে এই ঘটনায় ২ জন সদ্য বিবাহিতা মহিলাকে ও ১০ বৎসরের একজন শিশুকেও নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। উল্লেখ্য যে, আসামিদের এই অপরাধ এমন একটি ক্ষতির কার্য যা শুধু ব্যক্তি বিশেষের জন্যই ক্ষতিকর নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষেও পরিণতির বিষয় স্বজ্ঞানে জ্ঞাত থাকিয়াও ষড়যন্ত্র পরিকল্পিতভাবে ঘটিয়েছে। সুতরাং তাদের প্রতি কোনো প্রকার সহানুভূতি ও অনুকম্পা প্রদর্শনের যুক্তি নেই। এই অনুকম্পা পাওয়া কোনো যোগ্যতাও তাদের নেই। তাদের কৃত অপরাধের জন্য তাদের প্রত্যেককে দণ্ডবিধি ৩০২/৩৪ ধারা মতে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত হল। তাদেরকে উক্ত চরম দণ্ড প্রদানের পর ১২০-ক ধারায় অভিযোগে কোনো শাস্তি প্রদান করা হল না।

আসামি ১. তাহের উদ্দিন ঠাকুর, ২. আনারির ক্যাপ্টেন আব্দুল ওহাব জোয়ারদার, ৩. দফাদার মারফত আলী ও ৪. এলডি আবুল হাশেম মৃধা এর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ এই মামলায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি বিধায় তাদেরকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত দেয়া হল।

অতএব, আদেশ হল যে,

এই মমলায় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আসামি ১. লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, ২. লে, কর্নেল সুলতান শাহ্‌রিয়ার রশিদ খান, ৩ লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারি), ৪. পলাতক আসামি লে. কর্নেল আব্দুর রশিদ, ৫. পলাতক মে. বজলুর হুদা, ৬. পলাতক লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, ৭. মে. শরিফুল হোসেন ওরফে শরফুর হোসেন, ৮. লে. কর্নেল এ.এম. রাশেদ চৌধুরী, ৮. লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার), ১০. লে. কর্নেল এস.এইচ.এম.বি. নুর্ চৌধুরী ১১. লে. কর্নেল আব্দুল আজিজ পাশা, ১২. ক্যাপ্টেন মোঃ কিসমত হাশেম, ১৩. ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসার, ১৪. ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদ, ১৫. রিসালদার মোসলেম উদ্দিনকে দঃ বিঃ ৩০২/৩৪ ধারার অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হল। একটি ফায়ারিং স্কোয়ার্ডে প্রকাশ্যে তাদের প্রত্যেকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ হইল।

নির্দেশ মোতাবেক তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করিতে কর্তৃপক্ষের কোনো অসুবিধার কারণ থাকিলে তাহাদের মৃত্যুদণ্ড প্রচলিত নিয়মানুসারে ফাঁসিতে ঝুলাইয়া মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ রইল। আসামি ১. তাহের উদ্দিন ঠাকুর, ২. অনারারী কাপ্টেন আব্দুল ওহাব জোয়ারদার, ৩. দফাদার মারফত আলী ও ৪. এল, ডি আবুল

হাশেম মৃধা-কে অন্য কোনো মামলায় প্রয়োজন না হলে এই মামলা হতে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ হল।

আমার জবানিতে
(কাজী গোলাম রসুল)
জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা।[৩]

## চাতুর্যপূর্ণ প্রতারণা

১৯৯১ সনের ৬ আগস্ট সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তিত হয়। সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের ফিরে আসার প্রাক্কালে বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে প্রাক্তন স্পীকার রাজ্জাক আলী গং বঙ্গবন্ধু ভবনে এসে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তারা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের জন্য কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তাদের অঙ্গীকারের সঙ্গে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, যা তাদের রাজনীতিতে মজ্জাগত। তিন জোটের রূপরেখায় হত্যা, ক্যু, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অবসানের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেই যেহেতু বিএনপি'র জন্ম ও বিকাশ সেহেতু হত্যা, ক্যু, ষড়ন্ত্রের চির অবসনের লক্ষ্যে আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের প্রদত্ত অঙ্গীকারের সঙ্গে তারা বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করে। এমন অবস্থায় তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেতী শেখ হাসিনার নির্দেশ ১৯৯১ সালের ৮ই আগস্ট তৎকালীন বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম "The Indemnity Ordinance বাতিলকরণ বিল' ১৯৯১" জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন। বিল উত্থাপন বিলটি সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এক মাসের মধ্যে সংসদে একটি রিপোর্ট পেশ করার জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। তৎকালীন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয় মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ'কে কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্য হিসেবে ড. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, শিক্ষামন্ত্রী জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ, বিরোধীদলীয় নেতা, মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ মজিদ-উল-হক, কৃষি সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী, শেখ রাজ্জাক আলী, ডেপুটি স্পীকার; জনাব অব্দুস সালাম তালুকদার, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী; খন্দাকর দেলোয়ার হোসেন চিফ হুইপ; ব্যারিস্টার মোঃ রফিকুল ইসলাম, শ্রম ও জনশক্তি প্রতিমন্ত্রী; ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, খাদ্য প্রতিমন্ত্রী; সৈয়দা বেগম সাজেদা চৌধুরী, জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত; জনাব সুধাংশু শেখর হালদার; জনাব মোহাম্মদ নাসিম; এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী; শেখ আনসার আলী সমন্বয়ে কমিটির প্রস্তাব করা হল। সংসদের ঐ অধিবেশনে সভাপতিত্বকালে ডেপুটি স্পীকার আইন মন্ত্রীকে এ ব্যাপারে কিছু বলার আহ্বান জানালে জনাব মির্জা গোলাম হাফিজ বলেন, "জনাব নাসিম সাহেব যে প্রস্তাব করলেন যে, "The Indemnity

Ordinance ১৯৭৫ এর একটি বাছাই কমিটি হোক। আমি এ প্রস্তাব সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। আজকে যদিও বক্তব্য রাখার সময় নয়, তাও আমি সমর্থনে একটু কথা বলব। ইতোপূর্বে আমি দুইবার বলেছি যে, এই আইনটি বেশ জটিল এবং পরে বলেছি বহু জট আছে সেটা খুলতে হবে। আগে আমি একাই জট খুলবার চেষ্টা করছিলাম; এখন ১৫ জন হল। এখন আমরা সম্মিলিতভাবে এ জট খুলবার চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করব বলে বিশ্বাস করি।"

তিনি আরো বললেন, "আজকে বাছাই কমিটির সদস্য হিসেবে যে সব মাননীয় সদস্যের নাম শুনলাম তাঁদের দুই-একজন ছাড়া সবাই সংবিধানের একাদশ এবং দ্বাদশ সংশোধনের বাছাই কমিটিতে ছিলেন। সেখানেও তাঁরা এরকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং বহু জট ছিল যেগুলো খুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। আমরা যে দুটো বিল এখানে সর্বসম্মতিক্রমে পাস করেছি। এটা একটা বিরাট সাফল্য আমার মনে হয়, সাংবিধানিক ক্ষেত্রে এরকম একটি সাফল্য বেশি নেই যে, সংবিধান বিল সর্বসম্মতিক্রমে পাস হযেছে। আমরা ঐ সব মাননীয় সদস্যদের সমন্বয়ে বসব, চেষ্টা করব এবং এই জটিল আইনকে একটা আন্তরিক ও সুস্থ পরিবেশের মাধ্যমে অত্যন্ত সহজ করে দেবো বলে আশা করি। যত শ্রীঘ্র সম্ভব আমরা এই বাছাই কমিটি বসে আমাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ করে জটগুলো কুলে চুড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করার চেষ্টা করব।"

কিন্তু দেখা গেলো বাস্তবিক অর্থে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সেজন্য ১৯৯১ সনের ১১ই অক্টোবর আরো ৬০ দিনের জন্য উক্ত কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলো। তাতেও কোনো কাজ হলো না।

সুতরাং ১৯৯২ সনের ২৫শে জুন ২য় দফায় আরো ৭০ দিনের জন্য আবারো মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে। তাতেও ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের তেমন কোনো অগ্রগতি সাধিত হলো না।

এরপর ১৯৯৩ সনের ১১ মার্চ তৃতীয় দফায় আরো ৭০ দিনের জন্য সময় সীমা বর্ধিত করা হলো। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুই হলো না। শুধু টালবাহান, প্রতারণা এবং সময়ক্ষেপণের কৌশল।

তারপরও ১৯৯৩ সনের ১৫ জুলাই হতে চতুর্থ দফায় আরো ৮০ দিনের জন্য উক্ত কমিটির সময় বর্ধিত করা হলো। কিন্তু ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের কোনোই অগ্রগতি হলো না।

## সমাপ্তি নিয়ে সংশয়

হত্যাকাণ্ডের ৩২ বছর পার হলেও বঙ্গবন্ধু হত্যার মামলা চূড়ান্ত নিষ্পতি হয়নি। অনেক চড়াই উতরাই পার করে এ সময়ে মামলাটির বিচার হয়েছে এবং আসামিদের মৃত্যুদণ্ড হাইকোর্ট থেকে অনুমোদনও করা হয়েছে। কিন্তু রায় কার্যকর

করা সম্ভব হয়নি। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা স্থগিত রয়েছে। কবে নাগাদ এ অবস্থার অবসান হবে তাও অনিশ্চিত হয়ে গেছে। যদি কারাগারে অটক চার জন ছাড়া পলাতকদের জন্য এটা নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া মামলা। যাদের মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কার্যকর করা সম্ভব তাদের বিষয়টি আপিল বিভাগে দীর্ঘ ছয় বছর ধরে ঝুলে আছে।

কারাগারে আটক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত চার আসামি হাইকোর্টের বিচার মেনে নিতে পারেনি। তারা সর্বোচ্চ আদালতে আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন (লিভ পিটিশন) করে। তাদের এই আবেদন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঝুলে আছে ২০০১ সালের ১৬ জুলাই থেকে। সেদিন আসামি পক্ষের আপত্তির মুখে বিচারপতি গোলাম রব্বানী মামলাটির শুননি গ্রহণে অসম্মতি পকাশ করেন। এ অবস্থায় আপিল বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারপতির অভাব দেখা দেয়। এই বিভাগ কোনো মামলা শুনানি করে নিষ্পত্তি করতে হলে সর্বনিম্ন তিন জন বিচারপতির সমন্বয়ে পূর্ণঙ্গ বেঞ্চ গঠন করতে হয়। অথচ পাঁচ বিচারপতিদের আপিল ভিাগে বিচারপতির সংখ্যা বাড়িয়ে সাত করার পরও বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা শুনতে পারবেন এমন বিচারপতির সংখ্যা কখনোই দুই থেকে তিনে উন্নীত হয়নি। বর্তমানে বিচারপতি মোঃ তফাজ্জল ইসলাম এবং বিচারপতি জয়নুল আবেদীন মামলাটি শুনতে পারেন। এখন আপিল বিভাগে একজন নতুন বিচারপতি নিয়োগ দেয়া হলে মামলাটি শুনানির জন্য আদালত পাওয়া যাবে। যদিও সে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট পর্যায়ে বিব্রত হয়েছিলেন এমন কেউ আপিল বিভাগে নিয়োগ পেলে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না। এরপরও সরকার বা রাষ্ট্রপতি চাইলে মামলাটি শেষ করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট থেকে একজন অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ করতে হবে।

তারপরও পরিস্থিতি হচ্ছে, আপিল নিষ্পত্তির জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এখন কোনো নির্দিষ্ট আইনজীবী নেই। মামলাটি পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রাষ্ট্রপক্ষের এককালীন বিশেষ পিপি অ্যাডভোকেট আনিসুল হককে বিগত সরকার অব্যাহতি দেয়। অব্যহতি পত্রে বলা হয়েছিল, রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিজ্ঞ আইন কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকায় তাদের এই দায়িত্ব বহাল রাখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর শাখার বক্তব্য অনুযায়ী, এই মামলাটি পরিচালনার দায়িত্ব তখন থেকেই অ্যাটর্নি জেনারেলের দফতরের।

এ পরিস্থিতিতে আপিল মামলাটি কোথায় কী অবস্থায় আছে অ্যাটর্নি জেনারেল দফতরের কেউ খোঁজও রাখে না। আপিলকারী আসামি পক্ষের আইনজীবীদেরও মামলাটি ফয়সলা করার কোনো তাগিদ নেই। নিজেদের আপিল আবেদন শুনানি করতে তারা আজ পর্যন্ত আদালতের কাছে তারিখ নির্ধারণ করার আবেদন করেন

নি। তাদের মক্কেলরা মৃত্যুদণ্ডের আসামি হয়ে জেলের কনডেম সেলে বন্দীজীবন কাটাচ্ছেন।

আদালত কৃর্তক ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর ররহমানের ঘাতক মহিউদ্দিন আহমেদকে গ্রেফতারের খবর মার্কিন সরকার ১৪ মার্চ '০৭ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারকে জানায়নি। পলে সরকারও এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত বা পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেনি।

এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র সচিব মোঃ আব্দুল করিম সরকারকে বলেন, আমরা এখনো বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানি না। মার্কিন সরকার বিষয়টি আমাদের জানালে আমরা অবশ্যই সরকারের নীতনির্ধারকদের নির্দেশমতো পদক্ষেপ নেব।

এ ব্যাপারে পুলিশের শীর্ষস্থানীয় এক কর্মকর্ত বলেন, বঙ্গবন্ধুর খুনি মহিউদ্দিন আমেরিকায় গ্রেফতারের ব্যাপারে মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে বা আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের পক্ষ থেকে কোনো কিছু এখনো জানানো হয়নি। বিষয়টি পত্র-পত্রিকার গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে সরকার নিজ উদ্যোগে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিতি বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে বিষয়টির সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে।

### আসমিরা কে কোথায়?

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় মোট ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড হাইকোর্ট থেকে অনুমোদন করা হয়। ২০০১ সালের ৩০ এপ্রিল তৃতীয় বিচারপতির রায় ঘোষণার মধ্য দিয়ে এই মামলার নিষ্পত্তি হলে আজ পর্যন্ত কাউকে ফাঁসি দেয়া সম্ভব হয়নি। ইতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে মাত্র চার জন বর্তমানে কারাগারে আটক রয়েছেন। তারা হচ্ছেন লে. কর্নেল (বরখাস্ত) সৈয়দ ফারুক রহমান, কর্নেল (অব.) সুলতান সুলতান রশিদ খান এবং মেজর (অব.) বজলুল হুদা। বর্তমানে আরো এক খুনী মহিউদ্দিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রত্যাগত হয়ে কারাগারে আছে।

অন্যরা পলাতক। ক্যাপ্টেন আব্দুল মজিদ ও ক্যাপ্টেন আবুল হাশম মৃধার কোনো সন্ধান নেই। লে. কর্নেল আব্দুল আজিজ পাশা (আর্টিলারি) রায়ের পর ২০০২ সালে জিম্বুয়েতে মারা গেছেন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে সরকারি চাকরিবিধি লঙ্ঘন করায় আব্দুল আজিজ পাশাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর আজিজ পাশার স্ত্রী মাহফুজা পাশার আবেদনের ভিত্তিতে তাকে বরখাস্তের পরিবর্তে অবসর দেখানো হয়। তার পরিবার অবসর ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে বলে জানা গেছে। মেজর ডালিম রিবিয়া ও কেনিয়ায় বেশ কিছু সহায়-সম্পদ গড়ে তুলে বহাল

তবিয়তে আছেন বলে খবর পাওয়া যায়। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে মাঝে মধ্যে তার উপস্থিতির খবর পাওয়া যায়। নূর চৌধুরী কানডায় অনেকা স্থয়ীভাবেই বসবাস করছেন বলে পররাষ্ট্র দফতরে খবর ছিল। কানাডা সরকার তাকে দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ হাইকমিশনের  চেয়েছিল। কিন্তু হাইকমিশন তখন গরজ দেখায় নি। এমনকি শমসের মবিন চৌধুরী পররাষ্ট্র সচিব থাকাকালে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মরত খন্দকার মুশতাকের সৎছেলে তার পাসপোর্ট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধন করে দেন। মেজর একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ (আর্মার্ড) ও মেজর এএম রাশেদ চৌধুরীর (ইস্ট বেঙ্গল) যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করার সংবাদ নিয়ে বাংলাদেশ সরকার এক সময় তাদের ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছিল। রিসালদার মোসলেমউদ্দিন ভারতে আত্মগোপন করে আছেন বলে কখনো কখনো বলা হয়েছে। ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো তাকে ধরতে একাধিকবার তৎপর হলেও তার হদিস মেলেনি।

## ফিরিয়ে আনতে বাধা কোথায়

মৃত্যুদণ্ড পাওয়া এসব আসামিদের দেশে ফিরিয়ে আনার কোনো উদ্যোগ নেই। এর জন্য প্রয়োজনে অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি। ১৯৯৮ সালে থাইল্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশ অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি সই করে। চুক্তির ফলে খুনি বজলুল হুদাকে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় ঘোষণার দিনই (৮ নভেম্বর ১৯৯৮) দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানডার সঙ্গে অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরের প্রশ্নে অনেকটাই অগ্রগতি হয়। সিএম সফি সামির নেতৃত্বে গঠন করা ৫ সদস্যের একটি দল ২০০১ সালের এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র সফর করে। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেলের প্রতিনিধি ব্যারিস্টার শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, পররাষ্ট্র দফতরের মহাপরিচালক মুন্সী ফয়েজ, আইন মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন যুগ্মসচিব বর্তমানে হাইকোর্টের বিচারপতি আনোয়ারুল হক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন যুগ্মসচিব (রাজনৈতিক) মোহাম্মদ জানিরুল হক। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে তারা লাগাতার ৫ দিন আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত সব ধরনের অপরাধী হস্তান্তরের জন্য একটি সাধারণ চুক্তি সম্পন্ন করতে সম্মত হন। এরই আলোকে উভয়পক্ষের মধ্যে অপরাধী প্রত্যর্পণের একটি প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়। বাংলাদেশের পক্ষে সিএম শফি সমি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুয়ায়ী চূড়ান্ত স্বাক্ষরের আগে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় মার্কিন সিনেটে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার পরিবর্তনের পর অবশিষ্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের পক্ষ থেকে আর উদ্যোগ নেয়া হয়নি। উদ্যোগের অভাবে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরের অপরাপর

চেষ্টাও থেমে যায়। পাশপাশি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী সাজা পাওয়া আসামিদের দেশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে গঠিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সেলটিও বিলুপ্ত করা হয়।

এরপরও সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের দেশে ফিরিয়ে আনার সম্ভব বলে মনে করেন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সাবেক বিশেষ কৌসুলি আনিসুল হক, তার মতে, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে ইন্টরপোলের আন্তর্জাতিক গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে। ইন্টারপোলের মাধ্যমে এদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেফতার হওয়া মহিউদ্দিনকে এ পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।[৪]

## আপিল বিভাগে ঝুলন্ত বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা

১৬ মার্চ ২০০৭। সপরিবারের বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা কার্যক্রম শুরুর সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। বিচারপতি এম এ আজিজ এবং বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছির অবসরে যাওয়ায় এ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। জান গেছে, তাদের শূন্যস্থান পূরণের জন্য একাধিক জ্যাষ্ঠতম বিচারপতিকে হাইকের্ট থেকে আপিল বিভাগে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। আইনজ্ঞদের মতে, ইতিপূর্বে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার শুনানি গ্রহণ করেননি এমন ৩ জন বিচারপতি হলেই আপিল বিভাগে মামলাটি চালু হতে পারে। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার শুনানি করতে পারেন আপিল বিভাগে বর্তমানে এমন ২ জন বিচারপতি রয়েছেন। আপিল বিভাগে আর একজন বিচারপতি নিয়োগ দিলেই এ মামলার কার্যক্রম শুরু করা যায়। আইনজ্ঞরা মনে করেন, বিচারপতি নিয়োগ হওয়ামাত্র সরকারের সদিচ্ছা থাকলে চলতি মাসেই বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা আপিল বিভাগে উঠতে পারে। বঙ্গবন্ধুর ৮৭তম জন্মদিনকে উপলক্ষ করে এ সুযোগ কাজে লাগানোর ব্যাপারে আশাবাদী আইজ্ঞরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জনায়, সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার কার্যক্রম শুরুর নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আপিল বিভাগে বর্তমানে ৬ জন বিচারপতি রয়েছেন। প্রধান বিচারপতি মোঃ রহুল আমিন, বিচারপতি মোহাম্মদ, ফজলুল করিম, বিচারপতি মোঃ তাফাজ্জাল ইসলাম, বিচারপতি আমিরুল কবির চৌধুরী এবং বিচারপতি মোঃ জয়নুল আবেদীন। তাদের মধ্যে বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন ও বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম হাইকোর্টে থাকাকালে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার শুনানি গ্রহণ করেছেন। ২০০২ সালের ১৯ মার্চ এ মামলা কবির চৌধুরী শুনানি গ্রহণে বিব্রতবোধ করেন। মামলায় কোনভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না- আপিল বিভাগে এমন বিচারপতি হচ্ছেন, বিচারপতি তফাজ্জাল ইসলাম এবং বিচারপতি মোঃ জয়নুল আবেদীন। এ মামলা শুনানির জন্য কমপক্ষে ৩ জন বিচারপতি প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে আপিল বিভাগে আরও একজন বিচারপতি নিয়োগ দিতে হবে। আপিল বিভাগে ৭ জন বিচারপতি ছিলেন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি অবসর

নেন বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছির হোসেন। শূন্যস্থান পূরণের লক্ষ্যে একজন বিচারপতিকে আপিল বিভাগে নিয়োগদানের প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হাইকোর্টের ৩ বিচারপতির নামের একটি পানেল সরকারের মধ্যমে প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো হয়েছে। তারা হলেন, বিচারপতি মোঃ হাসান আমীন, এ কে বদরুল হক এবং মোঃ আবদুল মতিন। তাদের মধ্য থেকে এক বা একাধিক বিচারপতিকে আপিল বিভাগে নিয়োগ দেয়া হবে। একজন বিচারপতিকে নিয়োগ দেয়া হলে জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী বিচারপতি মোঃ হাসান আমীনই এ নিয়োগ প্রাপ্য। উক্ত নিয়োগ সম্পন্ন হলেই আপিল বিভাগে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার কার্যক্রম শুরু হতে পারে। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলি এডভোকেট অনিসুল হক মামলা শুরুর ব্যাপারে বলেন, "এ হত্যা মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সদিচ্ছ বিগত জোট সরকারের ছিলো না। মামলাটি শুরুর ব্যাপারে তৎকালীন এটর্নি জেনারেল কোন চেষ্টাই করেন নি। বরং ২০০২ সালের ১৯ ডিসেম্বর এ মামলার রাষ্ট্রপক্ষের বিশেষ কৌসুলিদের অব্যাহতি দেয়া হয়। এছাড়া এ হত্যা মামলার পলাতক ৮ আসামীকে গ্রেফতারের কোন উদোগ নেয়নি জোট সরকার। আপিল বিভাগে একজন বিচারপতি নিয়োগ দিয়ে বর্তমান সরকার মামলাটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দিকে নিয়ে যবে বলে আমি আশা করছি।" এদিকে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে এটর্নি জেনারেল ব্যরিস্টার ফিদা এম. কামালের কাছে জানতে চাইলে তিনি এ মুহূর্তে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। এক পলকে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা মামলা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারের বঙ্গবন্ধু হত্যার ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে এর বিচার কার্যক্রম শুরু হয়। সে বছর ২ অক্টোবর দায়ের করা এজাহারের ভিত্তিতে ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর নিম্ন আদালতে বিচার কার্যক্রম শেষ হয়। ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল পলাতক ১১ আসামীসহ ১৯ জন আসামীর ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। এ মামলার ডেথ রেফারেন্স শুনানি শুরু হলে হাইকোর্ট ২০০০ সালের ১৪ ডিসেম্বর বিচারপতি মোঃ রহুল আমিন এবং বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক দ্বিধা বিভক্ত রায় দেন। রয়ে বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন ১০ জনে মৃত্যুদণ্ড বহল এবং বিচারতি এ বি এম খায়রুল হক ১৫ জনের মৃতুদণ্ডই বহাল রাখেন। নিয়ম অনুযায়ী হাইকোর্টের তৃতীয় বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম ২০০১ সালের ৩০ এপ্রিল ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। খালাস পায় ৩ জন।

মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের মাঝে মাত্র ৪ জন কারাবন্দী রয়েছেন। তারা হলেন, কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, মহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারি) এবং বজলুল হুদা। বিভিন্ন দেশে আত্মগোপন করে আছেন, কর্নেল

(অব.) খন্দকার আব্দুর রশিদ, শরীফুল হক ডালিম, এ এম. রশিদ চৌধুরি, এম এইচ এস বি নূর চৌধুরি, আব্দুল মাজেদ, মোসলেম উদ্দিন এবং মঙ্গলবার লসএঞ্জলেসে গ্রেফতার হওয়া এ কে এম, মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার)। অপর আসামী আব্দুল আজিজ পাশা ইন্তেকাল করেছেন। পলাতক আসামীদের মধ্যে শরীফুল হক ডালিম এবং এ কে এম মহিউদ্দিন অহমেদের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে যায় আওয়ামী লীগ সরকার।[৫]

এদিকে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ (৬০) কে ১৫ মার্চ মঙ্গলবার লসঅ্যাঞ্জেলেহে বাসা থেকে গ্রেফতার করেছে। মার্কিন ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস আইনের আওতায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ.কে.এম. মহিউদ্দিনকে বাংলাদেশে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার রায় কার্যকর হয়নি। বর্তমানে আসামীদের লিভ অব আপীল সুপ্রীম কোর্ট গ্রহণ করেছে। শুনানীর অপেক্ষায় আছে।

# ১. পরিশিষ্ট

## অভ্যুত্থানে জড়িত ছিল সি.আই.এ

লরেন্স লিফশুলজ

[১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার ঘটনা কি শুধু একদল উচ্ছৃঙ্খল সেনাসদস্যের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও সামরিক উন্মত্ততার উদাহরণ? নাকি এর পেছনে আরো গভীর ষড়যন্ত্র ছিল? প্রখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ প্রায় তিন দশক ধরে এ বিষয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধান করেছেন। অনুসন্ধানে অভ্যুত্থানকারী সেনাবাহিনীর ক্ষুদ্র অংশের সঙ্গে খোন্দকার মোশতাক ও ঢাকায় মার্কিন দুতাবাসের একাংশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। এই যোগাযোগের বিষয়টি লিফশুলজকে জানিয়েছিলেন 'অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে। গত ৩০ বছর ধরে সূত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে গেলেও কখনো তার নাম বলেননি তিনি। ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারির 'ডিপ থ্রোটের মতো কৌতুহল ছিল এই সূত্রের নাম নিয়ে। এবার সেটি প্রকাশ করলেন লিফশুলজ। ঢাকায় মার্কিন দুতাবাসের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত ইউক্রেন বোস্টার ছিলেন তার সূত্র। ষড়যন্ত্র ও ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডকে কখনোই মেনে নিতে পারেননি বোস্টার। গত ৭ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তেমন গুরুত্ব না থাকলেও তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের রোষানল থেকে রক্ষা পায়নি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ। কিসিঞ্জার কখনো ভুলতে পারেননি তার পরামর্শ বা নির্দেশ উপেক্ষা করে দেশটির জন্ম হয়েছে। আর তারই পরিণতি ১৫ আগস্ট। বিভীষিকাময় সে ঘটনাবলির নেপথ্য কাহিনী অনুসন্ধানে লরেন্স লিফশুলজ মার্কিন সূত্রগুলো এবং মোশতাক ও অন্যদের সঙ্গে কথা বলেছেন। গত ৩০ বছর এ বিষয়ে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে তিনি নতুন করে লিখেছেন সেই কাহিনী। *তিন কিস্তির এই প্রতিবেদনটি দৈনিক প্রথম আলো থেকে সংগৃহীত*। তারিখ ১৫ আগস্ট ২০০৫ সন।

১. বাংলাদেশের ১৫ই আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের ৩০তম বার্ষিকী মার্কিন লেখক উইলিয়াম ফকনারের কথা আবার মনে করিয়ে দিল, "অতীতের মৃত্যু নেই। এমনকি অতীত কখনো অতীত হয় না।" আমাদের মতো যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৭০–এর দশকের প্রত্যক্ষদর্শী, আমরা স্মরণ করতে পারি ঐ দিনগুলো, যা একটি যুগের মাইলফলক। এ সব ঘটনা যে পথ নির্দেশ করেছিল সে পথ ধরে আমরা গন্তব্যে চলেছি, অনেকেই সে গন্তব্যে পৌছাতে পারেনি।"

২. ৩০ বছর পরও ১৫ই আগস্টের সহিংস সেই রাতের ঘটনাবলি আজও বাংলাদেশে জীবন্ত। ১৯৭১ সালের মার্চের কালরাত্রির মাত্র চার বছর পরের ঘটনা। '৭১–এর মার্চেই পাকিস্তানি সৈন্যরা জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয়ার পরিবর্তে দেশের মানুষের উপর ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিয়েছিল। অথচ এ ফলাফল মেনে

নিতে বাঙালিরা সম্মত হয়েছিল। আর স্বাধীনতার মাত্র চার বছরের মাথায় বাংলাদেশ সেন বাহিনীর ছোট্ট একটি অংশ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নোংরা ধারা অনুসরণ করে অভ্যুত্থান ঘটায়।

৩. একটি সামরিক অভ্যুত্থানের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বাংলাদেশের অনেক মানুষের কাছে স্বাধীনতার প্রতীক শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন। অভ্যুত্থানকারীরা খুনের নেশায় উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল। মুজিব এবং তার পুরো পরিবারকে হত্যা করা হয়, হত্যা করা হয় তার স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, তাদের স্ত্রী সুলতানা কামাল ও রোজী জামালকে। এমন কি হত্যা করা হয় শিশুপুত্র শেখ রাসেলকে, যার বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। ঐ রাতে সেনাবাহিনীর দলটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সারা শহরে দাপিয়ে বেড়ায় মুজিবের আত্মীয়স্বজনদের হত্যার উদ্দেশ্যে। নিহত হন মুজিবের ভাই শেখ আবু নাসের, ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার জীবন বাঁচাতে ছুটে আসা কর্নেল জামিল।

৪. এক গর্ভবতী নারী আরজু তার স্বামী শেখ ফজলুল হক মনিকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন, এ অপরাধে তাকেও হত্যা করা হয়। মনি ছিলেন শেখ মুজিবের ভাগ্নে। মুজিবের দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ঐ সময় দেশের বাইরে ছিলেন। শেখ হাসিনা পরে দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। তাকেও মাত্র এক বছর আগেও প্রকাশ্যে দিবালোকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। এ হামলা আবার প্রমাণ করে ফকনারের সেই বাক্য, "অতীত আসলে অতীত নয়। এটা খুবই বর্তমান।"

৫. ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের ঘটনায় জড়িতদের উত্তরসূরিরাই বর্তমান বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রয়াত জেনারেল জিয়াউর রহমানের স্ত্রী, যিনি ঐ সময় সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান ছিলেন এবং পর্দার অন্তরালে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যা পরবর্তীতে অভ্যুত্থান ও অন্যান্য ঘটনা ঘটায়।

৬. ঢাকায় মার্কিন দূতবাসে ঐ রাতে রাজনৈতিক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা অভ্যুত্থান বিষয়ে ঘটতে থাকা ঘটনাগুলোর উপর নজর রাখতে শুরু করেন। কিন্তু মার্কিন দূতাবাসে তখন একজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি ঘটনাগুলো জানতেন এবং তিনি অস্থির ছিলেন। কিছু বিষয় তিনি কাউকে বলতে পারতেন না। অভ্যুত্থানের কয়েক মাস আগেই এমনটা ঘটবে বলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন এবং তা ঠেকাতে সর্বোচ্চ প্রয়াস চালিয়েছিলেন।

৭. অভ্যুত্থানের তিন বছর পর ওয়াশিংটনে আমি এই লোকের সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমার খবরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হয়ে উঠেন। আমি এ আশায় থাকি যে, তিনি আমাকে এ ব্যাপারে যে সব তথ্য দেবেন তা একদিন অস্বস্তিকর সত্য হয়ে বেরিয়ে আসবে এবং যারা এর সঙ্গে জড়িত তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে। ত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো আমি তার পরিচয় জানতে পারি। এতগুলো

বছর তার সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকার পরও তার পরিচয় প্রকাশ না করার ব্যাপারে অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে সংযম পালন করেছি, যা থেকে আমি এখন মুক্ত। ধৈর্য ধরুন, কেন এবং কীভাবে আমি এ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম, তা বলব।

৮. যে সব বিদেশী সাংবাদিক এ অভ্যুত্থানের ঘটনা কভার করেছিলেন, আমি ছিলাম তাদের একজন। তবে এদের মধ্যে একমাত্র আমি, যে সাংবাদিক হিসেবে বাংলাদেশে বাস করে একটি বড় পত্রিকার জন্য এ বিষয়ে প্রতিবেদন পাঠাই। ১৯৭৪ সালে আমি ছিলাম ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউর ঢাকা সংবাদদাতা। পরের বছর আমি নয়াদিল্লি চলে যাই, আমাকে ঐ পত্রিকার দক্ষিণ এশীয় প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। মুজিবের নৃশংস হত্যা আমাকে বিষয়টি অনুসন্ধানে আকর্ষিত করে। এ ঘটনা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে প্রভাবিত করে। আর এমন ঘটনা ঘটবে তা আমি কখনো ধারণা করতে পারিনি।

৯. আমার অচিরাচরিত সূত্রটি মার্কিন দূতাবাসে কাজ করতেন। ঐ রাতে তিনিই তার সততা ও দায়বদ্ধতার গুণে বিষয়টির গভীরে যেতে আমাকে উৎসাহিত করেন। ঐ সময়কার সরকার আমলাতন্ত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যদের থেকে আলাদা। অভ্যুত্থানে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড নিয়ে তিনি অত্যন্ত হতাশ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সচেতন ব্যক্তি এবং এমন কিছু জানতেন যা অন্যরা জানতেন না। এ জানাটাই তার বিবেক দংশনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমারটাও ছিল ঐ ধরনের নৈতিক দায়িত্ববোধের ব্যাপার, যা তার সঙ্গে একাধিকবার মুখোমুখি করেছিল। একজন তরুণ রিপোর্টারের জন্য যা ছিল খুবই স্মরণীয় ঘটনা।

১০. মুজিবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের পর এ বিষয়ে ক্ষমতাসীনদের সরকারিভাবে প্রচারিত কাহিনী এবং ঐ সময় সরকারের তল্পিবাহক সংবাদপত্রগুলোর প্রতিবেদন আমাকে বিপাকে ফেলে দেয়। এই দুই পক্ষের বক্তব্য এক ছিল না। অধিকন্তু দুই কাহিনীর মধ্যকার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র ও পূর্ববর্তী ঘটনাবলি।

১১. এ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়, ছয় জন জুনিয়র অফিসারের নেতৃত্বে তিন শ সেনা একবারে নিজেদের সিদ্ধান্তে শেখ মুজিবকে ক্ষমতাচ্যুত করে। মুজিব ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে কিছু অফিসারের ব্যক্তিগত ঈর্ষা এবং ঐ সময়ে ব্যাপক দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষের হতাশার বহিঃপ্রকাশ ছিল ঐ অভ্যুত্থান, ছিল একতরফা চিন্তার ফসল, এক বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়ের কোনো পরিকল্পনা এটা ছিল না।

১২. যেদিন ভোরে মুজিব এবং তার পরিবারকে হত্যা করা হয়, ঐ সকালেই তরুণ অফিসাররা পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হিসেবে খোন্দকার মোশতাক আহমদের নাম ঘোষণা করে। আওয়ামী লীগে মোশতাককে ডানপন্থি মুক্তির প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মুজিবের পতনে তার ব্যক্তিগত ভূমিকা সম্পর্কে মোশতাক মুখে কুলুপ এটে ছিলেন। অভ্যুত্থানে তিনি তার সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটাই করেননি। জনসমক্ষে আলোচনায়

এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন এলে তিনি সহজভাবে তা এড়িয়ে গেছেন। আসলে তিনি তার সরকারকে স্থিতিশীল করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

১৩. অভ্যুত্থানের তিন মাসের মধ্যে মোশতাককেও ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর দুর্নীতির অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর পুরান ঢাকার বাসভবনে এক সাক্ষাৎকারে মোশতাক এ অভ্যুত্থানের ব্যাপারে তার আগাম ধারণা অথবা অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে কোনো বৈঠকের কথা অস্বীকার করেন। আর অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত জুনিয়র অফিস্যারদের এ ঘটনার চার মাসের মধ্যেই দেশের বাইরে যেতে বাধ্য করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে অস্থিরতার সুযোগে তাদের বাইরে পাঠানো হয়। এরপর বেরিয়ে আসে ভিন্ন কাহিনী।

১৪. অভ্যুত্থানের ব্যাপারে তাদের পৃষ্ঠপোষক ও মিত্রদের কাজে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে এই জুনিয়র অফিসারদের অধিকাংশ ব্যাংকক এবং অন্যত্র সাংবাদিকদের কাছে সাক্ষাৎকার দিয়ে মুখ খুলতে শুরু করে। অভ্যুত্থানের আগে মোশতাক ও তার সহযোগীদের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়টি তারা নিশ্চিত করে। তখন এ কাহিনী বেরিয়ে আসে যে, মুজিবকে হত্যা ও ক্ষমতাচ্যুত করার এক বছর আগে থেকেই মোশতাক ও তার রাজনৈতিক মিত্ররা বেশ কয়েক দফা গোপন বৈঠক পরিকল্পনা করেছিল।

১৫. অভ্যুত্থানের কয়েক মাস পর মার্কিন দূতাবাসের একজন মধ্যম সারির কর্মকর্তা আমাকে বলেন, আগস্টের ঘটনা নিয়ে মার্কিন দূতাবাসের মধ্যেই চাপা উত্তেজনা ছিল। তিনি বলেন, ঐ সময় দূতাবাসে এ রকম খবর ছড়িয়ে পড়ে যে সি.আই.এর স্টেশন চিফ ফিলিপ চেরি কোনো না কোনোভাবে অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত। এ নিয়ে চেরি ও মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজেন বোস্টারের মধ্যে উত্তেজনা চলছে। তিনি বলেন, 'আমি বুঝতে পারছিলাম এমন একটা কিছু ঘটছে যা ঘটা উচিত নয়।' তিনি আমাকে বিষয়ের আরো গভীরে যেতে আহ্বান জানান।

১৬. যুক্তরাষ্ট্র কেন এ অভ্যুত্থানে জড়াবে তা আমার মাথায় আসছিল না। যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের দুটো কমিটি সিআইএর গোপন বেআইনি কর্মকাণ্ড তদন্ত করার জন্য তৈরি হচ্ছিল। তখন ওয়াশিংটনে চলছিল সি.আই.এর হাতে বিদেশী নেতাদের খুন হওয়ার ঘটনার তথাকথিত চার্চ ও পাইক কমিটির শুনানি। এ শুনানি যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিক ও গোয়েন্দাদের মধ্যে বড় মাপের আতঙ্ক ও উদ্বেগ তৈরি করে। মার্কিন পত্রপত্রিকাগুলো খোলাখুলি লিখতে শুরু করে চিলিসহ বিশ্বের নানা প্রান্তে অবৈধ গোপন তৎপরতা চালানোর দায়ে উর্ধ্বতন মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কারাদণ্ডও হতে পারে।

১৭. গ্রীষ্মকালে মার্কিন নাগরিকরা মনগোজ, কয়েনটেলপ্রো, এএমল্যাশ, জাতীয় শব্দ সংক্ষেপের সঙ্গে প্রথমবারের মতো পরিচিত হতে শুরু করে এবং কঙ্গোয় লুমুম্বা, কিউবায় কাস্ত্রো এবং চিলিতে আলেন্দেকে হত্যার ষড়যন্ত্রের বিশদ বিবরণ তারা পেয়ে যায়। আসলে মার্কিন ক্ষমতার অদৃশ্য হাত বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছে গিয়েছিল। হিমশৈলের চূড়াটি প্রথমবারের মতো মার্কিনিদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা

দেয়। আর এ সব কিছু ঘটছিল ওয়াশিংটন থেকে বহুদূরে ভাপসা ও গুমোটপূর্ণ এক পরিবেশে, যেমনটা দক্ষিণ এশিয়ায় বর্ষাকালে দেখা যায়।

১৮. শেখ মুজিবের মর্মান্তিক মৃত্যু সম্পর্কে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, এর নেপথ্যে অবশ্যই বিদেশী শক্তির হাত রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি। ভারতে জরুরি অবস্থার দিনগুলোতে তার সমর্থক মস্কোপন্থি সিপিআইর বক্তব্য ছিল আরো স্পষ্ট। দলটি বলে এ অভ্যুত্থানের পেছনে রয়েছে সি.আই.এ। তবে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না থাকায় আমি একে অপপ্রচার বলে নাকচ করে দিই।

১৯. তাহলে কীভাবে অভ্যুত্থানটি হলো? অভ্যুত্থানের কুশলিবরা নিজেদের আড়াল করতে কীভাবে নানা গোলকধাধা তৈরি করে তাতে বিচরণ করে এবং শেষ পর্যন্ত ১৫ আগস্টের ঘটনা ঘটতে সক্ষম হয় সে বিষয়ে আমার তখনো অনেক কিছুই অজানা ছিল। অভ্যুত্থানের পর প্রায় তিন বছর আমি ইংল্যান্ডে ছিলাম। আমি ওয়াশিংটনে গিয়ে আমার এক সহকর্মী নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত দ্য ন্যাশন সাময়িকীর সম্পাদক কাই বার্ডের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিই। কাই একজন খ্যাতিমান মার্কিন লেখক।

২০. কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস শীর্ষক একটি গবেষণার সূত্র ধরে কাই বার্ড কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে পেয়ে যান। কার্নেগি মার্কিন নীতি ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প হাতে নেন। প্রকল্পের প্রধান ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারের সাবেক সহকর্মী রজার মরিস। কিন্তু অস্পষ্ট এক পরিবেশে প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হয়। মরিস পরে বলেন, প্রকল্পটিকে বাদ দেয়ার জন্য কিসিঞ্জার নিজে চাপ দিয়েছিলেন। তারপরও কিছু ফাইল ছিল যেগুলো সত্যিকারের জহুরির কাছে সোনার খনির মতোই মূল্যবান। এসব ফাইলে মূলত পেন্টাগন, সি.আই.এ এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের দেড় শ মার্কিন কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ছিল।

২১. ওয়াশিংটন সফরের সময় আমি ইউজেন বোস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। '৭৫ এর অভ্যুত্থানের সময় ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনকারী বোস্টার তখন ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সদর দপ্তরে কর্মরত। ঢাকায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বোস্টারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। একবার নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যানিয়েল ময়নিহান সংক্ষিপ্ত সফরে বাংলাদেশে গিয়ে আমাকে দেখা করতে বললে আমি বোস্টারের বাড়িতে যাই। ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত আমার একটি লেখা নিয়ে আলোচনা করতে ময়নিহান আমাকে ডেকেছিলেন। লেখাটিতে তার সম্পর্কে কিছুটা সমালোচনা ছিল। করমর্দনের পর লাউঞ্জের এক কোনার টেবিলে আমরা বসলাম। রাষ্ট্রদূত বোস্টার তার বাসভবনে আপ্যায়নের ফাঁকে তিন জনের মধ্যে এটি ছোটখাটো বৈঠকের আয়োজন করেন।

অবশ্য '৭৫ এর অভ্যুত্থানের পর আমি বোস্টারের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিনি। তাকে দেখার জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম না। আমি চেয়েছিলাম তাকে যে সব প্রশ্ন আমি করব সেগুলো আমার স্পষ্ট হওয়ার পরই যেন আমাদের দেখা হয়।

২২. ওয়াশিংটনে পৌঁছে আমি বোস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখলাম তিনিও সাক্ষাতের ব্যাপারে খুব আগ্রহী। বাংলাদেশ বিষয়ক আমার সব লেখা তিনি বছরের পর বছর ধরে পড়ে গেছেন। বৈঠকের দিনক্ষণ ঠিক হলো। কাই বার্ড ও আমি পররাষ্ট্র দপ্তরে বোস্টারের সঙ্গে দেখা করলাম। করমর্দনের পরপরই লাউঞ্জের কোনার একটি টেবিল দখল করলাম আমরা। এ টেবিল ঘিরেই সারা সকাল আমাদের মধ্যে গুরুগম্ভীর আলোচনা হলো। আমি বোস্টারকে বললাম, আমি জানার চেষ্টা করছি কীভাবে সেদিন অভ্যুত্থানটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আমি তাকে এও বললাম, আমার কাছে এ বিষয়ে তথ্য রয়েছে যে, ১৯৭১ সালেই মোশতাকের সঙ্গে কলকাতায় মার্কিন কর্মকর্তাদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এর জের ধরে তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় তাকে 'গৃহবন্দি করে।'

২৩. কলকাতায় মোশতাক ছিলেন যোগাযোগের মধ্যমণি। কিসিঞ্জার আওয়ামী লীগ সরকারের একটি নির্বাসিত অংশের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করেছিলেন, যাতে তাদের দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছানো যায়। তবে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে দেশ শাসন করতে দেয়া হবে। এ ধরনের কোনো প্রতিশ্রুতি পাকিস্তানিরা দেয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে, যা তখন বিশ্বে 'বাংলাদেশ' নামে পরিচিতি পেয়ে গেছে, যখন যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে শেখ মুজিব তখন পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দি।

২৪. মোশতাক প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারে তার উর্ধ্বতন সহকর্মীদের অগোচরেই মার্কিনিদের মাধ্যমে এ মধ্যস্থতার প্রক্রিয়া চালান। বিষয়টি জানাজানি হলে মোশতাকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ ওঠে এবং তাকে গৃহবন্দি করা হয়। আমি এ সব খবর জানতে পারি কলকাতায় মোশতাকের একজন প্রধান সহকর্মীর মাধ্যমে। এ সহকর্মীটি মোশতাকের ঐ মধ্যস্থতা পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিলেন। এ বিষয়টি কলকাতার তৎকালীন কনসাল জেনারেল হার্ব গর্ডনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নিশ্চিত হয়েছিলাম।

২৫. পররাষ্ট্র দপ্তরে সে দিনের বৈঠকে আমি বোস্টারকে বলেছিলাম, এ বিষয়টি খুবই কৌতুহলোদ্দীপক যে, চার বছর পর শেখ মুজিব খুন হলে মোশতাক একজন 'কিং' হিসেবে আবির্ভূত হলেন। এ কথা বলে কাই বার্ড ও আমি বুঝতে চাইলাম যুক্তরাষ্ট্র ও মোশতাক গ্রুপের মধ্যকার ১৯৭১ সালের সম্পর্কটির নবায়ন হয়েছিল, নাকি ঘটনাটি ছিল নিছকই কাকতালীয়। এক পর্যায়ে আমরা আসল প্রশ্নটি করলাম, যে মহলটি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ও তা সংঘটিত করে তার

সঙ্গে মার্কিন দূতাবাসের কি আগে থেকে কোনো ধরনের যোগাযোগ ছিল? আমরা ভেবেছিলাম বোস্টার যথারীতি কূটনৈতিকসুলভ জবাব দেবেন, যা আমাদের কোনো কাজেই লাগবে না।

২৬. বোস্টার আমাদের চোখে চোখ রাখলেন এবং এমন কিছু তথ্য দিলেন, যা শুনব বলে আমরা আশাও করিনি। আমার মনে হলো বোস্টার একটি বোমা ফাটালেন। পরে বিষয়টি আমরা এভাবে লিখলাম : "নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মার্কিন দূতাবাসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান, ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে কিছু লোক শেখ মুজিবুর কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে। দূতাবাস সূত্রমতে, ১৯৭৪-এর নভেম্বর থেকে ১৯৭৫-এর জানুয়ারির মধ্যে দূতাবাস কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাদের কয়েক দফা বৈঠক হয়। উর্ধ্বতন ওই দুতাবাস কর্মকর্তা আরো জানান, '৭৫-এর জানুয়ারিতে দূতাবাসের মধ্যে আমরা একটি সমঝোতায় আসি যে, আমরা এ বিষয়টি থেকে এবং এ সব লোক থেকে দূরে থাকব। তবে জানুয়ারি থেকে আগস্টের ('৭৫) মধ্যে এ লোকগুলোর কেউ দূতাবাসে এসেছিল কি না তা আমি বলতে পারছি না। ঐ সময়ের আগে তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল।"

২৭. আমাদের প্রতিবেদনের এ বিশেষ বিবৃতির উৎস ছিলেন ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনকারী এই ইউজেন ডেভিস বোস্টার। বোস্টার সেদিন আমাদের আরো অনেক কথাই বলেছিলেন। তিনি নিশ্চিত করেন যে, ১৯৭৪ এর নভেম্বর থেকে ১৯৭৫–এর জানুয়ারি মাসের মধ্যে দূতাবাস কর্মকর্তাদের সঙ্গে যে লোকগুলো বৈঠক করে তারা আসলে মোশতাক গ্রুপেরই লোক। বোস্টার আরো বলেন, '৭৫ এর জানুয়ারিতে তিনি দূতাবাসের সবার প্রতি কঠোর নির্দেশ জারি করেন কেউ যেন আর ভবিষ্যতে এই গ্রুপ কিংবা অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রকারী আর কোনো গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখে। এ নির্দেশ সি.আই.এ স্টেশন চিফ ফিলিপ চেরি এবং তার সব স্টাফের জন্যও প্রযোজ্য ছিল।

২৮. বোস্টারের ধারণা, সম্ভবত রাষ্ট্রদূত হিসেবে তার কর্তৃত্বকে পাশ কাটিয়ে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে। ঠিক যে লোকগুলোর সঙ্গে সব ধরনেরর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তারাই অভ্যুত্থানের দিক দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয় এবং ক্ষমতা গ্রহণের ঘোষণা দেয়। এ যোগসূত্র থেকে বোস্টার মনে করেন, এটি একটি সরল কাকতালীয় ঘটনা নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। আমরা বোস্টারকে প্রশ্ন করেছিলাম, তার অগোচরে ফিলিপ চেরি কিংবা সি.আই.এ স্টাফরা শেখ মুজিবকে অপসারণের ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছিল কি না। বোস্টার বলেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাইরে গিয়ে তাত্ত্বিকভাবে আমি প্রশ্নটির জবাব দিতে চাই। আমি বলব, না স্টেশন চিফ এ ধরনের কোনো কাজ করেননি, তবে একজন আমেরিকান হিসেবে আরেকজন আমেরিকানকে বলব, যোগাযোগটা ছিল। আসলে অনেক ফাঁক-ফোকর ছিল। স্টেশন চিফের দায়িত্ব হচ্ছে তার সব

কর্মকাণ্ড বা যোগাযোগের ব্যাপারে আমাদের অবহিত রাখা। রাষ্ট্রদূতের অনুমোদনবহির্ভূত কোনো যোগাযোগ চেরি বাইরের কারো সঙ্গে র খেননি—এ গ্যারান্টি আমি দিতে পারি না। এখানে আমরা একমত হই যে বোস্টার 'রাষ্ট্রদূত' বলতে নিজেকেই বুঝিয়েছেন। বোস্টার নিশ্চিত ছিলেন যে, ঐ যোগাযোগ অব্যাহত ছিল এবং অভ্যুত্থানটি যারা করেছে, তারা ভেবেছিল মুজিব চলে গেলেই যুক্তরাষ্ট্র তাদের গ্রহণ করবে। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে আমরা জানব তারা কারা ছিল, তবে তারা সফল হলে যুক্তরাষ্ট্র তাদের স্বীকৃতি দেবে।

২৯. সেটা ছিল একটা ব্যতিক্রমী মুহূর্ত। মার্কিন রাষ্ট্রদূত দুই মার্কিন সাংবাদিকের কাছে অভিযোগ করলেন, তার সুস্পষ্ট নির্দেশের বাইরে গিয়ে তার . সি.আই.এ স্টেশন প্রধান অভ্যুত্থানে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে।

৩০. একই সঙ্গে আমরা এটাও ভাবছিলাম, ওয়াশিংটন ও ল্যাংলেতে কার এমন কর্তৃত্ব ছিল যিনি 'সবুজ সংকেত' দিয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রদূতের নির্দেশনা বাতিল করেছিলেন। এক বছর আগে রিচার্ড নিক্সনের পদত্যাগ এবং জেরাল্ড ফোর্ড দুর্বল মার্কিন রাষ্ট্রপতি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পর ওয়াশিংটনে 'পররাষ্ট্রনীতির কাণ্ডারি' বলতে একজনই ছিলেন এবং তিনি হেনরি কিসিঞ্জার। কিন্তু ছোট ছোট দেশকে শক্তিধর রাষ্ট্রের অনুগত করার জন্য হেনরি কিসিঞ্জার কি এ ধরনের অভ্যুত্থানকে বিবেচনায় রাখবেন?

৩১. কিসিঞ্জার বাংলাদেশ থেকে এত দূরে থেকে কিভাবে সামরিক অভ্যুত্থান পরিকল্পনার অস্পষ্ট দিক সম্পর্কে অবগত হতেন, সে বিষয়টিকে আমি ব্যক্তিগতভাবে সংশয়ে ছিলাম। কিসিঞ্জারের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সাবেক সহযোগী রজার মরিসের সাক্ষাৎকার নেয়ার পরও আমার মধ্যে আরো কিছু সময় এ সংশয় ছিল। তিনি সেই রজার মরিস, যিনি তার সাবেক নিয়োগকর্তা সম্পর্কে সমালোচনামুখর একটি জীবনী লিখেছিলেন। জীবনীগ্রন্থটির নাম ছিল 'আনসার্টেন গ্রেটনেস : হেনরি কিসিঞ্জার অ্যান্ড আমেরিকান ফরেন পলিসি'।

৩২. ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ ও হেনরি কিসিঞ্জার সম্পর্কে কথা বলার জন্য মরিসের সঙ্গে বসেছিলাম। তার সঙ্গে কেউ একমত হন বা না-ই হন তার মন্তব্যগুলো ছিল সুনির্দিষ্টভাবে অকাট্য। মরিসের পর্যবেক্ষণ এবার তুলে ধরা যাক—

৩৩. ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে আমি আমার বইয়ের জন্য একজনের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম, যিনি তখন কিসিঞ্জারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও সবচেয়ে সিনিয়র আস্থাভাজন ছিলেন। আমার সঙ্গে তার ভালোই জানাশোনা ছিল। কিসিঞ্জারের নীতির সমালোচনা করে নয়, বরং গুরুত্বের সঙ্গেই তিনি বললেন, কিসিঞ্জার যুগে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির তিনটি প্রতিশোধের ঘটনা ঘটেছে। কিসিঞ্জারের বিদেশী শত্রুর তালিকায় সবচেয়ে ঘৃণিত তিন ব্যক্তি ছিলেন চিলির আলেন্দে, ভিয়েতনামের থিউ এবং বাংলাদেশের শেখ মুজিব। এটা বন্ধু বা শত্রু অথবা প্রতিপক্ষের বিষয়

ছিল না। আসলে এই লোকগুলো নানাভাবে বাধা হয়ে উঠেছিল। আলেন্দের বিষয়টি পরিষ্কার। স্বাভাবিকভাবে তিনি থিউর কথা ভেবেছিলেন; কারণ বর্তমানের রেকর্ড ঘেঁটে দেখা যায়, উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে কোনো সমঝোতার জন্য থিউ প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিলেন। সায়গনে গিয়ে বোমা মেরে কিংবা অন্য কোনোভাবে থিউকে সমঝোতায় সম্মত করাতে কিসিঞ্জার চেয়েছিলেন।

৩৪. মুজিব তাদের এই দলভুক্ত নন। তা সত্ত্বেও কিসিঞ্জার সেই সময় (১৯৭১) অনুভব করেছিলেন যে, তার চীনানীতি, যার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছিল, সেটিকে ক্ষতি করার মতো বিপর্যয়কর অবস্থা বিরাজ করছিল পূর্ব পাকিস্তানে। ভিয়েতনাম আলোচনার অনেক কিছুই তখন বাকি ছিল। অথচ এখানকার পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল বিরক্তিকর। কিসিঞ্জারের মনে হচ্ছিল, এখানে একজন রাজনীতিক যথাযথ আচরণ করছিলেন না। বোঝাপড়ার পরিবর্তে তার লোকজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। তবে বিষয়টা এমন নয় যে, তা হেনরি কিসিঞ্জার অথবা তার বিশ্ব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেবে। তা সত্ত্বেও এটি কিসিঞ্জানের কূটনীতির ব্যক্তিগত বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং এক পর্যায়ে তা প্রতিশোধের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়।

৩৫. মরিস বলতে লাগলেন, কেউ কেউ মনে করেন হেনরি কিসিঞ্জার উনিশ শতকের একজন গতানুগতিক কূটনীতিক। কারণ তার আদর্শিক গুরু, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব এবং নায়করা সব উনিশ শতকের। তাহলে কেউ মনে করতে পারেন, তার নীতি হবে এমন, 'স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু বলে কিছু নেই, আছে শুধু স্থায়ী স্বার্থ। "এ নীতির ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র তাৎক্ষণিকভাবে শেখ মুজিবকে স্বাগত জানাতে পারত, তার সরকারকে কাছে টেনে রাখতে পারত। কিন্তু আমি যেমন বলেছি, কিসিঞ্জার ছিলেন প্রতিশোধপরায়ণ লোক এবং ভাবতেন যে মুজিব আমাদের লোক নয়। যদি তিনি আমাদের লোক না হয়ে থাকেন, তাহলে স্থায়ী স্বার্থ বলেও কিছু নেই। এখন যেটা করতে হবে তাহলো, আমাদের লোকজনকে ক্ষমতায় বসাতে হবে এবং তাদের উৎখাত করতে হবে। ঐ সময়ের মার্কিনিদের নথিপত্রে লজ্জা-শরম বা দ্বিধা-সংকোচের কোনো উপাদান কেউ খুঁজে পাবে না। বাংলাদেশর বিষয়টি তত বড় নয়, এ নিয়ে কোনো শোরগোলের ব্যাপার নেই এবং সেখানে কিছু ঘটানো খুবই সহজ।

৩৬. আমি মরিচের তত্ত্বের বিষয়ে এখনো সংশয়ে আছি। ১৯৭৯ সালের এপ্রিলে কাই বার্ড ও আমি হেনরি কিসিঞ্জারকে লেখা এক চিঠিতে ১৯৭১ সালে খন্দকার মোশতাক গোষ্ঠীর সঙ্গে গোপন যোগাযোগের বিষয়ে সাতটি প্রশ্ন করেছিলাম। আমরা জানতে চেয়েছিলাম, ১৯৭৪–৭৫ সালে অভ্যুত্থানের আগের মাসগুলোর মার্কিন দূতাবাস কর্মকর্তাদের সঙ্গে মোশতাক গোষ্ঠীর যোগাযোগের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে তিনি অবগত ছিলেন কি না। ১৯৭৪ সালে মোশতাক গোষ্ঠীর সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ ও অভ্যুত্থানের সময় কিসিঞ্জার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। মোশতাক ও তার অভ্যুত্থান

পরিকল্পনাকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ রাখতে রাষ্ট্রদূত বোস্টারের নির্দেশ সম্পর্কে কিসিঞ্জারের অবহিত থাকার কথা। কারণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার সুবাদে সব ধরনের চিঠিপত্র দেখা ও পড়ার সুযোগ তার ছিল।

পরের মাসে কিসিঞ্জার জবাবে আমাদের বিরুদ্ধে 'বিস্ময়কর চিঠি'র অভিযোগ তুলে বললেন, আমাদের প্রেস ডেডলাইন অনুযায়ী উত্তর দেয়ার জন্য তাকে যথেষ্ট সময় দেয়া হয়নি। তিনি বলেন, 'দোষারোপ আর অস্পষ্ট ধারণার মিশ্রণে লেখা আপনাদের অস্বাভাবিক চিঠিটির কোনো জবাব আমি দিতে পারি না। শুধু এটাই বলতে পারি, বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি সত্য থেকে অনেক দূরে। আমি আপনাদের তথ্য সরবরাহকারীর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছি। কিসিঞ্জারের এ জবাবের পর আমরা জুনে আবার লিখলাম, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে একটা নিবন্ধ লিখব। সে ক্ষেত্রে প্রেস ডেডলাইন নিয়ে তার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। আমাদের ধৈর্য আছে। তার কাছে শুধু প্রশ্নগুলোর উত্তর চাই।

৩৭. জুন মাসের চিঠিতে আমরা কিসিঞ্জারকে বললাম, আপনি প্রশ্নগুলোকে 'সত্য থেকে অনেক দূরে' বললেও আমরা তা মনে করি না। বরং সত্য জানার জন্যই প্রশ্নগুলো তৈরি করা হয়েছে। যথার্থ সত্য জানার জন্য আমাদের অন্য কোনো পদ্ধতি জানা নেই। কোন বিষয় বা ঘটনা, নাম অথবা ঘটনাক্রমের সঙ্গে আপনি একমত নন, সেটাই বরং আমরা জনতে চাই। ১৯৭১ সালের যোগাযোগ ও ১৯৭৪ সালের যোগাযোগ সম্পর্কে আপনার মনোভাব কি? আমাদের মতে, 'বিস্মিত হওয়াটা চিঠির কোনো সুনির্দিষ্ট জবাব হলো না। ২৬ বছর পর কিসিঞ্জার এখনো চিঠির জবাব তৈরি করতে পারেনি। এর মধ্যে কত 'প্রেস ডেডলাইন' এসেছে আর গেছে!

৩৮. আমাদের মূল চিঠিতে আমি কিসিঞ্জারকে এ কথা লিখতে ভুলে গেছি যে, ১৯৭৬ সালে পুরান ঢাকার বাসায় খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে চা খেতে খেতে সাক্ষাতের সময় তাকেও এই প্রশ্ন করেছিলাম। এ সাক্ষাৎটি হয়েছিল মুজিব হত্যাকাণ্ড এবং জিয়াউর রহমান তাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার পর। প্রশ্ন শুনে মোশতাক দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, আমি তাকে এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারি না। তিনি আমাকে বললেন, এ সব প্রশ্ন বিষয়ে মোশতাকের বক্তব্য শুনে কিসিঞ্জার বিস্মিত হতেন। যে কোনভাবেই হোক আমার মনে হচ্ছিল, আমাদের প্রশ্নের যে উত্তর তারা দেবে তাতে বেশ পার্থক্য থাকবে।

৩৯. পররাষ্ট্র দপ্তরে আমরা ইউজেন বোস্টারের সাক্ষাৎকার নেয়ার পর নিজস্ব কারণেই তিনি ঐ সময় প্রকাশ্যে এ বিষয়ে কিছু বলতে চাননি। সম্ভবত এ কারণে যে, এ সব ঘটনায় নাটের গুরু কিসিঞ্জারের যোগসূত্র পরিষ্কার হচ্ছিল না। পরবর্তী কয়েক বছর আমি রাষ্ট্রদূত বোস্টারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। এ বিষয়ে নানা অগ্রগতি ও নতুন নতুন মোড় সম্পর্কে লেখা বিভিন্ন নিবন্ধ ও চিঠি পাঠিয়েছি।

৪০. ঢাকায় ১৯৭৫ সালের ঘটনাবলির বিষয়ে কংগ্রেসীয় তদন্তের জন্য আমার

প্রচেষ্টা সম্পর্কে বোস্টার জানতেন। আমরা জানতাম, মার্কিন রাজনীতিতে বাংলাদেশ চিলি, ভিয়েতনাম কিংবা ইরান নয়। কয়েক বছর আগে ওয়াশিংটনে থাকাকালে আমি তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ঐ সময় আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, তিনি যা জানেন তা প্রকাশ করাই শ্রেয়। তিনি আমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেন না, বরং তার মনোভাব এমন ছিল যে 'আমার বেঁচে থাকতে নয়।' এ কথার মাধ্যমে আমি বুঝলাম, তার মৃত্যুর পরই আমি সূত্র হিসেবে তার নাম ব্যবহার করতে পারব।

৪১. চলতি বছর আমি ভার্জিনিয়ায় তার সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা করেছিলাম। গত মাসের (জুলাই) তৃতীয় সপ্তাহে তার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। অভ্যুত্থানের ত্রিশতম বার্ষিকী সামনে রেখে তার একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করার জন্য তাকে রাজি করাব, কিন্তু তা আর হলো না। ইউজেন বোস্টার গত ৭ জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন। আমি আবারও মাত্র দুই সপ্তাহের জন্য তার সঙ্গে সাক্ষাতর সুযোগ হারালাম।

৪২. সি.আই. এর স্টেশন-প্রধান যে সব ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং যেগুলোর সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন, সে বিষয়ে খুব কমই 'অন দ্য রেকর্ড' সাক্ষাৎকার রয়েছে। সেটা ছিল এক অস্বাভাবিক সময় এবং বর্তমানে এটা ধারণাতীত যে একজন প্রতিবেদক এবং একজন সি.আই.এ কর্মকর্তা এ রকম একটি বিষয় নিয়ে মুক্ত ও খোলামেলা আলোচনা করতে পারেন। ফিলিপ চেরি ১৯৭৫ সালের আগস্টে ঢাকায় সি.আই.এর স্টেশন প্রধান ছিলেন। ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে তার সঙ্গে অভ্যুত্থান বিষয়ে আমার কথা হয়, তখন তিনি নাইজেরিয়ার সাবেক রাজধানী লাগোসে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র থেকে আমরা অভ্যুত্থানে জড়িত থাকার বিষয়ে যে অভিযোগ পেয়েছিলাম, সে সম্পর্কে আমি তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম। আমরা টেলিফোনে প্রায় ২০ মিনিট কথা বলি।

৪৩. মুজিব সরকারকে উৎখাতের পরিকল্পনাকারী কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি অথবা তার দপ্তরের কেউ যোগাযোগ রেখেছিলেন বলে সে অভিযোগ ওঠে, তা তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করেন। চেরি আমাকে বলেন, "বাংলাদেশীরা নিজেরাই এটি করেছে।" বাইরের সরকারগুলোর সম্পৃক্ততার কারণে যে কোনে অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়, এ ধরনের চিন্তাভাবনা খুবই ভুল বলে তিনি মন্তব্য করেন। চেরি বলেন, জনগণ নিজেরাই সব সময় অধিকাংশ অভ্যুত্থান সংগঠিত করে।

৪৪. যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মোশতাকের নেটওয়ার্কের গোপন যোগাযোগের আগের ইতিহাস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে চেরি বলেন, "রাজনীতিবিদরা প্রায়ই দূতাবাসগুলোয় যান এবং সম্ভবত তাদের সেখানে যোগাযোগ থাকে। তারা ভাবেন, তাদের এ ধরনের যোগাযোগ আছে। কিন্তু কোনো দূতাবাস অভ্যুত্থানে সম্পৃক্ত থেকে তাদের সহযোগিতা করবে, এটা খুবই অচিন্তনীয় ব্যাপার। চেরি দাবি করে,

তিনি মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজেন বোস্টারের পুরোপুরি তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমরা জানতাম, মুজিব বিপদের মধ্যে আছেন। আমরা এ-ও জানতাম, সেখানে যা-ই হোক, আমাদের কিছু যায়-আসে না। কে মুজিবকে ক্ষমতাচ্যুত করল বা কী কারণে মুজিব ক্ষমতাচ্যুত হলেন, সেটাও আমাদের বিবেচনার বিষয় নয়। আরো জানতাম, এ ঘটনার জন্য আমাদের দায়ী করা হবে। তাই ভীষণ পরিষ্কার থাকার জন্য আমরা অতিরিক্ত সতর্ক ছিলাম। রাষ্ট্রদূত বোস্টারের নির্দেশনা মেনে চলার বিষয়টি আমরা নিশ্চিত করেছিলাম। সব ধরনের যোগাযোগ আমরা বন্ধ করেছিলাম। আমরা পুরোপুরি রাষ্ট্রদূত বোস্টারের নির্দেশনা অনুসরণ করেছিলাম।

৪৫. যদিও বোস্টার নিজেই এই মত প্রকাশ করেছিলেন, যে ১৯৭৫ এর প্রথমদিকে তিনি যে ধরনের নির্দেশনা দিয়েছিলেন, সি.আই. এর স্টেশন প্রধান সে অনুযায়ী এ ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করেননি। এটা সম্পূর্ণ বোস্টারের নিজের মতামত। যখন আমি চেরিকে জিজ্ঞেস করি, দূতাবাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা কেন এ ধরনের অভিযোগ করেন, তখন চেরি বারবার দাবি করেন, এ ধরনের অভিযোগ 'সম্পূর্ণ মিথ্যা'। নিজের পক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, "সেখানে সম্ভবত কেউ ছিলেন, যিনি কারো কারো ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। এ কারণে এখন তিনি এ ধরনের বিবৃতি দিচ্ছেন, কিন্তু আমি আপনাকে সাক্ষী রেখেই এ বিষয়ে তার সঙ্গে মোকাবিলা করা এবং আলোচনার সুযোগ নিতে আগ্রহী।"

৪৬. ফিলিপ চেরি অবশ্য এ ধরনের সুযোগ পাননি। রাষ্ট্রদূত বোস্টার যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন, তখন তিনি উদ্ধৃত হতে বা 'অন দ্য রেকর্ড' চিহ্নিত হতে অনিচ্ছুক ছিলেন। আমার ধারণা, যুক্তরাষ্ট্রে তখন যে ধরনের পরিবেশ বিরাজ করছিল, রাষ্ট্রদুত সে পরিস্থিতিতে একটি তদন্ত আশা করেছিলেন। অবশ্যই এ ধরনের তদন্তের নিশ্চয়তা ছিল না, কেবল সম্ভাবনা ছিল। চার্চ এবং পাইক কমিটির প্রতিবেদনের কারণে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রে একটা মনোভাব তৈরি হচ্ছিল। যদি কংগ্রেসের কোনো তদন্ত হতো, এটা আমার বিশ্বাস যে রাষ্ট্রদূত বোস্টার এ বিষয়ে এগিয়ে আসতেন এবং শপথ নিয়ে সাক্ষ্য দিতেন।

৪৭. ১৯৭৮ সালে সাক্ষাৎকারে চেরির বক্তব্যের সঙ্গে ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বক্তব্যে মিল পাওয়া যায়নি। পররাষ্ট্র দপ্তর কংগ্রেসম্যান, স্টিফেন সোলার্জের কাছে স্বীকার করে, ১৯৭৪ সালের নভেম্বর এবং ১৯৭৫–এর জানুয়ারির মধ্যে অবশ্যই বৈঠক হয়েছিল। আর ঠিক এ বিষয়টি কয়েক বছর আগেই দূতাবাসে আমাদের প্রধান সূত্র (ইউজেন বোস্টার) সঠিকভাবেই এ তথ্য জানিয়েছিলেন। সোলার্জের বক্তব্যকে নাকচ করে যে, "কোনো বাংলাদেশী আমাদের অফিসে আসেননি এবং অভ্যুত্থান বা অন্য কোনো বিষয়ে পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলেননি।"

৪৮. প্রথমেই দুটি সম্ভাব্য বিকল্পের একটি চিন্তায় আসে। জানুয়ারির পরেও মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে হয় মোশতাক গোষ্ঠীর লোকজন যোগাযোগ অব্যাহত

ছিল যেটা বোস্টার বিশ্বাস করতেন; অথবা চেরির দাবিমতে, এ যোগাযোগ ছিল না। যদিও এখানে তৃতীয় একটি সম্ভাবনা থেকে যায়। চেরি যদি সত্য বলে থাকেন, যা এখনো অস্পষ্ট রয়ে গেছে, এটা সম্ভব যে মোশতাকের সহযোগীরা ওয়াশিংটনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি স্বাধীন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর এটা করা হয়েছিল দূতাবাস বা সি.আই. এর চ্যানেলকে পাশ কাটিয়ে।

৪৯. এভাবে সম্ভবত চেরি রাষ্ট্রদূত বোস্টারের নির্দেশ অনুসরণ করেছিলেন। আর পূর্ব চ্যানেলের বাইরেও যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। এটা সম্ভব যে মোশতাকের সহযোগীদের কেউ বাংলাদেশ থেকে বাইরে যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্য কোথাও গিয়ে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক করেন। পেন্টাগনের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার অ্যাটাসে বা কর্মকর্তাদের দ্বারা এটি সম্ভব। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তাদের গভীর ঐতিহাসিক যোগাযোগ রয়েছে। এরাও অভ্যুত্থান পরিকল্পনা তদারকি করতে থাকতে পারে।

৫০. এই পরস্পরবিরোধী দাবিগুলো আধাবিচারিক ক্ষমতাসম্পন্ন কংগ্রেসনাল তদন্তের মাধ্যমে নিস্পত্তি হতে পারত। বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের বিষয়ে কংগ্রেসম্যান স্টিফেন সোলার্জ এবং তার সহযোগী স্ট্যানলি রোথের চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো তদন্ত পর্যন্ত হয়নি।

৫১. বাংলাদেশ থেকে পাওয়া আরো কিছু প্রামাণিক তথ্যে জানা গেছে, মার্কিন কর্মকর্তারা অভ্যুত্থান পরিকল্পনাকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং অভ্যুত্থান ঘটানোর আগ পর্যন্ত এ পরিকল্পনার উপর নজর রাখতেন। অভ্যুত্থান ঘটানোর আগ পর্যন্ত এ পরিকল্পনার উপর নজর রাখতেন। অভ্যুত্থান পরিকল্পনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও এ বিষয়ে সরাসরি অবগত ছিলেন, এমন এক নির্ভরযোগ্য সূত্রের সঙ্গে আমি ১৯৯৭ সালে সাক্ষাৎ করি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এ কর্মকর্তা আগস্টের অভ্যুত্থান পরিকল্পনার ভেতরে থেকে নিখুঁতভাবে এ কাজ করেছেন এবং ধাপে ধাপে এ পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়েছেন। ১৯৭৫ সালেও ঐ ব্যক্তির সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং আবার দেখা করব বলে আশা করেছিলাম।

৫২. আমাদের মধ্যে সে সাক্ষাৎ হয়েছে ঠিকই, তবে এর মধ্যে কেটে গেছে দুই দশকেরও বেশি সময়। তিনিই মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ জানান। তার নিজের প্রয়োজনেই আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। মধ্যস্থতাকারী যাতে আমি বিশ্বাস করতাম, তার মাধ্যমে দীর্ঘ কথাবার্তার পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে রওনা হলাম এবং একটি ইউরোপীয় দেশের রাজধানীতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনিও অন্য এক মহাদেশ থেকে এসেছিলেন। আমরা পাঁচ ঘণ্টা ধরে কথা বললাম।

৫৩. তার সঙ্গে অনেক বিষয়েই কথা হয়েছে। অভ্যুত্থানের ছয় মাসেরও আগে থেকে মোশতাক ও জেনারেল জিয়াউর রহমান উভয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং

মেজরদের সঙ্গে তাদের আলোচনার ব্যাপারে তার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জানা হলো। মেজর রশিদ আলাদাভাবে জিয়া ও মোশতাকের সঙ্গে যে সব বৈঠক করতেন, তেমন অনেক বৈঠকেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৭৬ সালের আগস্টে মেজর রশিদ একটি ব্রিটিশ টেলিভিশনকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। দ্য সানডে টাইমসের সাংবাদিক এন্থনি মাসকারেনহাসের নেয়া সে সাক্ষাৎকারে জেনারেল জিয়ার সঙ্গে ১৯৭৫ সালের ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত এক বৈঠকের বিবরণ দেন রশিদ। অভ্যুত্থানের পাঁচ মাস আগের ঐ বৈঠকে অভ্যুত্থান পরিকল্পনার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল বলে রশিদ জানান। অভ্যুত্থানের পাঁচ মাস আগে সে বৈঠক হয়েছিল। আমার এই সূত্র সে বৈঠকে উপস্থিত ছিল এবং দাবি করেন, এটা অভ্যুত্থান পরিকল্পনা বিষয়ে প্রথম বৈঠক ছিল না।

৫৪. সে সময় সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান জেনারেল জিয়া প্রস্তাবিত অভ্যুত্থান পরিকল্পনার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে সামরিক তৎপরতার নেতৃত্ব দিতে অনাগ্রহ দেখান। রশিদ জেনারেল জিয়াকে বলেন, জুনিয়র কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে একটি পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছে, এরা শুধু তার সমর্থন আর নেতৃত্ব চায়। জিয়া কিছুটা সময় নিলেন। মাসকারেনহাসকে দেয়া মেজর রশিদের সাক্ষাৎকারের তথ্য এবং আমার সেই সূত্রমতে, জিয়া রশিদকে বলেছিলেন, একজন সিনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে তিনি এতে সরাসরি জড়িত হতে চান না। তবে জুনিয়র কর্মকর্তারা যদি প্রস্তুতি নিয়েই ফেলে, তাহলে তাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত।

৫৫. আমার তথ্যদাতার মতে, মেজররা শেষ পর্যন্ত আশা করেছিলেন যে জিয়াই অভ্যুত্থনের নেতৃত্ব দেবেন। যদিও তারা মোশতাকের সঙ্গে সারাক্ষণ সতর্ক যোগাযোগ রেখেছিলেন, কিন্তু তারা চাইছিলেন এমন একটা ভালো উপায়, যা মোশতাককে নতুন সরকারের প্রধান করবে না। মেজরদের দিক থেকে সবচেয়ে ভালো উপায়টি ছিল অভ্যুত্থানের পর কর্তৃত্বকারী হিসেবে একটি সামরিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা। বস্তুতপক্ষে মেজর রশিদই তার গোষ্ঠীর জন্য উপায়গুলো নির্ধারণের জন্য দায়িত্বে ছিলেন। তাদের আশা ছিল, জিয়াই এ ধরনের কাউন্সিলের নেতৃত্ব দেবেন। তবে সম্ভবত জুনিয়র কর্মকর্তারা জিয়ার নেতৃত্বে সিনিয়র কর্মকর্তাদের অভ্যুত্থান আশা করছিলেন। জেনারেল জিয়ার নিরপেক্ষতা অথবা নীরব সমর্থন নিশ্চিত হলে জুনিয়র কর্মকর্তারা শঙ্কামুক্ত থাকতে পারেন যে, সংকটের মুহূর্তে জিয়া তার বাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবেন না।

৫৬. আমার গুরুত্বপূর্ণ সেই সূত্র একটি চমকে দেয়া তথ্য জানিয়ে বললেন, জিয়া ও মোশতাকের সঙ্গে আলাদা দুটি বৈঠকে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে মেজর রশিদ নিজেই প্রশ্ন তুললেন, পরিকল্পিত অভ্যুত্থানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব কী হবে? ঐ সামরিক কর্মকর্তা জানালেন, জিয়া ও মোশতাক উভয়েই আলাদাভাবে আমাদের বললেন, তারা এ বিষয়ে মার্কিনিদের মনোভাব জেনেছেন।

দুই জনের উত্তরই একই রকম ছিল। তারা বললেন, এটা (মুজিবকে সরানো) মার্কিনিদের জন্য কোনো সমস্যা নয়। আমি তখন অনুভব করলাম, মার্কিনিদের সঙ্গে জিয়া ও মোশতাকের আলাদা যোগাযোগের চ্যানেল রয়েছে। পরে আর এ বিষয়ে কথা হয়নি।

৫৭. মেজররা শেষ পর্যন্ত আশা করেছিলেন, অভ্যুত্থানের পরপরই যে সামরিক কাউন্সিল গঠিত হবে, জিয়া তার নেতৃত্ব দেবেন। এমনকি ১৫ই আগস্টও তাদের বিশ্বাস ছিল, এখনো সে সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এই সূত্র জানান, যখন শেখ মুজিব ও তার অন্য আত্মীয়দের বাড়িতে পুরুষদের পাশাপাশি নৃশংসভাবে নারী-শিশু গণহত্যা ঘটে গেল, তখনই জেনারেল জিয়া ছায়ার আড়ালে পিছিয়ে যান।

৫৮. সূত্রমতে রশিদ নিজেও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মর্মাহত হয়েছিলেন। পরবর্তী কয়েক বছর তার মধ্যে এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে অভ্যুত্থান পরিকল্পনার মধ্যেও আরো একটা 'লুকানো পরিকল্পনা' ছিল যেটা সম্পর্কে তিনি জানতেন না বা এর উপর তার নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তা সত্ত্বেও দুই জুনিয়র সেনা কর্মকর্তা রশিদ ও ফারুক জনসমক্ষে হত্যাকাণ্ডের দায় অস্বীকার করেননি। বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখেও তারা তাদের অনুগত এ ছোট সেনাদলের কাজের দায় নিয়েছেন।

৫৯. এই সূত্র দাবি করেছেন, কিছু হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা ১৫ আগস্ট দিনটির জন্যই করা হয়েছিল। কথা ছিল কমপক্ষে চার জন আওয়ামী লীগ নেতাকে তাদের বাসভবন থেকে তুলে সুনির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে হত্যা করা হবে। এ পরিকল্পনায় শেখ মুজিবকে হত্যা করার বিষয়টিও ছিল। তবে সূত্র দাবি করেন, এরপরও অভ্যুত্থান সংগঠক কর্মকর্তাদের এমন কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল না যে তারা পরিবারগুলোর উপর গুলি চালাবে। এই ধরনের অন্যান্য পরিস্থিতির মতো সেদিনও অনকাঙ্ক্ষিত বর্বরতা ঘটে যায়।

৬০. অভ্যুত্থানের পর পরস্পরবিরোধী যে ধারণা জন্মেছিল, তা নিয়ে খুব কম বিশ্লেষণ হয়েছে। অভ্যুত্থানের দুই বছর আগে থেকে দেশের বামপন্থি দল, যেমন- জাসদ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), সর্বহারা পার্টির মতো গোপন দলগুলো মুজিব শাসনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করেছে। কিন্তু বামপন্থিদের 'বিপ্লব' যেমনটি আশঙ্কা করা হচ্ছিল, তা শেখ মুজিবের পতন ঘটায়নি বরং ষড়যন্ত্রটা করেছিল ডানপন্থিদের একটি সংকীর্ণ গোষ্ঠী।

৬১. কট্টরপন্থি জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো যে চ্যালেঞ্জ গড়ে তুলেছিল এবং এগিয়ে নিয়েছিল, আগস্টের ঘটনা তাতে আরো গতিসঞ্চার করে। এ অভ্যুত্থানটি ঘটিয়েছিল মুজিবের নিজের দল, তার মন্ত্রিসভা, তার সচিবালয়, তার জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং জাতীয় সেনাবাহিনীর ডানপন্থি অংশ যারা মনে করছিল তাদের স্বার্থে বামপন্থি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মুজিবের নেতৃত্ব আর সক্ষম নয়।

## ২. পরিশিষ্ট

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের মধ্যে মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তিচুক্তি

শান্তি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবোধের একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এক আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্য এক যোগে সংগ্রাম, রক্তদান এবং আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার ফলশ্রুতি হিসেবে মুক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের বিজয় অভ্যুদয় ঘটিয়ে;

সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও সৎপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং উভয় রাষ্ট্রের সীমান্তকে চিরস্থায়ী শান্তি ও বন্ধুত্বের সীমান্ত হিসেবে রূপান্তরনের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে;

নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা, অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান প্রদর্শনের মূলনীতিসমূহের প্রতি দৃঢ়ভাবে অস্থাশীল থেকে;

শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এবং সম্ভাব্য সকল প্রকারের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে স্ব স্ব দেশের অগ্রগতির জন্য;

উভয় দেশের মধ্যকার বর্তমান মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক আরো সম্প্রসারণ ও জোরদার করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে;

এশিয়া তথা বিশ্বের স্থায়ী শান্তির স্বার্থের এবং উভয় রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে পারস্পরিক মৈত্রী ও সহযোগিতা আরো সম্প্রসারিত করায় বিশ্বাসী হয়ে;

বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনে এবং উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্য ও সামন্তবাদের অবশেষসমূহ চূড়ান্তভাবে নির্মুল করার জন্য প্রয়াস চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে;

আজকের বিশ্বের আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোর সমাধান যে শুধু মাত্র সহযোগিতার মাধ্যমে সম্ভব বৈরিতা ও সংঘাতের মাধ্যমে নয়– এ ব্যাপারে কৃতনিশ্চয় হয়ে;

রাষ্ট্রসংঘের সনদের নীতিমালা ও লক্ষ্যসমূহ অনুসরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পুনরুল্লেখ করে একপক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও অন্য পক্ষে ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বর্তমান চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অনুচ্ছেদ

এক : চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ স্ব স্ব দেশের জনগণ যে আদর্শের জন্য একযোগে সংগ্রাম এবং স্বার্থত্যাগ করেছেন, সেই আদর্শে অনুপাণিত হয়ে মর্যাদার সংগে ঘোষণা করেছেন যে, উভয় দেশ এবং তথাকার জনগণের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও মৈত্রী বজায় থাকবে। একে অপরের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে। চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষে উল্লেখিত নীতিমালার ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক সমতা ও সম্মানজনক নীতিসমূহের ভিত্তিতে উভয় দেশের মধ্যেকার বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সুপ্রতিবেশীসুলভ সার্বিক সহযোগিতার সম্পর্কের আরো উন্নয়ন জোরদার করবে।

দুই : জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি-সমতার নীতিতে আস্থাশীল থাকার আদর্শে পরিচালিত হয়ে চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ সর্বপ্রকারের উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের নিন্দা করছে এবং তাকে চূড়ান্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা পুনরুল্লেখ করছে।

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ উপরোক্ত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সংগে সহযোগিতা করার এবং উপনবেশবাদ ও বর্ণবৈষমবিরোধী সংগ্রামে জনগণের ন্যায়সংগত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমর্থন দান করবে।

তিন : বিশ্বের উত্তেজনা প্রশমন, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা মজবুত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে জোটনিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রতি তাদের অবস্থার পুনরুল্লেখ করছে।

চার : উভয় দেশের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাবলি নিয়ে চুক্তিকারী উভয়পক্ষ সকল স্তরে বৈঠক ও মত বিনিময়ের জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে।

পাঁচ : চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুবিধাজনক ও সর্বাত্মক সহযোগিতা শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করে যাবে। উভয় দেশের ক্ষমতা ও পারস্পরিক সুবিধার নীতির ভিত্তিতে বাণিজ্য, পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রসারিত করবে।

ছয় : বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী অববাহিকার উন্নয়ন এবং জল বিদ্যুৎ শক্তি ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে যৌথ সমীক্ষা পরিচালনা ও যৌথ কার্যক্রম গ্রহণে চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ অভিন্ন মত।

সাত : চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি খেলাধুলার ক্ষেত্রে সম্পর্কের প্রসার করবে।

আট : দুই দেশের মধ্যকার বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনুযায়ী চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ প্রত্যেকে মর্যাদার সঙ্গে ঘোষণা করছে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না বা অংশ নেবে না। অন্যর উপর আক্রমণ থেকেও নিবৃত্ত থাকবে এবং তাদের এলাকায় এমন কোন কাজ করতে দেবে না যা .ত চুক্তিকারী কোন পক্ষে ক্ষতি হতে পারে বা তা কোন পক্ষের নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

নয় : কোন এক পক্ষের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষ সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হলে চুক্তিকারী প্রত্যেককে এতদুল্লেখিত তৃতীয় পক্ষকে যে কোন প্রকার সাহায্য দানে বিরত থাকবে। তাছাড়া যে কোন পক্ষ আক্রান্ত হলে অথবা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে সেই আশংকা নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে যথাযথ সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে উভয়পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়ে নিজেদের দেশের শক্তি এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে।

দশ : চুক্তিকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ ঘোষণা করেছে, এই চুক্তির পক্ষে অসামঞ্জস্য হতে পারে এমন গোপন বা প্রকাশ্য এক বা একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে উভয়ের কেউই কোন অঙ্গীকার করবে না।

এগারো : এই চুক্তি পঁচিশ বছরের মেয়াদের জন্য স্বাক্ষরিত হলো। চুক্তিকারী উভয়পক্ষের পারস্পরিক সম্মতিতে চুক্তিমেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে। অত্র চুক্তি সই করার দিন থেকে কার্যকরী হবে।

বারো : এই চুক্তি কোন একটির বা একাধিক অনুচ্ছেদের বাস্তব অর্থ করবার সময় চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন মতপার্থক্য দেখা দিলে তা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার মনোভাবের দ্বারা শান্তিপূর্ণ আলোচনায় নিষ্পত্তি করতে হবে।

## ৩. পরিশিষ্ট

## সেনাবাহিনী ও গণবাহিনীর ৩ জন প্রাক্তন সদস্যের সাংবাদিক সম্মেলন

সেনাবাহিনীর ৩ জন সাবেক সদস্য বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখের সামরিক অভ্যুত্থান এবং সপরিবারে শেখ মুজিব হত্যার ব্যাপারে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এবং বর্তমান ডেমোক্রেটিক লীগে যোগদানকারী আওয়ামী লীগের তৎকালীন গ্রুপ দায়ী। ২১শে মে ১৯৮১তে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য প্রকাশকারী সেনাবাহিনীর ৩ জন সাবেক কর্মচারীর পরিচয় হচ্ছে সাবেক নায়েক সুবেদার মোহাম্মদ জলাল উদ্দিন, সহ–সভাপতি বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা (সাবেক গণবাহিনী) দফতর সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদ সদস্য জেলা জাসদ কমিটি, বগুড়া; সাবেক নায়েক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (আসাদ) সদস্য বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা সাবেক সভাপতি সরিষাবাড়ী থানা জাসদ, জামালপুর। গতকাল হতে তারা জাসদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে সাবেক নায়েক সুবেদার মোঃ জালাল উদ্দিন একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এতে বলা হয় যে, ১৯৭৫ সালে গুলশানের এক বাড়িতে শেখ হত্যার প্রস্তাব করা হয়েছিল। উক্ত নীল নক্‌শা মোতাবেকই তিনি সপরিবারে নিহত হন।

এই প্রেক্ষিতে প্রশ্ন রাখা হয় যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট অভ্যুত্থান এবং সপরিবারে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার জন্য জাসদ নেতৃবৃন্দ দায়ী কি না? উত্তরে জনাব জালাল উদ্দিন বলেন যে, বর্তমান ডেমোক্রেটিক লীগের কিছু নেতা যারা তৎকালে আওয়ামী লীগে ছিলেন ওরা এবং সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে জাসদ গুলশানের এক বাড়িতে উক্ত নীল নক্‌শা প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে জাসদকে পিছনে ফেলে বাদবাকীরা প্রথম অভ্যুত্থান সংঘটিত করে। জনাব জালাল উদ্দিন এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, ৭ই নভেম্বর অভ্যুত্থানের দিন সেনাবাহিনীর পোশাক পরিহিত অবস্থায় তিনি একটি বাহিনীর সহিত ঢাকায় ৫টি থানায় অস্ত্রোদ্ধারের জন্য গিয়েছিলেন। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি সাংবাদিকদের জানান যে, ১৯৮০ সালের জুন মাস হতে বিভিন্ন কারণে তার মোট ৬ বৎসর জেল হয়েছিল। সাংবাদিক সম্মেলনে পঠিত বক্তব্য হুবহু নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

প্রিয় সাংবাদিক ভাইয়েরা,

আমাদের আমন্ত্রণে আপনারা মেহেরবানী করে উপস্থিত হয়েছেন, সে জন্য প্রথমেই আমাদের সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

আপনারা জানেন আমরা ছিলাম তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য। ১৯৭১-এর আমরাও জীবনকে বাজী রেখে লড়াই করেছিলাম। বিজয়ের পর স্বভাবতঃই রাষ্ট্র পরিচালনার দায় দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা ফিরে গিয়েছিলাম ব্যারাকে।

আর ঠিক এমনি সময়ে ঝড়ের মতো আবির্ভূত হলো জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ। এই দলের নামের সঙ্গে হিটলারের ন্যাশন্যাল সোস্যালিষ্ট পার্টির নামের হুবহু মিল। জাসদ নেতাদের ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা জেনারেল সুজন সিং উবান কর্তৃক বিশেষ ট্রেনিং দান, ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার বোহরার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ইত্যাদি সব কিছুকে ছাপিয়ে যে মুহূর্তে আমাদের নজর এল জাসদের তারুণ্য, সমাজতন্ত্রের বক্তব্য ও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দুঃসাহস। স্বভাবতঃই আমরা এদের সঙ্গে ক্রমশঃ জড়িয়ে গেলাম।

১৯৭৪ সালের ১৭ই মার্চ জাসদ তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪৭টি থানা ঘেরাও ও অস্ত্র লুটের কর্মসূচি গ্রহণ করে। জনাব সিরাজুল আলম খান তার কিছু সংখ্যক বিশ্বস্ত কর্মীকে ডেকে নিয়ে বলেন যে, আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক পর্যায় থেকে বিপ্লবী পর্যায় রূপান্তর করার জন্য চাই জাম্প বা উল্লম্ফন। তারই নির্দেশ মোতাবেক সেদিন জাসদের কিছু সংখ্যক কর্মী মিছিলে হাত বোমা ফাটিয়ে এবং পুলিশের প্রতি গুলি বর্ষণ করে পুলিশকে বেপোরোয়া গুলি বর্ষণে বাধ্য করে। থানা লুটের ৩৭টি কর্মসূচির মধ্যে খুলনায় একটি কর্মসূচি সফল হয়। ফলশ্রুতিতে দেশব্যাপী জাসদ কর্মীদের উপর নেমে আসে বেপরোয়া নির্যাতন। আর এই পরিস্থিতিতেই ১৯৭৪ সালের জুন মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করা হয় বিপ্লবী গণবাহিনী ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা। বীরোত্তম কর্নেল তাহের হলেন সৈনিক সংস্থার প্রধান। জাসদের তরফ থেকে যোগাযোগের দায়িত্বে থাকলেন হাসানুল হক ইনু। ক্যান্টনমেন্টে গোপনে গঠিত করা হতে লাগলো বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ইউনিট।

১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে জাসদ আবার দেশব্যাপী এক হরতাল আহবান করে এবং সরকারের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কর্মসূচি দেয়। হরতালের পূর্বদিন জাসদের অন্যতম কর্মী প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র সাহা বোমা বানাতে গিয়ে মারা যান। তার নামানুসারে এই বোমার নাম রাখে নিখিল বোমা।

১৯৭৫ সনের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিব বাকশাল গঠন করেন এবং অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এমতাবস্থায় হীনবল ও

উপায়ান্তরহীন জাসদ নেতৃত্ব শেখ মুজিবের কাছে বাকশালে যোগদানের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু ক্ষমতার মদে মত্ত শেখ মুজিব তখন এই প্রস্তাবকে আমল দেননি।

ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে জাসদ নেতৃত্ব সেনাবাহিনীর কিছু বিক্ষুব্ধ তরুণ অফিসারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। তাদের সঙ্গে মিলে গড়ে তোলা হয় বিপ্লবী ফোরাম। এই ফোরামের ঘন ঘন বৈঠক বসতে থাকে এখানে সেখানে। গুলশানের এক বাড়িতে বসে নির্ধারিত হয় অভ্যুত্থানের নীল নকশা। সেই বৈঠকেই জাসদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করার প্রস্তাব প্রদান করা হয়।

যুক্তি হিসেবে বলা হয় যে, শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হয়েছেন এই সংবাদে সারা দেশব্যাপী বাকশালীদের মনোবল ও প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবে, অন্যথায় অভ্যুত্থানের ফলাফলকে দলে রাখা মুস্কিল হবে। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর সকলেই এ ব্যাপারে একমত হন। অনেকের ধারণা জাসদ কোন বিদেশী শক্তির নির্দেশেই এই প্রস্তাব উত্থাপন করে।

এই নীল নক্শা মোতাবেকই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হন। জাসদ নেতারা বিশেষত গণবাহিনী ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা নেতারা প্রকাশ্যে সেনাবাহিনীর জিপে করে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে কুরিয়ারদের পাঠিয়ে দেয়া হয়। নির্দেশ দেয়া হয়, এই অভ্যুত্থান জাসদের স্বপক্ষে অভ্যুত্থান এবং এখনকার বিপ্লবী দায়িত্ব হলো বিভিন্ন ফাঁড়ি ও ট্রেজারিসমূহ থেকে যতটা সম্ভব অস্ত্র ও গোলা বারুদ সংগ্রহ করা। এই নির্দেশ অনুযায়ী মোহাম্মদপুর ফাঁড়ি ও নারায়ণগঞ্জের একটি ফাঁড়ি প্রকাশ্য লুট করা হয় এবং লুণ্ঠিত অস্ত্র শস্ত্র তোলা হয় পিটার কাস্টার্সের এলিফেন্ট রোডস্থ বাসভবনে। পরবর্তীকালে পিটার কাস্টার্স এই অস্ত্র-শস্ত্রসহই গ্রেফতার হয়। ভারত থেকে ২৪ ঘন্টার নোটিশে বহিষ্কৃত পিটার কাস্টার্সের সঙ্গে জাসদের কি সম্পর্ক ছিল তা জাসদ নেতারা কখনোই পরিষ্কার করে বলেনি। তবে জেলখানায় পিটার কাস্টার্স প্রকাশ্যেই বলে বেড়াতো যে, সে জাসদকে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিয়েছে। জাসদের কেউই এর কোনো প্রতিবাদ করতো না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৫ই আগস্টের নির্দেশের পরিপেক্ষিতে সারা দেশব্যপী তিনটি ফাঁড়ি লুট করা সম্ভবপর হয়।

স্বভাবতঃই জাসদ খন্দকার মোশতাক সরকারের বিরুদ্ধে কোনো শব্দই উচ্চারণ করেনি। কিন্তু কিছু দিন অতিবাহিত হবার পর জাসদ দেখল তাদের লাভ নেই। তখন তারা পুনরায় তৎপর হয়ে উঠে।

১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর খন্দকার মোশতাক সরকারের পতন ঘটে এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ ক্ষমতায় আসেন। এতে বাকশালী মহলে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। তারা রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বের করে বিজয়োৎসব করতে থাকে। ভারতীয় বেতার থেকেও প্রকাশ করা হতে থাকে বিপুল আনন্দধ্বনী।

এমতবস্থায় দেশপ্রেমিক প্রতিটি নাগরিক এবং সিপাহীই প্রমাদ গুণতে থাকে। এই পটভূমিতে ৭ই নভেম্বর সংগঠিত হয় দেশপ্রেমিক সিপাহী জনতার মহান বিপ্লব। পাদ প্রদীপের সামনে চলে আসেন জেনারেল জিয়া। ক্ষমতা লোলুপ জাসদ দাবী করে যে এই বিপ্লবে নাকি তাদেরই নেতৃত্ব ছিল। কিন্তু আমরা যারা এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম তারা জানি যে বিপ্লবের সাফল্যের পর সিপাহীদের তরফ থেকেই জেনারেল জিয়ার কাছে ১২ দফা দাবী পেশ করা হয়, কিন্তু জাসদের সঙ্গে তার কোনো প্রকার চুক্তি বা অঙ্গীকারই ছিল না। জেনারেল জিয়া এই ১২ দফা দাবীর কতিপয় দাবী সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করেন এবং ধাপে ধাপে পূরণ করা হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

১২ই নভেম্বর জাসদ সিপাহী জনতার মহান বিপ্লবের ফলে অধিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করার বক্তব্য দেয়। ১৬ই নভেম্বর জলিল-রবের ব্যক্তিগত নামে প্রচার পত্র বিলি করা হয় এবং নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে অধিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ক্যান্টনমেন্টে বিলি করা হয় প্রচার পত্র। মেজর জিয়া উদ্দীনকে বেশ কিছু সংখ্যক সিপাহী ও অস্ত্র-শস্ত্রসহ পাঠিয়ে দেয়া হয় সুন্দরবন, প্রত্যেক ইউনিটে নির্দেশ দেয়া হয় চূড়ান্ত প্রস্তুতির, কিন্তু চক্রান্ত সরকারের গোচরীভূত হয়ে যায়। ফলে ২২শে নভেম্বর জলিল, রব, হাসানুল হক ইনু গ্রেফতার হন। ২৪শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হল থেকে সিপাহী ও অন্যান্যদের সঙ্গে পরিকল্পনারত অবস্থায় গ্রেফতার হন কর্নেল তাহের। পরিকল্পনা ভেঙে যাওয়ায় কর্মীদের কাছে মুখ রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং জনগণের মধ্যে জাসদ ভারতীয় দালাল বলে যে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল তার কবল থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে জনাব সিরাজুল আলম খানের ব্যক্তিগত নির্দেশে ২৬শে নভেম্বর ভারতীয় হাই কমিশনের উপর ব্যর্থ হামলা চালানো হয়।

ব্যর্থ অভ্যুত্থানের নায়কদের যে স্বাভাবিক পরিণতি সর্ব দেশে সর্বকালে ঘটে থাকে কর্নেল তাহেরের ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৯৭৬ সালের ২১ই জুলাই তারিখে কর্নেল তাহেরের ফাঁসি হয়। বস্তুত স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম বীর সেনানী কর্নেল তাহেরের জাসদ নেতৃত্বের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়েছিলেন। কর্নেল তাহেরের অনুসারীদের সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে জাসদ ৩০শে জুলাই দেশব্যাপী এক হরতাল আহবান করে। ফাঁসির ৯ দিন পর আহুত এই হরতাল সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

কর্নেল তাহেরের ফাঁসি ও মেজর জিয়া উদ্দিনসহ অন্যান্য নেতাদের গ্রেফতারের পরিপ্রেক্ষিতে বাইরের আন্দোলনের কিছুটা ভাটা দেখা দেয়। কিন্তু জনাব সিরাজুল আলম খান, মেজর জলিল, জনাব এ.বি. এম শাহাজান, জনাব হাসানুল হক ইনু প্রমুখ স্ব স্ব চ্যানেলে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে

যোগাযোগের প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকেন। এই চক্রান্তের ফলশ্রুতিতেই জাসদ ১৯৭৭ সালের ২রা অক্টোবর এর ব্যর্থ অভ্যুত্থানর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া ১৯৮০ সালে ১৭ই জুনের মধ্যে ব্যর্থ অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। তাদের যোগসাজশে আজও তারা চক্রান্ত ও অভ্যুত্থানের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

জাসদ ১৯৭৪ সালের তাদের থিসিসে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টিকে সঠিক পার্টি বলে অভিহিত করে এবং জনৈক কাদের সাহেবকে লন্ডন পাঠিয়ে তার মাধ্যমে চীনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। কিন্তু চীন এ ব্যাপারে তেমন কোনো উৎসাহই প্রদর্শন করে না।

জাসদ মনে করে যে জনগণ প্রধান ফ্যাক্টর নয়। এ দেশে ক্ষমতা দখল করতে হলে চাই সেনাবাহিনীর একটি অংশ ও বিদেশী মদদ। তাই চীন যখন উৎসাহ দেখালো না তখন তারা থিসিস পরিবর্তন না করেই রাশিয়ার কৃপা ভিক্ষার জন্য হন্যে হয়ে উঠে। জনাব আ, স. ম. আবদুর রব পশ্চিম জার্মানি গিয়ে নানাভাবে রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন এবং এক পর্যায়ে রাশিয়া থেকে ঘুরেও আসেন। জাসদ এ কথাও বুঝতে পারেন যে সিপিবি বাকশালকে ডিঙ্গিয়ে রাশিয়া জাসদকে কখনোই কোলে নিয়ে বসবে না। সুতরাং বাকশালের মনোরঞ্জন অপরিহার্য। তাই যে জাসদ ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়ও বাকশালকে এক নম্বর শত্রু বলে অভিহিত করেছিল, ১৯৭৯ সালে বাস্তব অবস্থা একই থাকা সত্ত্বেও জাসদ সেই বাকশালের সঙ্গেই মিত্রতার তত্ত্ব দিয়ে বসে এবং কার্যত বাকশালের লেজুড় বৃত্তি শুরু করে। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৮০ সালে বাকশালীরা জাসদের অফিস পুনরায় ভস্মিভূত করে দিলেও এবং তাদের কর্মীদের বেধড়ক পিটিয়ে দিলেও বাকশালরা নারাজ হতে পারে এই ভয়ে জাসদ বাকশালীদের গায়ে একটি টোকা দেয়া থেকে পর্যন্ত বিরত থাকে।

আর ভারতের সঙ্গে এক গোপন রহস্যময় যোগাযোগ সর্বদাই রক্ষা করে এসেছেন জাসদের রহস্য প্রিয় নেতা জনাব সিরাজুল আলম খান। তিনি দুই-এক মাস অন্তর অন্তরই অকস্মাৎ দিল্লী চলে যেতেন। জাসদের কর্মীদের যখন হন্যে হয়ে খুঁজছে, জাসদের সমর্থকদের পরিবার পরিজন পর্যন্ত যখন বেপরোয়া নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, তখন জনাব সিরাজুল আলম খান প্রকাশে পাসপোর্টের মাধ্যমেই দিল্লী কোলকাতা চলে যেতো এবং কেউ তাকে ধরার কোনো চেষ্টাই করতো না।

এই প্রসঙ্গে জনাব মোমিনুল হায়দার চৌধুরী ওরফে হায়দার সাহেবের কথাটি বলে রাখা দরকার। ভারতের সোশ্যলিস্ট ইউনিট সেন্টার (এস. ইউ. সি) এর কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হায়দার সাহেব ১৯৭২ সালেই এস. ইউ. সি–এর একটি বাংলাদেশী সংস্করণ গঠন করার দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং বিভিন্ন মহলে ঘোরা ফেরার পর জাসদকে কাজের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। তিনি প্রথম থেকেই বছরের অর্ধেক সময় ভারতে এবং অর্ধেক সময়

বাংলাদেশে বসবাস করতেন শোনা যায়। তার ভারতীয় ও বাংলাদেশী উভয় প্রকারের পাসপোর্ট রয়েছে। জনাব সিরাজুল আলম খান এই ভদ্রলোকের সঙ্গেও বেশ ক'বার ভারতে গমনাগমন করেন।

দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর জনাব হায়দার জাসদের মধ্যে তার কিছু অনুসারী সৃষ্টি করতে সমর্থ হন এবং সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের কোন্দলের কোন ফয়সালা না হওয়ায় তার উচ্চভিলাষী তরুণ অনুসারীদের দিয়ে বাসদ গঠন করান। জনাব খান যেমন জাসদের নেপথ্য গুরু জনাব হায়দারও তেমনি বাসদের নেপথ্য গুরু। উচ্চভিলাষী অথচ অস্থির চিত্ত নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত জাসদ কোনো কর্মসূচিতেই লেগে থাকতো না বরং সর্বদাই চক্রান্তের পথ খুঁজে বেড়াতো। তাদের এই নৈরাজ্যবাদী উচ্চাভিলাষের বেদীমূলেই প্রাণ দিয়েছিল কর্নেল তাহের, কর্পোরাল আলতাফ, সিদ্দিক মাস্টার, আবুল কালাম আজাদ, হাদী, মন্টু, মফিজ, হেলাল, রোকন, মীর মোস্তফাসহ শত শত রাজনৈতিক কর্মী ও সিপাহী। বিরান হয়ে গিয়েছিল অসংখ্য পরিবার আর কতজন যে ফ্যাসিবাদী নির্যাতনের শিকার হয়েছিল তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু জাসদ নেতৃত্ব এদের প্রতি কোনো দায় দায়িত্ব কোনো দিন স্বীকার করেনি।

কথা ও কাজের মধ্যেও জাসদ নেতৃত্বের কোনো দিন কোনো মিল ছিল না। তারা মুখে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বলতো, কিন্তু কার্যত নেতারা বিলাসবহুলতার মধ্যে দিয়ে জীবনকে উপভোগ করতেন। সাধারণ কর্মীরা যে না খেয়ে থাকতো তাদের যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দুর্দশা, সেদিকে নজর দেয়ার ফুরসত মিলতো না জাসদ নেতাদের।

## ৪. পরিশিষ্ট

# মার্কিন সিনেটে তথ্য প্রকাশ বাংলাদেশের পাঁচজন সাংবাদিক সি. আই.এর এজেন্ট

আজকাল বাংলাদেশে বিদেশী এজেন্ট, বিদেশী অনুপ্রেরণা প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন মহল থেকে বলা হচ্ছে। কারা এই বিদেশী এজেন্ট? কারা বিদেশী অনুপ্রেরণা ও অর্থ পেয়ে স্বদেশের স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত আছে?

সম্প্রতি (১৯৭৮ সালে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রচারপত্রে এটা বলা হয়েছিল–লেখক) বিদেশী এজেন্টদের একটি তালিকা পাওয়া গেছে। এই তালিকায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এজেন্টদের সাথে বাংলাদেশের ৫ জন এজেন্টের নাম রয়েছে। এরা হলেন বাংলাদেশ টাইমস ও সাপ্তাহিক হলিডে-র প্রাক্তন সম্পাদক এবং সদ্য পদত্যাগকারী মন্ত্রী জনাব এনায়েত উল্লাহ খান, দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টর মইনুল হোসেন ও সম্পাদক জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, সরকারি সংবাদ সংস্থা বাসস–র প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার জনাব আমানউল্লাহ এবং দৈনিক বাংলা ও দৈনিক বার্তার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের সিলেক্ট কমিটি ৮৪টি দেশের সংবাদপত্র, পত্রিকা, বেতার, টেলিভিশন প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমে সি. আই. এর নিয়মিত বেতনভোগী ৮৮৭ জন এজেন্টের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় বাংলাদেশের উপরোক্ত ৫ জন সাংবাদিকের নাম রয়েছে।

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি. আই. এর ঘৃণ্য কীর্তিকলাপ আজ আর কারো অজানা নয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে চক্রান্ত চালানো, রাজনৈতিক গোলযোগ সৃষ্টি, সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো, নির্বাচিত গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক সরকারগুলোকে উৎখাত এবং স্বাধীনতা ও মুক্তি আন্দোলনের জনপ্রিয় নেতাদের হত্যা, এ সবই সি. আই. এর কীর্তি। কঙ্গোর স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বা, চিলির প্রগতিশীল জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট সালভাদোর আলেন্দে প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য নেতাদের হত্যার পেছনে ছিল সি. আই. এ। আলেন্দেকে হত্যার কথাতো সি. আই. এ স্বীকার করছে।

সি. আই. এর ঘৃণ্য কীর্তিকলাপের কিছু কিছু ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় খোদ মার্কিন জনগণও এই সংস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছেন। তাই মার্কিন সরকার সি. আই. এর কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছেন। অনুরূপ একটি তথ্যই হলো সিলেক্ট কমিটি প্রকাশিত উপরোক্ত তালিকা।

সিলেক্ট কমিটির ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত এই এজেন্টরা সি. আই. এ-কে খবর সরবরাহ করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূলে সুকৌশল প্রচারণা দ্বারা নিজ নিজ দেশের জনমতকে প্রভাবিত করে এবং সংবাদপত্র বেতার, টেলিভিশন ও পুস্তক প্রকাশনা প্রভৃতি সংস্থায় সি. আই. এর অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেয়।

পাকিস্তান আমলেও বহু চক্রান্ত, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, সামরিক অভ্যুত্থানে সি. আই. এ সক্রিয় ছিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোরতর বিরোধিতা করে। স্বাধীনতার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের দেশে সি. আই. এর চক্রান্তের জাল আরো বিস্তার করেছে। এ দেশে সি. আই. এ এজেন্টদের মধ্যে মাত্র ৫ জন সাংবাদিকের নাম প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ 'গণতন্ত্র' ও 'মানবাধিকারের' প্রবক্তা, আবার কেউবা পিকিংপন্থী বামপন্থী 'বিপ্লবের' মুখোশ পরে রয়েছে। বাংলাদেশে সরকার কি এই ৫ জন এজেন্ট সম্পর্কে অবহিত নন? সরকার যখন 'বিদেশের টাকা' 'বিদেশের অনুপ্রেরণা' সম্পর্কে প্রতিদিন লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিচ্ছেন তখন এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন?

সরকার অবিলম্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের সিলেক্ট কমিটির ঐ রিপোর্ট জনগণের জ্ঞাতার্থে এ দেশে প্রকাশ করুন। দেশবাসী এই এজেন্টদের চিনে রাখুন এবং এদের দেশের স্বার্থবিরোধী চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে সদা সজাগ থাকুন।[১]

---

[ডিসেম্বর/১৯৭৮। ভূপেশ গুপ্ত কর্তৃক উত্থাপিত ভারতীয় লোক সভায় শীতকালীন অধিবেশনের প্রসিডিংস দ্রষ্টব্য।]

## ৫. পরিশিষ্ট

### শেখ মুজিবের উত্থান-পতন এনায়েতউল্লা খান

শেখ মুজিবের অকাল পতন আমাকে অবাক করেছে এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে। ঘটনার আকস্মিকতায় হয়তো বা আপাত বিস্ময়ে চমকিত হয়েছি। বৈরিতা সত্ত্বেও বেদনার অঙ্কুরে বিদ্ধ হয়েছিল, দূরদূর ভবিষ্যৎ চিন্তায় অকারণে উদ্বেলিত হয়েছি। কিন্তু এ সবই নিছক রাজনৈতিক ভাবনা, মধ্যবিত্ত মানসের স্বভাবগত প্রক্রিয়া। এই মুহূর্তের বিমূঢ়তা পরক্ষণে স্বস্তির আশ্বাসে উচ্চকিত হয়েছে; কালান্তরের ঘন্টাধ্বনি শৃঙ্খলিত চেতনাকে উজ্জীবিত করেছে। কথাগুলো অপ্রিয় এবং প্রকারান্তরে নিষ্ঠুর, কিন্তু নিদারুণ সত্যও বটে। যেমন সত্য নিয়তির অমোঘ বিধান কিংবা ইতিহাসের নির্মম বিচার। এ দুই এর তফাৎ মৌল। প্রথমটি সংস্কার, দ্বিতীয়টি বিজ্ঞান। কেউ বলে ভবিতব্য কেউ বলে ডায়ালেকটিস। কিন্তু উভয়েরই পরিণাম অবশ্যম্ভাবিতায়। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তাঁর অধিষ্ঠান এবং পরিশেষে 'স্বর্গ হতে বিদায়'—এই অবশ্যম্ভাবিতারই বিয়োগান্ত আলেখ্য। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড একদিকে নাটকীয়তায় চমকপ্রদ অন্যদিকে দ্বৈততায় খণ্ডিত। তাঁর ক্ষমতারোহণের অভিযাত্রা বিগত এক দশকে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছিল। অগণিত আত্মদান এবং এক ঝুড়ি রূপকথা মিলিয়ে তৈরি হয়েছিল তাঁর স্বর্গের সিঁড়ি। ব্যক্তিত্বের অপরিমিত শৌর্য ও অনুকূল ইতিহাসের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর রাজ-কাহিনী। তিনি ছিলেন রূপকের রাজা। সত্যিকারের মুকুটের ভার তাই তিনি বইতে পারেননি বরং মুকুটের ভারে তিনি ন্যুব্জ হয়েছেন। 'রক্ত করবীর' আত্মবিমোহিত রাজার মতো দুঃশাসনের অচলায়তন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যাঁরা প্রাণ দিল, ষড়যন্ত্রের রাজনীতিকে পদাঘাত করে নির্দ্বিধায় অস্ত্র তুলে নিল, যারা দেশপ্রেমের সুমহান অঙ্গীকারের রক্ত দিয়ে মাতৃভূমির ঋণ শোধ করলো তাদেরই রক্ত-মাংস হাড়ের বিনিময়ে তিনি গড়তে চেয়েছিলেন এক অলৌকিক ক্ষমতার দেউল। সেখানে দেবতা একক, কিন্তু পূজারী নেই। মানুষকে বাদ দিয়ে শুরু হলো বিগ্রহের রাজনীতি পুতুলের খেলা। পরদেশী পটুয়ার হাতে সৃষ্টি হলো পুতুলের রাজা শেখ মুজিবুর রহমান। আমরা এ কথা নিষ্করুণ জানি, কিন্তু ইতিহাস আরো বেশি নির্মম এবং তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ১৫ই আগস্ট। হঠাৎ দ্রিম দ্রিম শব্দে

বিদীর্ণ হলো নিস্তব্ধ প্রভাত। এক ঝাঁক আগ্নেয় শীসের লক্ষ কোটি মানুষের সীমাহীন রোষের আকস্মিক বিস্ফোরণের মতো নিপাত করলো পুতুলের রাজত্ব। এই পুতুল নাচের ইতিকথা রাজনীতি বা ইতিহাস বিযুক্ত নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে গোত্রীয় ক্ষমতার অভিলাষ এবং সাম্রাজ্যবাদী, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনার ইতিবৃত্ত। সে এক বিচিত্র কাহিনী। সাড়ে সাত কোটি মানুষ যখন একাত্তরে চরমতম জাতিগত নিপীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তখনও পর্দার আড়ালে চলছিল আপোষের জুয়াখেলা। ঊনসত্তুরের গণ-অভ্যুত্থানের ও একাত্তরের গণপ্রতিরোধকে নিবৃত্ত করবার জন্য শুরু হয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্র ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। কিন্তু ইতিহাসতা স্থবির নয় যে, জাতকের ইচ্ছের উপর তার গতিধারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তাই জাতীয় মুক্তির বিভ্রম সৃষ্টির হীন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও স্ফূর্ত হয়েছিল গণবিদ্রোহ। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ সেই আত্মদান বাংলার মানুষের ব্যক্তির নয়। দলমত নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর দেশপ্রেমিকদের, গোষ্ঠীর নয়। পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর ক্ষমতার রাজনীতি যুপকাঠে লক্ষ আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে বলি দিয়েছে, পলাতক রাজনীতির প্রচ্ছায়ায় গণবিপ্লব ও প্রতিরোধকে ঠেকাতে চেয়েছে। সেবারও চট্টগ্রামের অবরোধ, জয়দেবপুরের সেনা বিদ্রোহ, পাবনার বৈপ্লবিক সমাবেশ, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ঐতিহাসিক প্রতিরোধ, তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ভবনের গোপন আলাপনীকে নস্যাৎ করে গণ-বিদ্রোহের প্রেক্ষিত সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আপোষকারী নেতৃত্ব জনগণের বীরোচিত রক্তদানকে অস্বীকার করে গোল টেবিলে দেশ বিভাজনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান পঁচিশে মার্চ সন্ধ্যায়ও তাই মনস্থির করতে পারেন নি। তাঁর শেষ আহবান ছিল সাতাশে মার্চের হরতাল, স্বাধীনতা যুদ্ধের নয়, সেই সংকটকালেও এগিয়ে এসেছিল সামরিক বাহিনী এবং বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ তরুণ ও যুবকদের দল। তবুও সেই যুদ্ধ গণযুদ্ধে রূপায়িত হতে পারেনি। কেননা বৈদেশিক চক্র এই সংগ্রামকে নিজ খাতে প্রবাহিত করবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। মুক্তি বাহিনীর প্রতি চরম অবিশ্বাস হেতু সৃষ্টি হলো তথাকথিত মুজিব বাহিনী। জনযুদ্ধ অভিযাত্রাকে রুখবার জন্য হলো সামরিক হস্তক্ষেপ। এই চক্রান্তের ইতিহাস সুদীর্ঘ। যখন মুক্তি বাহিনী বীর সেনানীরা, গেরিলা বাহিনীর তরুণেরা এবং দেশের অভ্যন্তরের বিপ্লবী যোদ্ধারা জন-যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে জাতীয় মুক্তির অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে যুদ্ধ করছিল তখনই মুজিবনগরের রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে এই চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠে। এই চক্রান্ত মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ন্ত্রিত করবার চক্রান্ত, পরাভূত নেতৃত্বকে ক্ষমতায় অভিষিক্ত করবার চক্রান্ত। যাঁরাই তখন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাদেরই কপালে জুটেছে অপপ্রচারণা ও রাজনৈতিক নিগ্রহ। পরলোকগত দুর্গা প্রসাদধর (ডি. পি. ধর) অংগুলী হেলনে পরিচালিত মুজিবনগর সরকারের বশংবদ নেতৃত্ব ও প্রশাসন

এবং সম্প্রসারণবাদের সৃষ্ট মুজিব বাহিনীর প্রতিবিপ্লবী কার্যক্রম একাত্তরের সংগ্রামের সবচাইতে মসীলিপ্ত অধ্যায়। ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেবে জাতীয় মুক্তির প্রত্যাশী এবং সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ বিরোধী লক্ষ কোটি দেশপ্রেমিক জনগণ। এরই ফলশ্রুতি ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১। ত্রিশ লক্ষ প্রাণ ও আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় মুক্তির পরিবর্তে দেশবাসী পেল এক পুতুল সরকার এবং সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে পুতুল নাচের ইতিকথা। শেখ মুজিবুর রহমান এই ইতিকথার নেপথ্য নায়ক। আগরতলার কুখ্যাত ষড়যন্ত্রের মামলা এবং একাত্তরে মুজিববাহিনীর অভ্যুদয় কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের পর্যায়ক্রমিক ঘটনাপঞ্জী। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালির জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম, জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং সম্প্রসারণবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে এর মৌলিক তফাৎ রয়েছে। প্রথমটি বাঙ্গালি বুর্জোয়ার সব চাইতে ঘৃণ্য ও মেরুদণ্ডবিহীন অংশের ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত এবং দ্বিতীয়টি বাঙ্গালি জাতীয় বুর্জোয়ার অংশসহ সকল শ্রেণীর মানুষের জাতীয় ও অর্থনৈতিক মুক্তির চূড়ান্ত সংগ্রাম। আমার বেদনাবোধ হয় এই জন্য যে, শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি সমগ্র দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন সত্ত্বেও তার সংকীর্ণ শ্রেণী– চেতনা বিদেশী প্রভুর দায়বদ্ধ রাজনীতির শৃংখল মোচন করতে পারেনি। বরং পুতুলের মতো হয়তবা অনিচ্ছুক পুতুলের মতো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাঁর দ্বৈত ভূমিকা পালন করে গেছেন।

তিনি ছিলেন দক্ষ নট। অভিনয়ের চাতুর্যে প্রতিটি নাটকীয় মুহূর্তে দর্শকবৃন্দের তুমুল করতালি কুড়িয়েছেন, বাগ্মিতার সম্মোহন ও বিভ্রমের মায়াজাল রচনা করেছেন। জাতীয় স্বাধীনতার মহানায়কের শিরোপা পরিধান করেছেন। কিন্তু বারবার ষড়যন্ত্রের ঋণ শুধতে গিয়ে বাংলার মুক্তিকামী মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সেখানেই তার ট্রাজেডি।

শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতেও এ কাহিনীতে ছেদ পড়েনি। সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট প্রতিবিপ্লবী মুজিব বাহিনী একাত্তুর সালে তার পক্ষ হয়ে প্রতিনায়কের ভূমিকা পালন করেছে, এই বিকল্প বাহিনীর সেই ষড়যন্ত্রী রাজনীতির অন্যতম হাতিয়ার মুজিববাদের তথাকথিত ভাবদর্শন, তত্ত্ব, ভাষা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস নির্লজ্জ বিকৃতি এই একই পরিকল্পনার অংশ বিশেষ।

মুজিববাদ ও মুজিব বাহিনীর কাহিনী আজো ইতিহাসে অনুল্লিখিত। এই প্রতিবিপ্লবী তত্ত্ব ও সংগঠন শুধুমাত্র ব্যক্তি শাসন কায়েম করবার জন্যই সৃষ্টি করা হয়নি, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট সম্প্রসারণবাদী আধিপত্যকে নিরংকুশ করবার জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের রক্ষীবাহিনী মুজিববাদ ও মুজিব বাহিনীরই সাংগঠনিক রূপ।

মুজিববাদ ও মুজিব বাহিনীর সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ছিল ত্রিবিধ।

(ক) মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে মুক্তিবাহিনীর ক্রমবর্ধমান শক্তি ও আধিপত্যকে খর্ব করা, (খ) গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট দেশপ্রেমিক বিপ্লবী সামাজিক শক্তির মোকাবেলা করা এবং (গ) প্রয়োজনবোধে শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা। প্রথম দুটো কারণের জন্য মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মুজিব বাহিনীর তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল এবং তৃতীয় কারণের জন্য সম্প্রসারণবাদের বশংবদ মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্ব ও প্রশাসনের সঙ্গেও সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল।

একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত 'এলিট ফোর্স' সৃষ্টির ইতিহাস আরও বিচিত্র। মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দের পরিকল্পনা অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমানের স্বহস্তে লিখিত পত্রের উপর ভিত্তি করে এবং তাঁরই নির্বাচিত উত্তরাধিকারীদের (?) নেতৃত্বে এই রাজনৈতিক বাহিনী গঠন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, দেরাদুনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই বিশেষ প্রতিবিপ্লবী সংগঠন জেনারেল ওসমানীর নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিবাহিনী, এমনকি তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত মুজিবনগর সরকারেরও নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল না। জনৈক ভারতীয় সেনাপতির প্রত্যক্ষ পরিচালনায় সাংগঠিত তথ্যকথিত মুজিব বাহিনীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, সাংগঠনিক কাঠামো এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে এ কথাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে এই বাহিনীর মৌলিক বিরোধ ছিল। বিরোধের সম্ভাব্য কারণ আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

যদি শেখ মুজিবুর রহমানের পত্রের কথা সত্যি হয়ে থাকে তবে এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্যের সঙ্গে মুজিব বাহিনীর গভীর যোগসূত্র রয়েছে। দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, শেখ মুজিবুর রহমানের পর্দান্তরালের ভূমিকা পূর্ব নির্ধারিত ছিল। মঞ্চ-সফল নায়কের মতো তিনি নেপথ্যের কুশলী পরিচালকের ইংগিত প্রতি পদে পালন করে গেছেন। তিনি ছিলেন ভাগ্যের বরপুত্র। কিন্তু এচিলিসের গোড়ালীর মতো তাঁর অজেয় ভাগ্য ১৫ই আগস্ট মুহূর্তের যন্ত্রণায় নিঃশেষিত হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, মুজিবনগর সরকার ও প্রশাসন মুজিব বাহিনী এবং তথাকথিত কাদেরীয়া বাহিনীর মধ্যকার দ্বন্দ্বের সঙ্গে বাঙ্গালির জাতীয় দ্বন্দ্বের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই দ্বন্দ্বের আন্তঃস্বার্থের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ক্ষমতার প্রসাদ প্রাপ্তির লড়াই। একাত্তরের যুদ্ধের অনিশ্চিয়তা, দীর্ঘসূত্রিতার আশংকা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ উপরোক্ত দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তোলে। কিন্তু তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। কেননা সব পুতুলের মাঝে তিনি পুতুলের রাজা। রূপকের মাধ্যমে সৃষ্ট তার ভাবমূর্তি দুচারণার স্পর্শমণিতে উদ্দীপ্ত। তাঁর আত্মদানের রূপকাহিনী এবং সর্বোপরি তাঁর ব্যক্তিত্বের অপরিমিত শৌর্য ও ঐতিহাসিক নির্বন্ধ

জাতীয় স্বাধীনতার বিভ্রম সৃষ্টিতে অনেক বেশি কার্যকর। জনগণের বিমূর্ত ভালোবাসার বর্ণচ্ছটায় আলোকিত ভাবমূর্তি তাঁর শ্রেণী চরিত্রের রঙ্গীন প্রচ্ছদ মাত্র। বাঙ্গালি বুর্জোয়ার নিকৃষ্টতম ও মেরুদণ্ডবিহীন মুৎসুদ্দী শ্রেণীর তিনি ছিলেন যোগ্যতম, শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি।

পুতুল নাচের ইতিকথার পরের কথা তাই বিচিত্রতর। এই উৎপাদন বিমুখ, লুণ্ঠনপ্রিয়, পরাভূত শ্রেণী স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের উপর নির্ভরশীল হবে। ঐতিহাসিক কারণে এবং উপমহাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে উপরোক্ত শক্তিত্রয়ের সমন্বয় ও দ্বন্দ্ব পৌনঃপুনিকভাবে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন মুৎসুদ্দী বুর্জোয়ার আন্তর্জাতিক নির্ভরতার নিক্তিতে প্রভাবিত করেছে। বিগত সাড়ে তিন বছর এই পরানুখতার মূল স্তম্ভ ছিল সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট তাদেরই নির্দেশে নির্ণীত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক গণচেতনাকে পায়ে মাড়িয়ে, সার্বভৌমত্বের জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে, জাতীয় অর্থনীতি উন্নয়নের স্বার্থকে ধ্বংস করে, সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে এই শক্তিজোটের স্বার্থে অবদমিত করে শুরু হয়েছিল পরিকল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায়। এরই
শক্তিজোটের স্বার্থে অবদমিত করে শুরু হয়েছিল পরিকল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায়। এরই
ফলশ্রুতি একদল, একনেতা, একদেশ। এরই পরিণাম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য। এরই অবশেষ লুণ্ঠিত, লাঞ্ছিত, মৃত্যুকীর্ণ বাংলাদেশ।

শেখ মুজিবুর রহমান এই নাটকের নিরুপায় ক্রীড়নক। তার অসহায়তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি, দেখেছি দায়বদ্ধ মানুষের নিষ্ফল ইচ্ছের বিলাপ। এখানেই ছিল তার দ্বৈততা, তিনি ছিলেন কিংবদন্তীর নায়ক। তার রাজনীতির প্রক্রিয়া দ্বিচারণে অতুল্য। কিন্তু ঋণগ্রস্ততার দায় পরিশোধ করতে গিয়ে বারবার চক্রবৃদ্ধি হারে তিনি মূল্যের কড়ি গুণছিলেন। তার প্রাপ্য ছিল শুধুমাত্র ক্ষমতার ময়ূর সিংহাসন।

আমি প্রসঙ্গের দীর্ঘ অবতারণা করেছি শুধুমাত্র এ কথা বলবার জন্য যে, বাংলাদেশের সমাজ বিন্যাস, সামাজিক স্তর এবং ঐতিহাসিক পটভূমির প্রেক্ষিতে ব্যক্তিদৌর্বল্য কিংবা ব্যক্তি-দুঃশাসন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক স্থবিরতা শেখ মুজিবুর রহমানের অকাল পতনের প্রধান কারণ হতে পারে না। কেননা রাজনীতি ও ইতিহাস নিজস্ব গতিবেগে এগিয়ে চলে। সেখানে ব্যক্তি গৌণ, মুখ্য শুধু ঘটনাপ্রবাহের ডায়নামিক্স। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক উত্থান এবং পতন এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে নিহিত ছিল। তাঁর সম্রাটের স্বপ্ন উপজাতীয় গোষ্ঠী-প্রিয়তা, আকাশচুম্বী অহম এবং আত্মবিমোহন তারই দায়বদ্ধ আত্ম ও শ্রেণীসজ্ঞাত অপূর্তির আগ্রাসী অভিব্যক্তি। যতই তিনি হাজারো সুতোর বাঁধনে

জড়িয়ে গেছেন ততই বৃদ্ধি পেয়েছে তার বিভ্রম। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় পারা নাইয়া।

আমার কারামুক্তির পর ২৯শে জুলাই তার সাথে দেখা হয়েছিল। বিক্ষিপ্ত পদচারণায় অস্থির শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "I am sorry for what happened to you, But my hands were tied."

... তার রাজনীতির দ্বিচারণ সত্ত্বেও আমি তার অসহায়তার কথা বিশ্বাস করেছিলাম। কেননা, আমি জানি পুতুলের রাজনীতি কতো নিষ্করুণ যে সেখানে রাজা সাজা যায়, কিন্তু ইচ্ছামতো রাজ্য শাসন করা যায় না। নিপুণ ক্রীড়া তাকে গরিমা দিয়েছিল, কিন্তু প্রাণ দেয়নি, পোশাক বৈভবে বিভূষিত করেছিল, কিন্তু স্বাধীনতা দেয়নি। একনেতা, একদল ঃ এই প্যান্টোমাইম প্রদর্শনীর সর্বশেষ পর্ব।

বিগত সাড়ে তিন বছর বাংলাদেশের দুঃখী জনগণ এই অবাক প্রদর্শনীর মৌন দর্শক ছিলেন। তাদের নিঃশব্দ আর্তিতে ধ্বনিত হচ্ছিল কতিপয় লুটেরার অট্টরোল। আর তাকে ইন্ধন যুগিয়েছে একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারী চক্র যারা সমাজতন্ত্রের ছলে, মৈত্রীর ছদ্মবেশে এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের আবডালে বাংলাদেশকে বৈদেশিক স্বার্থের অবারিত লীলাক্ষেত্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। অন্যদিকে বাঙ্গালি বুর্জোয়ারা নিকৃষ্টতম মেরুদণ্ডবিহীন মুৎসুদ্দীকূল দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তিকে ধ্বংসকল্পে পরদেশী বাণিজ্যকে পুঁজির সেবাদাসের ত্রিদলীয় ঐক্যজোট। এই ঐক্যজোটের নীল নকশা পরিশেষে একদলীয় শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে রূপায়িত হয়।

ফলত বাংলাদেশ এক দিকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব বলয়ে আপতিত হয় এবং অন্যদিকে, পূর্ব ভারতের ধ্বংসোন্মুখ শিল্পকেন্দ্রের প্রায় ঔপনিবেশিক পশ্চাৎভূমিতে পরিণত হয়। দেশের উৎপাদিকা শক্তিকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করবার ইতিহাস বিংশ শতাব্দীতে বিরল। অষ্টাদশ শতকের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের লুটেরা বাণিজ্যিক পুঁজির অবাধ লুণ্ঠনের সঙ্গে এই প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

এই দ্বৈতচক্র কখনো এককভাবে, কখনো যুগ্মভাবে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কায়েম করবার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও অর্থনীতির গতিধারা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় স্বাধীনতাকে বৈদেশিক প্রভুদের স্বার্থে নস্যাৎ করবার জন্য এই চক্র জোট পৌত্তলিকতার রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেছে। মুজিববাদের ফ্যাসিবাদী দর্শনকে নিপীড়নমূলক পৌত্তলিক রাজনীতির তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। আর তার যোগান দিয়েছে দেশপ্রেমিকদের ঐকজোটের অপর দুটো রাজনীতি ও বৈদেশিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক দল।

একনেতা, একদল শেখ মুজিবুর রহমানের একক আত্মচিন্তা নয়। বিগত সাড়ে

তিন বছরের দেশপ্রেম বিরহিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। আর সে জন্যই তার পতন শুধুমাত্র অবাধ দুর্নীতি, লুণ্ঠন, দুঃশাসন, গোষ্ঠীপ্রিয়তা ও পারিবারিক শাসন প্রতিষ্ঠার কারণজনিত নয়। এর মৌল কারণ পূর্বে উল্লিখিত রাজনীত ও ইতিহাসের মধ্যে নিহিত।

আমি বারবার একই কথায় ফিরে আসছি। কারণ আমার দৃষ্টিতে রাজনীতিই মুখ্য, ব্যক্তি নয়, ইতিহাস প্রধান, ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। শেখ মুজিবুর রহমান জুড়াসের সিংহ নন অথবা দেব বংশোদ্ভব কুলনায়ক নন। তিনি বাংলাদেশের সমাজ বিন্যাস ও পরিমণ্ডলে লালিত একজন নশ্বর মানুষ।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিশ্লেষণই অরাজনৈতিক এবং ভ্রমাত্মক বলে আমি মনে করি। তিনি ছিলেন মাধ্যম এবং তারই নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল আসল মুৎসুদ্দী শ্রেণীর অসার রাজত্ব। সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তি সর্বদাই এই ধরনের মেরুদণ্ডহীন শ্রেণীর উপর ভিত্তি করে তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করে। আর সে জন্যেই তারা বংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অভিষিক্ত হয়েছিল আলোচ্য ব্যক্তির মাধ্যমে। বাঙ্গালি বুর্জোয়াদের হীনতম অংশ প্রশাসন যন্ত্রে প্রধান ছিল আর ছিল বাঙ্গালী বুরোক্রেসির সবচাইতে দুর্নীতিপরায়ণ ও তাবেদার অংশ এবং অর্থনীতিতে ক্ষমতাবান ছিল পরদেশী লুটেরা পুঁজির দেশীয় সেবাদাস। একদলীয় শাসন সেই ঘৃণ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জোটকে কায়েম করবার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছিল।

এই চক্রজোটের এক বছরের প্রতিভূ হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান তার ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের ঋণ শোধ করেছিলেন। গণতন্ত্র হরণ, নির্মম নিপীড়ন, কণ্ঠরোধ এবং হত্যা এই প্রক্রিয়ারই অন্যতম পর্যায়। আজও ৫২ হাজার রাজনৈতিক কর্মী বিপ্লবী ও মুক্তিযোদ্ধা শেখ মুজিব কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়ে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় দিন গুণছেন। আর সেই প্রক্রিয়াকে পরমোল্লাসে উস্কানি দিয়েছে কম্যুনিষ্ট নামধেয় একদল স্খলিত পরজীবী। কেননা দেশপ্রেমে উজ্জীবিত গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী শক্তিকে নির্মূল না করা পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারত না।

শেখ মুজিবুর রহমানের তিন বছরের দুঃশাসন সহস্র জননীর বুক ভেঙ্গে দিয়েছে, শত শত বীর দেশপ্রেমিকের রক্ত রঞ্জিত হয়েছে, দেশীয় সম্পদ পাচারের নয়া ইতিহাস রচনা করেছে, মনন ও সংস্কৃতিকে হত্যা করেছে এবং সর্বোপরি সার্বভৌমত্বকে বিকিয়ে দিয়েছে। অর্থনীতির আর কানাকড়িও অবশিষ্ট নেই। অতএব কালান্তরের এই সন্ধিক্ষণে যদি আমরা সেই রাজনীতিকে পরাস্ত না করতে পারি, শেকল ভাংগার সংগ্রামে অবতীর্ণ না হতে পারি এবং দেশপ্রেমিক বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও কৃষক শ্রমিকের ঐক্যজোট না গড়তে পারি তবে আবার পুতুলরাজা কায়েম হবে। পুতুল রাজাকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তবে আবার পরদেশী পটুয়া নতুন আদলে পুতুল গড়বে। পরিশেষে তবুও বলব শেখ

মুজিবুর রহমান আমার চোখে গ্রিক ট্রাজেডীর করুণ চরিত্র—শ্রেণী চেতনার সংকীর্ণ ঈর্ষার বিদ্বিষ্ট, ভালোবাসায় অকৃত্রিম, কিন্তু দুর্বলতায় আকীর্ণ একজন নশ্বর মানুষ। ক্ষমতার অংগনে তার সদম্ভ পদচারণা কখনো করুণার সৃষ্টি করেছে। সত্য ভাষণে তিনি ভ্রুকুটি করেছেন, প্রতিবাদীকে রোষানলে ভস্ম করতে চেয়েছেন। দেশকে ভালোবাসতে গিয়েও তিনি দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। জীবন দিয়ে তাকে সেই মূল্য শোধ করতে হয়েছে। বাংলাদেশ অমর হোক, স্বাধীনতা দীর্ঘজীবী হোক।★

---

★ পরিসংখ্যান মতে এটি হলো একটি ডাহা মিথ্যা অপপ্রচার। যেমন— তথাকথিত আত্রাইযুদ্ধের পূর্বে যেখানে প্রচার করা হয়েছিল হাজার হাজার ক্যাডার মারা গেছেন সম্প্রতি সে যুদ্ধের নায়ক এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন মাত্র কয়েকজন, সে যুদ্ধে (!) প্রাণ দিয়েছেন। হলিডে চক্রের প্রকাশ্য নায়ক এনায়েতুল্লাহ খান বঙ্গবন্ধু হত্যার পর চৈনিকপন্থী সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকায় এই নিবন্ধটি প্রকাশ করেন—যা বিতর্কিত, বিভ্রান্তিমূলক মিথ্যাচারে উচ্চকণ্ঠ।

## ৬. পরিশিষ্ট

## ইত্তেফাক উপ-সম্পাদকীয়
## প্রসঙ্গ : দেশ ও জাতি
## আনোয়ার হোসেন

কয়েকদিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগিয়া উঠিয়াছি। শরীর এখনো দুর্বল। বর্তমান সরকার দৈনিক ইত্তেফাক আমাদের হাতে ফিরাইয়া দিয়াছেন, ইহাকে পুনরায় নিজেদের ব্যবস্থাপনায় চালু করিতে গিয়া গত কয়েকদিন আমাদের সকলকে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। শারীরিক এই দুর্বলতা ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বক্তব্য পাঠক সাধারণের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

প্রথমেই বলিতে হয়, দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা। এই পরিবর্তন আকস্মিক, তবে অস্বাভাবিক নয়। প্রকৃতির যে নিয়ম, সেই নিয়মের বাইরে কেউ যাইতে পারে না। নদীর স্বাভাবিক গতিপথকে যদি রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তবে নদীর জলরাশি অস্বাভাবিক উপায়ে হইলেও উহার গতিপথ সৃষ্টি করিয়া নিবে। ইহাই প্রকৃতিদত্ত নিয়ম। পৃথিবীতে এই নিয়মের ব্যত্যয় কখনো ঘটে নাই, ঘটিতেও পারে না। বাংলাদেশে মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের নাম করিয়া যে ব্যবস্থাটি দাঁড় করানো হইতেছিল, আপামর দেশবাসীর মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে গোটা ব্যবস্থাটি সেখানে মুষ্টিমেয় দ্বারা কুক্ষিগত করা হইয়াছিল, বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল গণ মানুষের নিয়মতান্ত্রিক আত্মপ্রকাশের পথ। এই সর্বগ্রাসী ব্যবস্থার দ্বারা মানুষ নিষ্পেষিত হইতেছিল, ভাঙ্গা বুকের যাতনা ও হতাশা তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছিল। এর যে কোথায় শেষ, কেহ ভাবিয়া পাইতেছিল না। এই অবস্থায় প্রকৃতির নিয়মেই একটা পথ সৃষ্টি হইয়াছে। বলা যায়, মুষ্টিমেয় কিছু লোকের দ্বারা কুক্ষিগত সেই সর্বগ্রাসী ব্যবস্থার ফলেই বর্তমানের রাজনৈতিক পরিবর্তনটি দেশের সর্বাত্মক পরিস্থিতির দুঃসহ অবস্থায় অবধারিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই নূতন রাজনৈতিক পরিবর্তনটি সাধিত হইয়াছে প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে, সেনাবাহিনীর দ্বারা। এই পরিবর্তন সাধনে তরুণ সামরিক অফিসারদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বলা যায়, দেশের একটা অসম্ভব

দুঃসহ অবস্থার বিলোপ ঘটাইয়াছেন তাঁরা এবং জাতির সামনে সৃষ্টি করিয়াছেন চলার উপযোগী পথ ও সুযোগ। এই কাজের জন্য তাঁরা গোটা জাতিরই অভিনন্দন লাভের যোগ্য। গোটা জাতি যে সময় দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় শুধু নিচের দিকে তলাইয়া যাইতেছিল, সেই সময় তাঁরাই জীবনের ঝুঁকি নিয়া এই পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। ব্যক্তি পর্যায়ে কাহারও জন্য দুঃখ–শোক বা সহানুভূতি প্রকাশের চাইতেও জাতীয় স্বার্থের দিকটা বড় করিয়া দেখার যে আবশ্যকতা, সেই বিবেচনায় এই নতুন রাজনৈতিক পরিবর্তনকে স্বাগত জানাইতে হইবে।

তবে রাজনৈতিক পরিবর্তনের যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস তাহা সাময়িক। সাধারণ মানুষকে যখন রূঢ় বাস্তবের মোকাবেলা করিতে হয়, ভাত কাপড়ের সমস্যায় পড়িয়া দিশাহারা হইতে হয়, তখন রাজনৈতিক পরিবর্তনের আনন্দ উচ্ছ্বাস মিলাইয়া যায়। অতএব, রাজনৈতিক পরিবর্তনের এই সূচনাকে গণ-মানুষের অর্থনৈতিক ভাগ্যোন্নয়ন ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের কাজে রূপান্তরিত করিতে হইবে। এই কথা মনে রাখা দরকার, সূচনাতে কোনো কিছুরই শেষ নয়, শেষ উহার পরিণতি ও ফলাফলে। একটি ঐতিহাসিক সূচনা যাহাতে উহার সমস্ত সম্ভাবনা লইয়া সাধারণ মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত হয় তাহা সর্ব প্রযত্নে নিশ্চিত করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে বিগত সাড়ে তিন বছরের সময়কালের ভিতর নানা রকমের মতবাদ ও পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালু, করিতে গিয়া দেশের পঙ্গু অর্থনীতিকে একেবারেই শয্যাশায়ী করিয়া ফেলা হইয়াছে। দেশের সীমিত সম্পদ, পুঁজি এবং অর্থনৈতিক উদ্যোগ তৎপরতাকে ব্যবহার না করিয়া চালান হইতেছিল এমন সব মারাত্মক পরীক্ষা-নিরীক্ষা যার জন্য দেশের মানুষকে দিতে হইয়াছে বহু মূল্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দেশের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প কল-কারখানাগুলিক দেশের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে লাগান হয় নাই। অর্থনীতির অনুৎপাদনশীল প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো এইগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে, ভর্তুকি দিয়া অ-লাভজনক ও দায়স্বরূপ করিয়া তোলা হইয়াছে। জনগণের টাকা দিয়া এই সকল রাষ্ট্রয়াত্ত শিল্প কল-কারখানাকে চালান হইতেছিল এবং ইহার ফল দাঁড়াইয়াছিল একটাই এবং তাহা এই যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উহা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের লুটপাটের স্থায়ী সুযোগ–সুবিধা সৃষ্টি হইয়াছিল। এই ব্যবস্থায় সামগ্রিক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা হইয়াছে দুঃসহ। দেশ দিনকে দিন শুধু বাহিরের ভিক্ষা ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় কোনো দেশ, কোনো জাতিই টিকিয়া থাকিতে পারে না। পারে না বিশ্বে মর্যাদার স্থান প্রতিষ্ঠা করিতে।

এই সকল বিষয়ে প্রেসিডেন্ট তাঁহার জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রথম ভাষণে যে মত ও বক্তব্য রাখিয়াছেন, তার সাথে আমরা একমত। প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা

ছাড়া কোনো জাতিরই প্রাণস্পন্দন ঘটিতে পারে না। নাগরিক অধিকারবোধ ছাড়া আসিতে পারে না ব্যবস্থাও থাকিতে পারে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ পুঁজি গঠন ও অর্থনৈতিক কর্মকাজে ইহা নিশ্চিত ফলপ্রসূ অবদান রাখিতে পারে।

আর একটা প্রসঙ্গে কিছু বলিয়াই আমার আজিকার বক্তব্যের ইতি টানিব। প্রসঙ্গটি বিদেশী সাংবাদিকের কলমে বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে কি লেখা হইবে সেই চিন্তা সামনে রাখিয়া কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আদৌ প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। সাংবাদিক দেশীই হউন, বিদেশী হউন, তাঁহাদের সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হউক, যাহাতে ভুল তথ্য পরিবেশনের কোনো অবকাশ না থাকে। কর্তৃপক্ষ এইরূপ ব্যবস্থা নিলে কোনো বিষয়ে ফিসফিস গুঞ্জনের কোনো কারণ ঘটিবে না। সরকার বিদেশী সাংবাদিকদের এখানে ৭২ ঘন্টা অবস্থানের সুযোগ দিয়া বস্তুতপক্ষে দূরদর্শিতার কাজই করিয়াছেন, তবে সময়সীমা নির্ধারণ না করিয়া তাঁহাদের অবাধ বিচরণের সুযোগ দিলে ব্যক্তিগতভাবে আমি আরও খুশী হইতাম। আমার ধারণা মতে, সাংবাদিকদের অবাধে সংবাদ গ্রহণের সুযোগ দেওয়াই উচিত। বিদেশী সাংবাদিকদের বেলায় বিধি-নিষেধের বা সেন্সরশিপের আদৌ প্রয়োজন নাই। তাছাড়া বাংলাদেশের অবস্থা ভালো করিয়া দেখুন, দেখিয়া লিখুন। দুনিয়া বাংলাদেশের উপর সব সময়ই সহানুভূতিশীল ছিল, এই ক্ষেত্রেও বিদেশী সাংবাদিকদের নিকট সেই সহানুভূতি আশা করা ভুল হইবে না। বিধি-নিষেধ ও সেন্সরশিপের দরুন নাহক ভুল বুঝাবুঝির আশঙ্কা ইতিপূর্বে বহুবারই দেখা দিয়েছে। দেশের ভিতর বিদেশী সাংবাদিকদের আসিতে দেওয়া না হইলেও তাঁহাদের সুযোগ-সুবিধামতো যে কোনো স্থানে বসিয়া বাংলাদেশের অবস্থার উপর রিপোর্টিং হইতে পারে। আমাদের প্রেসিডেন্ট বরাবরই সৎ সাংবাদিকতার উপর শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাবান এবং নীতিগতভাবে তিনি স্বাধীন সংবাদপত্রের বিশ্বাসী। সুতরাং এই ক্ষেত্রেও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোনো অবকাশ থাকিতে পারে না। অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিটি বিন্দুকে কাজে লাগানোর চিন্তা করিতে হইবে। সত্য বটে, অনেক সময় অনেক নাজুক অবস্থা বিরাজ করে। তখন মনে হইতে পারে কোনোরকম অবাঞ্ছনীয় বা বিরূপ মন্তব্য অবস্থাকে হয়ত আরও নাজুক করিয়া তুলিতে পারে। ইহার সবই সত্য, কিন্তু সৎ সাংবাদিকের কলমের উপর আস্থা রাখাই শ্রেয়। এই ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধা বা সংশয় সাংবাদিকের কলমের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করিতে পারে। আনিয়া দিতে পারে সহানুভূতির বদলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলাফল। বিদেশী সাংবাদিকরা বাংলাদেশকে বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়া অনুভব করিলে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকারণের সূত্রে সমুদয় পরিস্থিতিকে যাচাই

ও বিচার-বিশ্লেষণ করিলে ইহাতে আমাদের উপকার ছাড়া অপকার হইবে না, এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

এই বিশ্বাসও আমাদের আছে যে, বাঙ্গালি জাতি সব পর্যায়ে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের একটা সুযোগ লাভ করিয়াছে। জাতিকে এখন সংহতি ও একতার দিকে পরিচালিত করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে এই রূঢ় বাস্তবতা যে, জাতিকে সুপরিকল্পিতভাবে টুকরা টুকরা করার চেষ্টা চলিতেছিল। নব পর্যায়ে দূর করিতে হইবে এই অনৈক্য ও বিশৃংখলা। অবিশ্বাসের দৃষ্টিকে পরিহার করিয়া সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণের সুরকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। দেশের মানুষের মতো স্বস্তি ও শান্তির ভাব ফিরাইয়া আনার যে সূচনা করা হইয়াছে, উহা সফল ও স্থায়ী হউক, এই প্রত্যাশাই করিতেছি।

## ৭. পরিশিষ্ট

## আমার দৃষ্টিতে আগস্ট বিপ্লব
## মাওলানা আবদুর রহিম

(ক) ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রাস্তায় যে ঘটনা সংগঠিত হয়, আমার মতে একটি যুগান্তকারী অনিবার্যিক ঘটনা। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্ববর্তী ও তার পরবর্তী সময়ের মধ্যে যে পার্থক্য, আমি মনে করি উক্ত ঘটনা নীতিগতভাবে পূর্ণ মাত্রায় ও বাস্তবে আংশিকভাবে সেইরূপ পার্থক্যের সৃষ্টি করেছিল। ১৬ ডিসেম্বরের পূর্বে বাংলাদেশ নামে কোনো স্বাধীন দেশের অস্তিত্ব ছিল না পৃথিবীর মানচিত্রে, আর উক্ত ১৫ই আগস্টের পূর্বে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন হলেও কার্যত ছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অধীন। কিন্তু তার পরে বাংলাদেশ নীতিগতভাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ অস্তিত্ব লাভ করে প্রধানত ভারতের সাহায্যে, কিন্তু কার্যত তা পাকিস্তানের পরিবর্তে ভারতের অধীনতার নাগপাশে নতুন করে বন্দী হয়। কার্যত তা ভারতের বিজিত অধিকৃত একটি অঞ্চলে পরিণত হয়। ভারতের আচরণে তা একটি ভারতীয় রাজ্যের মর্যাদা পায়। এখানকার প্রেসিডেন্ট ভারতীয় রাজ্যের রাজ্যপাল এবং প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। ভারতীয় পত্র পত্রিকায় এইরূপ প্রচারণাই চালানো হয়।

কিন্তু ১৫ই আগস্ট সে অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে একটি প্রকৃত স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদার দিকে অগ্রযাত্রা করতে সমর্থ হয়। যদিও পর মুহূর্তেই তা কাটিয়ে ওঠা-অনেক বন্ধনে নিজেকে পুনরায় বেঁধে ফেলার চেষ্টা চলে। ভারতের প্রতি অনুগত থাকার প্রতিশ্রুতিও নতুন করে উচ্চারিত হয়। তাকে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতা বলে অনায়াসেই চিহ্নিত করা যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানকার জনগণ সে বন্ধন থেকে মুক্তি প্রাপ্তির স্বস্তি লাভ করতে সমর্থ হয়; তারা প্রকৃত স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। তারা ১৬ ডিসেম্বর পূর্ববর্তী অবস্থার প্রতি ঘৃণা প্রকাশের সাথে ১৫ আগস্টের পূর্ববর্তী অবস্থার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা করতে শুরু করে প্রকাশ্যভাবে।

তাই আমার দৃষ্টিতে ১৫ই আগস্টের ঘটনা স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য একটি

অনিবার্যিক, বাঞ্ছনীয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্ববহ ঘটনা। তা না ঘটলে আজকের বাংলাদেশের জনগণের সামগ্রিক চেতনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অকল্পনীয়ই থেকে যেত।

(খ) সেদিন লোক চক্ষুর অন্তরালে যা কিছু ঘটতে যাচ্ছিল তা এতই ভয়াবহ যে, এখন তার কল্পনা করলেও শরীর শিউরে উঠে। সম্ভবত পরিকল্পনা ছিল তদানীন্তন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টকে ভারতের ভাইস প্রেসিডেন্টের মর্যাদার অভিসিক্ত করা হবে এবং বাংলাদেশের নিজস্ব সামরিক বাহিনীকে নিরস্ত্র করে এ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় পঞ্চাশ হাজার সেনানী অবস্থান গ্রহণ করবে। তার উপর লিখিত দলিলে স্বাক্ষর গ্রহণ এবং সেনানী অবস্থানের স্থান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ হেলিকপ্টারে করে ভারতীয় ৮ জন জেনারেল সেই মুহূর্তে বাংলাদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

এ খবর অনেকেরই গোচরীভূত হয়ে থাকবে যে, সেদিন একটি ভারতীয় হেলিকপ্টার এন্টিএয়ার ক্রাফটের সাহায্যে নামানো এবং ৮টি লাশ সীমান্ত পথে ভারতের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছিল।

খোদা–না–খাস্তা ১৫ই আগস্টের ঘটনা সংঘটিত না হলে আজকের বিপুল মুসলিম সংখ্যাধিক সম্বলিত বাংলাদেশ অধিকৃত কাশ্মীরের অবস্থায় পৌঁছে যেত এবং এ দেশকে একটি আদর্শিক ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করার ও সংগ্রামের কোনো অবকাশেরই চিন্তাধারা সম্ভবপর হতো না। স্বাধীনতা ও জাতীয় অস্তিত্বের নাম চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেত না।

(গ) তাই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি,

যাঁরাই ১৫ই আগস্টের ঘটনার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা মুক্তিযুদ্ধেরই একটি অসমাপিত অধ্যায়কে সম্পূর্ণতা দানের অনিবার্যিক বিপ্লবী পদক্ষেপই গ্রহণ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায় ৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর অতিবাহিত হয়নি তা হয়েছিল, '৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট; অতএব তা মুক্তিযুদ্ধের মতোই তারও বেশি তুলনাহীন বিপ্লবী পদক্ষেপ এবং তা স্বাধীন বাংলাদেশ ও তার নয় কোটি মুসলিম অধিবাসীর সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তারই ফলশ্রুতি, এতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। এই ঘটনাই বিশ্ব সমাজের সম্মুখে রক্তের আঁখরে লিখে অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশের জনগণ শুধু যে ১৬ ডিসেম্বর পূর্ববর্তী অবস্থার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন তাই নয় তারা ১৫ই আগস্টের পূর্ববর্তী অবস্থার প্রতি তার চাইতেও অধিকতর ঘৃণা পোষণ করেন, তাঁরা নামকা ওয়াস্তের স্বাধীনতার ভিলাষী নন, তারা প্রকৃত আঞ্চলিক ও বাস্তব স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। স্বাধীনতার অন্তঃসারশূন্য শ্লোগান দিয়ে তাদের ভোলানো সম্ভব নয়, প্রকৃত স্বাধীনতা নীতিগত, আদর্শগতভাবে যেমন তাদের কাম্য, তেমনি বাস্তবতার নিরিখে উত্তীর্ণ প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য তারা শেষ রক্তবিন্দু দিতেও কুণ্ঠিত নয়।

(২) ১৫ আগস্ট যাঁরা বিপ্লব করেছিলেন, তাঁরা ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে প্রথমেই ঘোষণা করেছিলেন যে, বাংলাদেশকে ইসলামী গণপ্রজাতন্ত্র বানাবার উদ্দেশ্যেই এই বিপ্লব ঘটেছে। আমার দৃষ্টিতে এই বিপ্লবের অন্য কোনো লক্ষ্য থাকা কল্পনীয় নয়। কেননা তারপরে যদি সঠিকভাবে পূর্ববর্তী অবস্থাই বিরাজ করতে থাকে, তাহলে এই রক্তপাত সম্পূর্ণ নিষ্ফল এবং একেবারেই তাৎপর্যহীন। এ বিষয়ে বিপ্লবীরা কতটা ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন তা আমার জানা নেই। তবে এ পর্যায়ে কিছু না কিছু পরিকল্পনা থাকা স্বাভাবিক– এটাই আমি বলতে পারি। তবে বিপ্লবের পরে তাৎক্ষণিকভাবে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, তা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার সহিত কিছুমাত্র সামঞ্জস্যশীল নয়।

কেননা সেই, প্রথম ঘোষণার পর আর কখনই তা ঘোষিত হয়নি। না হওয়ার কারণ কি তা আমার সম্পূর্ণ অজানা। তবে পরে প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীমণ্ডলে যাদেরকে দেখা গেল তারা তো সেই আগের ব্যবস্থারই ধারক বাহক এবং তারা কোনো দিনই ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন না। শুধু তাই নয়, সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র এই চার মূলনীতি সংজোযিত করে ভারতের শাসনের সহিত সাদৃশ্য বিধান করা হয়েছিল, শাসনতন্ত্রে তা পুরোপুরি বহাল থাকল, যদিও প্রেসিডেন্ট পদে সমাসীন ব্যক্তির স্বীয়পদের বৈধতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী তাৎক্ষণিকভাবেই করে নেয়া হয়েছিল।

আমি বলব এ সব কারণে আগস্ট বিপ্লবকে কেন্দ্র করে যে প্রত্যাশা দেশবাসীর মনে জেগে উঠেছিল তা অনতিবিলম্বে বিলীন হয়ে গেল। জনগণ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে গেল। এই ব্যাপারে চরম হতাশা, নৈরাশ্য ও ভীতির সঞ্চার হলো আরো গভীরভাবে, তখন ২রা নভেম্বর সম্পূর্ণ ভিন্নতর অবস্থা দেখা দিল। এই ভিন্ন অবস্থার রূপ কি ছিল, তার ব্যাখ্যা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সেই সময় জনগণের মধ্যে একটা ভয়াবহ প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছিল। তা আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম। এই অবস্থা ৬ই নভেম্বর পর্যন্ত বিরাজ করে। ৭ই নভেম্বর অবশ্য বাংলাদেশের আকাশে সমাচ্ছন্ন পঞ্জীভূত ঘনঘটা হঠাৎ করে মিলিয়ে নিয়ে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ উদ্দীপনার নবপ্রবাহ বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে, পথে-ঘাটে, সড়ক-রাজপথে লক্ষ্য করা যায়—তারা যেন সেদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছিল এবং মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল।

অতঃপর ২৪শে নভেম্বর থেকে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহিত সরকারের আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে যায়। রাজনৈতিক দলসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বীকৃতির আশ্বাস পাওয়া যায় এবং উদারভাবে রাজনৈতিক তৎপরতা চলবে এবং প্রত্যেকটি দল স্বীয় মতামত অনুযায়ী তৎপরতা চালাতে পারবে বলে লোকদের মনে বিশ্বাস জন্মে। ৭৬ সন এমনি ভাবেই অতিবাহিত হয়। এই বছরই

বাকশাল জগদ্দল পাথরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে রাজনৈতিক দলসমূহ নিজ নিজ অস্তিত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

(৪) আগস্টে বিপ্লব ঠিক কাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল, সে বিষয়ে আমার কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। কর্নেল রশীদ ও কর্নেল ফারুকের নাম অবশ্য পত্রপত্রিকা বা লোক পরম্পরায় শুনেছি এবং এও শুনতে পেরেছি যে তাঁরা সেই ঐতিহাসিক ৬ই নভেম্বরের পর থেকে বিদেশে নির্বাসিত হয়ে আছেন এবং এখন পর্যন্ত তাঁরা দেশের বাইরেই রয়েছেন।

এ পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, তারা বিদেশে কি স্বেচ্ছায় বসবাস করছেন? না বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাদের উপর দেশে প্রবেশাধিকার হরণ করা হয়েছে? অন্ততঃ আগস্ট বিপ্লবের পরবর্তী কোনো সরকারের নিকট যে তাঁরা এমন কোনো অপরাধ করেননি সে জন্য তাঁরা বিদেশে অবস্থান করতে বাধ্য হতে পারেন। কেননা আগস্ট বিপ্লব না হলে এ সব সরকার যে কোনো দিনই ক্ষমতায় আসতে পারতেন না তা বোঝাবার জন্য যুক্তির অবতারণার প্রয়োজন পড়ে না। তাদের বা তৎপরবর্তী বর্তমান সময়ের সকল ক্ষমতাসীন সরকারের ক্ষমতায় আসা আগস্ট বিপ্লবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান, তা কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যেতে পারে না। অতএব পরবর্তী প্রত্যেকটি সরকারেরই যে সাধারণ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ– অন্ততঃ নাগরিক অধিকার ও মানবিকতার দিক দিয়ে তাঁদের সম্মানজনক প্রত্যাবর্তন এবং দেশের সুনাগরিক হিসেবে ভূমিকা পালনের সুযোগ দান বাঞ্ছনীয়, তা আমি অকপট বলতে চাই।

(৫) বাংলাদেশ ভারতীয় রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ যুদ্ধের ফলে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। অতঃপর ৭৫ সনের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ভারতেরই প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলাদেশের উপর অব্যাহত থাকে। তাকে আরো গভীর ভাবে দানা বাঁধিয়ে তুলেছিল ভারতের সহিত বাংলাদেশের ২৫ বছরের শোষণ চুক্তি। এই চুক্তির ৯ ও ১০ ধারা বাংলাদেশের প্রকৃত স্বাধীনতাকেই হরণ করেছে।

কিন্তু বাংলাদেশের তদানীন্তন শাসকরা শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র ভারতের অধীনতায়ই সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারতে নামকা ওয়াস্তের হলেও কিছু না কিছু গণতন্ত্রের ধারা রক্ষিত রয়েছে। ফলে নির্বাচনের মাধ্যমে ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু বাংলাদেশের তদানীন্তন শাসকরা ক্ষমতা হস্তান্তরিত হোক তা কোনো ক্রমেই চাচ্ছিলেন না। দেশের রুশপন্থী কমিউনিস্টরা শাসকদের এই মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশে রুশীয় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করার মন্ত্রে তাদের অত্যাচার জুলুম নিপীড়ন শোষণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার কোনো সুযোগ কারুর জন্য থাকবে না। এ রূপ অবস্থায়ই নিশ্চিন্তে ক্ষমতাসীন হয়ে থাকার নির্ভেজাল আনন্দটুকু উপভোগ করা যেতে পারে। ফলে আজীবন গণতন্ত্রবাদী হয়েও শেখ মুজিব জাতীয়

সংসদে মাত্র ১৩ মিনিটে বাকশাল কায়েমের প্রস্তাব পাস করিয়ে নিয়ে নিরীহ নয় কোটি মানুষের মাথায় শেল মারতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই বাকশাল পদ্ধতি রুশীয় কমিউনিস্ট ডিকটেটরি শাসনেরই পরিকল্পনা। সকল রাজনৈতিক দল বেআইনী ঘোষণা করে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল, দেশের প্রেসিডেন্টই এই একমাত্র দলের প্রেসিডেন্ট, জনগণের মুখপাত্র সকল পত্র-পত্রিকা বেআইনী করে মাত্র চারটি সরকারি পত্রিকা রেখে জনমত নিস্তব্ধ করে দেয়া এবং দেশের কল-কারখানা ব্যবসায়–বাণিজ্য ও ক্ষেত–খামার একান্তভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রিত হওয়ার মতো নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা শাসকদের জন্য আর কি হতে পারে।

কিন্তু এ বাকশাল এ দেশের আপামর জনগণের উপর ছিল সকল ও মানবিক অধিকার হরণের জগদ্দল পাথর। ১৫ আগস্টের বিপ্লব এই পাথরকে চিরতরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল যেন কোনো দিনই এ দেশের গণমানুষের উপর অনুরূপ অবস্থার প্রচ্ছায়া আর কোনো দিনই প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।★

---

★ কট্টোর সাম্প্রদায়িক নেতা হিসেবে পরিচিত মাওলানা আবদুর রহিম ছিলেন একজন কুখ্যাত কলাবরেটর। পাক হানাদার বাহিনীর দালালী করার জন্য তার কারাদণ্ড হয়।

## ৮. পরিশিষ্ট

### ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সনে খন্দকার মোশতাকের ভাষণ

"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানের রাহিম"
আসসালামু আলায়কুম,

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সত্যিকার ও সঠিক আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দানের পূত দায়িত্ব সামগ্রিক ও সমষ্টিগতভাবে সম্পাদনের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা ও বাংলাদেশের গণমানুষের দোয়ার উপর ভরসা করে রাষ্ট্রপতি হিসেবে সরকারের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে। বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের বজ্রকঠিন দায়িত্ব সম্পাদনের পথ সুগম করার জন্য বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সত্যিকারের বীরের মত অকুতোভয় চিত্তে এগিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস্, রক্ষীবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য ও আস্থা প্রকাশ করেছেন। এরা সবাই একযোগে কাজ করে যাচ্ছেন। ত্রিশ লক্ষ বীর শহীদানের পূতরক্ত এবং দুই লক্ষ মা-বোনের পবিত্র ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলার সংগ্রামী মানুষকে নতুন জীবনের আস্বাদ ও সন্ধান দেবে এবং স্বাধীন সার্বভৌম দেশ সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে আমরা মাথা উচিয়ে দাঁড়াবো এই ছিলো আমাদের লক্ষ্য ও কামনা। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বন্ধুদেশের অনেককে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। কিন্তু বিগত দীর্ঘকাল দেশের ভাগ্য উন্নয়নের কোন চেষ্টা না করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা এবং সেই ক্ষমতাকে স্থায়ীভাবে আঁকড়ে রাখার ষড়যন্ত্রের জল রচনা করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে শুধুমাত্র দাবার চাল চালা হয়েছে। এবং দেশবাসীর ভাগ্য উন্নয়নকে উপেক্ষা করে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং অন্যকে বঞ্চিত করে এক শ্রেণীর পৃষ্ঠ-পোষকদের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করা হয়েছে। কতিপয় ভাগ্যবানের স্বার্থসিদ্ধির অপচেষ্টায় জনগণের জীবনে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান অগ্নিমূল্য অসহনীয় হয়ে পড়ে।

দেশের শিল্প বিশেষ করে পাটশিল্প ধ্বংসের মুখে। অর্থনৈতিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছায়, যেখানে বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষ দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও অর্থনৈতিক নির্যাতনের অসহায় শিকারে পরিণত হয়।

একটি বিশেষ শাসনচক্র গড়ে তোলার লোলুপ আকাঙ্ক্ষায় প্রচলিত মূল্যবোধের বিকাশ ও মানুষের অভাব-অভিযোগ প্রকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়, এই অবস্থায় দেশবাসী একটি শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে অব্যক্ত বেদনায় তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল।

দেশের শাসন ব্যবস্থার বিবর্তন সর্বমহলের কাম্য হওয়া সত্ত্বেও বিধান অনুযায়ী তা সম্ভব না হওয়ায় সরকার পরিবর্তনের জন্য সামরিক বাহিনীকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী পরমতম নিষ্ঠার সংগে তাঁদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে দেশবাসীর সামনে সম্ভাবনার এক স্বর্ণদ্বার উন্মোচন করেছেন।

এখন দেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে দ্রুত নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোরতম পরিশ্রম করতে হবে। সর্বপ্রকার কলুষ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। দেশে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং মানুষ যাতে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই জন্য সমাজে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশপ্রেমিক সকল নাগরিকের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সর্ব অবস্থায় বাংলাদেশের মানুষ মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সম্প্রীতি অটুট রাখতে ইনশাআল্লাহ আমরা সচেষ্ট হবো। সমাজের প্রতি তার প্রতিটি মানুষের নাগরিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সকলকে সেই অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। শান্তি ও শৃংখলার সঙ্গে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালু রাখতে হবে।

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে সমতা, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও একে অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অব্যাহত থাকবে। সরকার জোট নিরপেক্ষ নীতি সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করতে থাকবেন।

আমাদের সরকার জাতিসংঘ সনদ ও নীতিমালার প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল। দ্বিপাক্ষিক বা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের সম্পর্ক নির্ধারণকারী সকল চুক্তি ও দায় সম্পর্কে সরকার মর্যাদাশীল থাকবে। বর্ণবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদ বিরোধী আমাদের নীতি অব্যাহত থাকবে। ইসলামী সম্মেলন, কমনওয়েলথ এবং জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও শরীকানা অব্যাহত থাকবে। বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দৃঢ়তর করার প্রচেষ্টাও আমরা অব্যাহত রাখবো। এখনো পর্যন্ত যাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়নি সেই দেশের সঙ্গেও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমরা ইনশা-আল্লাহ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো।

"সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এবং কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়"—এই নীতির রূপরেখার মধ্যে আমরা শান্তি ও প্রগতির পথে আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবো। সরকার বিশেষভাবে উপমহাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রচেষ্টা নিচ্ছেন। ইসলামী সম্মেলন, কমনওয়েলথ রাষ্ট্রসমূহ, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন এবং বৃহৎ শক্তিসমূহের সঙ্গে এই সরকার ঘনিষ্ঠতর এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। সরকার ইসরাইলের কবল থেকে আরব পুণ্যভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য আরব ভাইদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম, ফিলিস্তিনী জনগণের ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবে। খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।"

## ৯. পরিশিষ্ট

### ৩রা অক্টোবর ১৯৭৫ সনে খন্দকার মোশতাকের ভাষণ

আস্‌সালামু আলায়কুম,

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

গত ১৫ই আগস্টের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পর আমাদের জাতীয় জীবনে সম্ভাবনাময় যে নতুন দিগন্ত দেখা দিয়েছে, আর সে সম্ভাবনা সম্পর্কে দেশবাসীর মধ্যে যে সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়েছে, তা সত্যই প্রশংসার ও আশাপ্রদ। ১৫ই আগস্ট রাতে পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আমি আপনাদের খেদমতে আমার বক্তব্য রেখেছিলাম। সেদিন এবং আজকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র পঞ্চাশটি দিনের। গণমন ও গণমানসিকতার পরিমণ্ডলে ইতিমধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই পরিবর্তনের নিরিখে আমরা একে অন্যকে আরও নিবিড় ও একান্তভাবে বোঝা ও জানার সুযোগ পেয়েছি।

এই পঞ্চাশটি দিনের মধ্যে সরকারকে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক পর্যায়ে অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে কতকগুলো সিদ্ধান্ত নিতে ও কার্যকর করতে হয়েছে।

প্রতিরক্ষা, পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনসহ সর্ব পর্যায়ে চাহিদা মেটানোর জন্য প্রশাসন ব্যবস্থাকে সাজাতে হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশবাসীকে দেশের সত্যিকারের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিব করার জন্য শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। আর্থিক জগতের প্রতিকূল শক্তিসমূহকে অনুকূল ও কল্যাণমুখী করবার জন্য একটি অর্থনৈতিক টাস্ক ফোর্স কর্মরত আছে। তাঁদের সুপারিশনুযায়ী কৃষি, শিল্প, পাট ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং দেশবাসী আপামর জনগণ সেগুলোর কিছু কিছু সুফল পেতে শুরু করেছেন বলেই আমাদের ধারণা।

প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য সরকার জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

১৫ই আগস্ট ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পর চীন, সৌদি আরব আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই স্বীকৃতি দানের জন্য আমরা আনন্দিত। উপমহাদেশে সম্পর্ক

স্বাভাবিকীকরণের উদ্দেশ্যে এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে পাকিস্তানের সঙ্গেও আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন আশু প্রয়োজন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসহ সকল দেশের সঙ্গে আমাদের ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক আরোও দৃঢ় ও উন্নত করাই হবে আমাদের প্রয়াস। আমাদের পররাষ্ট্র নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট। 'সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এবং কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়' এই মৌল কাঠামোর মধ্যে আমরা জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করব। আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা ভূমণ্ডলীর সমরনীতিতে আমাদের কোন ভূমিকা পালনের অবকাশ নেই। সমস্যা সঙ্কুল আমাদের দেশ। ক্ষুধা, ব্যাধি, দারিদ্র্য, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্যই আমরা আমাদের সর্বশক্তি একনিষ্ঠভাবে ব্যয় করব। এই সব সমস্যার সমাধানে আমরা বিশ্বের সব বন্ধু রাষ্ট্রের সাহায্য ও সহানুভূতি চাই।

বাঙ্গালী জাতি ঐতিহ্যগতভাবে এবং প্রাকৃতিক কারণে কতগুলো সনাতন ও চিরন্তন মূল্যবোধে বিশ্বাসী বলে আমার বিশ্বাস। এই মূল্যবোধের সহজাত শক্তির নিজস্ব গতি ও প্রকৃতির বাহনে বাঙ্গালী জাতি ও জাতীয়তাবাদীদের উন্মেষ। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে এই শক্তি ভিন্ন ভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছে। রাষ্ট্রীয় জীবন বা রাজনৈতিক স্তরে বাঙ্গালী নাগরিকস্বত্বা গণতান্ত্রিক আচার–আচরণ, বিধি–ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক অনুশীলনে অভ্যস্ত। ১৯৪৭ সালে যে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিসমাপ্তি হয়েছিল, সে সংগ্রাম ছিল গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং বিজয় ছিল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিজয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত বাঙ্গালীরা দাবী আদায়ের যত সংগ্রাম করেছেন, তার সব সংগ্রামই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলীর মাধ্যমে বৃহত্তর জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন এবং অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম।

বাংলাদেশের মানুষ সামাজিকভাবে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা ও বিবর্তনের ধারক ও বাহক। বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত বাঙালীদের সামনে যতগুলো রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তার সবকটিরই জওয়াব তাঁরা সঠিকভাবে দিয়েছেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে জনগণ কোন দিনই তাঁদের সঠিক সিদ্ধান্তের স্বাভাবিক ও স্থায়ী ফলশ্রুতির অধিকারী হতে পারেননি। অবশ্য, অন্যদিকে ঘটনাপ্রবাহ যতই প্রতিকূল হোক না কেন, জাতি হিসেবে বাঙ্গালীরা সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে ও করণীয় কর্তব্য সম্পাদনে কোন দিনই পিছপা হননি। ১৯৭১ সালে নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা অভূতপূর্ব ও অকল্পনীয় এক অভিন্ন সিদ্ধান্ত দিয়ে গোটা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন। পরবর্তীকালে অতীতের মত এবারও ব্যালটের সিদ্ধান্ত বানচাল হতে দেখে গোটা জাতি রুখে দাঁড়ায় এবং শূন্য হাতে বুক পেতে দিয়ে বুলেটের মোকাবিলা করে। ব্যালটের মর্যাদা রক্ষার জন্য বুলেটের মোকাবিলা করবার মত

সংগ্রামী চেতনাবোধের নজির পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল। বাঙ্গালীরা এই বিরল ইতিহাসের মহানায়ক। কিন্তু এক শ্রেণীর অনুপস্থিত যোদ্ধা এবং কিছু কিছু অসাধু ও তথাকথিত যোদ্ধাদের যৌথ আঁতাতের বেদীতে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বলির অপেক্ষায় এ যাবৎকাল অসহায় হয়ে থাকতে হয়েছে।

স্বাধীনতার পর অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই জাতি একটা গণতান্ত্রিক ও বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত সংবিধান আদায় করে নিয়েছিল। এই সংবিধানের অধীনে দেশবাসী গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক এবং গণতান্ত্রিক বিধি–ব্যবস্থা আচরণ ও সংরক্ষণকারী একটা জাতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচিত করেন। জনগণের আমানতের খেয়ানত করে, নেতৃত্ব জনগণের ম্যান্ডেটের চরমতম অবমাননা ও অপব্যবহার করেছেন। তাঁদের প্রয়োজনের চাহিদায় গোটা জাতিকে ন্যক্কারজনকভাবে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে তাঁরা ইতিহাসের প্যারডি রচনা করতে উদ্যোগী হলেন। আর, এই উদ্যোগের অশুভ শক্তির রোলারের নিচে জাতীয় ধ্যান–ধারণা ও সত্ত্বা নিস্পষ্ট হল। গোটা জাতির পেছনে দুর্লংঘ্য একটা প্রাচীর ছাড়া কিছুই আর থাকল না। যেহেতু অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে জাতীয় সত্ত্বাকে বা জাতির আত্মাকে মরণপণ করে সামনে এগুতে হল এবং ১৫ই আগস্টের নতুন সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে হল। সমগ্র জাতীয় অস্তিত্ব মুক্তিদাতার রূপ পরিগ্রহ করল সেনাবাহিনীর অসম সাহসী সূর্য সন্তানদের মধ্য দিয়ে।

নতুন সূর্য রথের সারথি হয়ে আমাকে আসতে হয়েছে। আমাদের সামনে ছিল নিমজ্জমান নয় নিমজ্জিত একটা তরীকে উদ্ধার করা এবং তাকে নিরাপদে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব। দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে আমরা সচেতন আছি এবং আমাদের যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আমরা সতর্ক। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। গণমানুষের সার্বভৌমত্বের আমরা দাবীদার ও দিশারী। কিন্তু সার্বভৌমত্বের অধিগ্রহণ ও তার অনুশীলন সঠিক ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে না করলে পদে পদে সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত ও হৃত হয়। স্তর পরম্পরায় সমাজকে এই সত্যের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সত্যাশ্রয়ী হয়ে এ ধরনের ঘটনাপ্রবাহের পুনরাবৃত্তি সর্বশক্তি দিয়ে রোধ করতে হবে। সত্য স্বীকারের মধ্যে কোন অগৌরব নেই। সম্মানজনক ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে সমাজের সক্রিয় স্তরের অনেকেই নিজেদের ভূমিকা সঠিকভাবে আমরা পালন করতে পারিনি। অন্য কথায় অনেকেই আমরা দুশমনদের পাতা জালে জড়িয়ে পড়েছিলাম। ফলে পরে আমাদের প্রমাণ করতে হয়েছে যে, আমরা মরিনি। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, এই মৃত্যুর মধ্য দিয়েও আমরা ক্ষমাহীন আত্মপ্রসাদ লাভ করবার চেষ্টা করেছি।

এই আত্মপ্রসাদজনিত আত্মপ্রবঞ্চণার প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই আমাদের করতে হবে। আমি ও আমার সরকার এবং গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচিত সংসদ নির্ভেজাল পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, দেশবাসী

গণতন্ত্র চান এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মাধ্যমে বেআইনী অস্ত্রধারী, দুর্নীতিবাজ ও অগণতান্ত্রিক শক্তির মোকাবিলা করতে তাঁরা সমর্থ। আমরা মনে করি ধৈর্য নিষ্ঠা ও পরমতে সহিষ্ণুতা বিশ্বজনীন মূল্য ও মর্যাদাবোধের আলোকে রাষ্ট্রীয় চারটি মৌলনীতির ভিত্তিতে সুখী, সমৃদ্ধ, কলুষমুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব। তাই, আজ লায়লাতুল কদরের পরম পবিত্র রাত্রে করুণাময় আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহ ও দেশবাসীর শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে তাঁদের হৃত গণতান্ত্রিক অধিকার আমি ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭৬ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা ও কাজকর্মের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হবে এবং ১৯৭৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রাপ্ত বয়স্কদের বিশ্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সার্বভৌম পার্লামেন্ট গঠন ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার কায়েমের জন্য দেশব্যাপী জাতীয় নির্বাচন ইনশা আল্লাহ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রণয়ন এবং আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করবার ব্যাপারে আজ থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হওয়ার সময় অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট ১৯৭৬ সাল এবং ১৯৭৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন পর্যন্ত প্রয়োজনের তুলনায় সময় কম। এতদসত্ত্বেও আমরা এই জাতীয় কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। দেশে গণতান্ত্রিক পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টির জন্য এখন থেকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে আটক বন্দীদের আমরা বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দেশবাসী জেনে খুশী হবেন যে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক মতবাদের কারণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে হুলিয়া বা গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি নেই। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতারকৃত রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের সত্যাসত্য যাচাই করবার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। আনীত অভিযোগ অসত্য বা ভিত্তিহীন বলে প্রতিপন্ন হলে সংশ্লিষ্ট আটক ব্যক্তিদের সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হবে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী বিধায় আমরা বিচার বিভাগকে তার নিজস্ব সম্মানজনক আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এই কারণে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা মালিকানা হরণ করায় আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তেছে। আমরা মনে করি, সরকারী মালিকানায় সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা সম্ভব নয়। এই সংবাদপত্র তিনটিকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমরা সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে সমস্যার সমাধানের নামে আরও অব্যবস্থা চালু করবার পক্ষপাতী আমরা নই।

দেশবাসীর হৃত অধিকারসমূহ পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, অধিকার আমাদের ছিল এবং অধিকার আমরা হারিয়ে ছিলাম। সে সব ক্রিয়াকাণ্ডের স্রোতধারা আমাদের অধিকারের পরিমণ্ডল থেকে ভাসিয়ে নিয়ে

বঞ্চনার মহাসাগরে নিক্ষেপ করেছিল, সেই সব ক্রিয়াকাণ্ডের নায়কেরা এবং তাদের অনুসারীরা সমাজে আজও বিরাজমান। তারা সুযোগের অপেক্ষায় আছে এবং তারা ক্লীবের পূজারী। অস্ত্র এবং গণতন্ত্র এক সঙ্গে যায় না। সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও যারা বেআইনী অস্ত্র সমর্পণ না করে ধারণ করে আছে, তারা নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক নয়। যারা বেআইনী অস্ত্রধারী তাদের হাতেই গণজীবনের শান্তি বিপন্ন। তাদের কারণেই মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারে না এবং তাদের দ্বারাই মা-বোনদের ইজ্জত বিনষ্ট হয়। বেআইনী অস্ত্রধারীরাই স্বার্থবাদী বাংলাদেশ বিরোধী শক্তির ক্রীড়নক হয় এবং রাজনীতির ন।.ম দেশ ও দশের স্বার্থের বিরুদ্ধে বিকারগ্রস্তের মত অশুভ তৎপরতা চালায়। এরাই পা পছন্দ না হওয়ার কারণে কাপড় পরে না এবং বিড়ি ধরানোর জন্য ঘর জ্বালায়। গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিলেই গণতন্ত্র আসে না। গণতন্ত্র আসার পথের সব কাঁটা তুলে ফেলে দেওয়ার দায়িত্ব জনগণ ও সরকারের। কিন্তু গণতন্ত্র কায়েম রাখতে হবে গণ মানুষেই সার্বিক প্রয়াস ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতা উত্তর কালে মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্ব বোধের ক্ষেত্রে যে বিরাট ধ্বংস নেমেছে, ইন্দ্রজালের মাধ্যমে তাকে মেরামত করা যাবে না। অথচ তা মেরামত না করলেও আমাদের চলবে না। এই ধ্বংসের বিভীষিকা থেকে অবশ্যই আমাদের দ্রুত বেরিয়ে আসতে হবে এবং বেরিয়ে আসার একটাই পূর্বশর্ত সেই হচ্ছে নিখাদ-নির্ভেজাল চরিত্র। চরিত্রবান ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বই সব চাইতে শক্তিশালী। জাতীয় ভিত্তিতে এই শক্তিকেই আমাদের আহ্বান করতে হবে এবং বিভিন্ন স্তরে অটুট এই শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই মহা প্রয়াসে অধৈর্য বা অহনশীল হলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব নয়। আমাদের অনেকেই স্বভাববশত বিরুদ্ধবাদী এবং হুজুগে ও গুজবে মাতে। তাদের মতবাদ সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু নাকের পরিবর্তে আমরা যেন নরুন দিয়ে আত্ম প্রবঞ্চনা না করি। আমরা যেন নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করবার মত সর্বনাশা খেলায় আর মেতে না উঠি। সুযোগকে বিনষ্ট করবার শক্তিসমূহ সুসংগঠিত। অপরদিকে সুযোগ গ্রহণকারীরা সাধারণত নিষ্ক্রিয় শান্তিবাণী এবং উদাসীন। প্রচলিত এই ব্যবস্থার আশু অবসান হওয়া উচিত। যুক্তিবাদী মন ও মানসিকতা নিয়ে এবং ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়বার প্রবণতা পরিহার করে সুন্দর শোভন, মননশীল ও কলুষহীন ভবিষ্যতের দৃঢ় বুনিয়াদ পত্তনের জন্য আমি সবিনয়ে বাংলদেশের সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

১৯৭১ সালে আমরা যে স্বাধীকার অর্জন করেছি, সে স্বাধীকারকে স্বাধীনতায় রূপান্তরিত করবার ব্যাপারে ব্যর্থতার জন্য অতীতের উপর দোষারোপ করে ফায়দা হবে না। আমাদের ভাগ্য আল্লাহর উপর নির্ভর করে আমাদেরই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সমৃদ্ধ লাভের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ততম কোন পথ নেই। নিজের সম্পদ ও পেশীর শক্তির উপর নির্ভর করে দৃঢ় মনোভাবের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করবার মধ্যে সমৃদ্ধির

চাবি লুকানো। দেশের জন্য স্বনির্ভর অর্থনীতি অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে নিজেদের বাঁচার এবং বিশ্বদরবারে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াবার তাগিদে। দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে যেমন প্রতিটি নাগরিককে রক্ষা করতে হবে নিজ দায়িত্বে ও প্রাণপণে ঠিক তেমিন স্বাধীনতাকে অর্থবহ করবার জন্য আমাদের স্বনির্ভর হতে হবে। বাংলার মাটি থেকেই আমাদের ফসল ফলাতে হবে। বাংলার শ্রমিকের পেশীতে ও মনে অদম্য শক্তি আছে। শক্তির আর অপব্যবহার না করে সে শক্তিকে আরও অধিক উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে হবে। আমরা অনেক ধ্বংস কর্চ্ছি। আর নয়। আসুন সবাই ধ্বংস থেকে ক্ষান্ত হই এবং গড়বার কাজে নিয়োজিত হই। আসুন সবাই বাসযোগ্য একটা দেশ গড়ে তোলার জন্য কর্মের জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলি।

এই পবিত্র রাতে আমাদের সকলের প্রার্থনা উদয়ের পথে আমাদের যাত্রা হোক শুভ, তমাসাচ্ছন্ন রাত্রিশেষে উদয়গগনে যে নবীন সূর্য উঠেছে, সে সূর্যের কিরণে অবগাহন করে পাপ পঙ্কিল জরাজীর্ণ আমাদের দেশটি নিষ্পাপ প্রাণবন্ত জীবনের জনপদ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হোক বিশ্বদরবারে। অচিরেই আকাশে এক ফালি বাঁকা চাঁদ উঠেছে। আমাদের জীবনের সর্ব প্রকার দুঃখ, দৈন্য ও ক্লেশ সত্ত্বেও ওই চাঁদ ঘরে ঘরে আনন্দ ও খুশীর সওগাত বহন করে আনবে। পবিত্র ঈদের এই আনন্দের দিনকে উপলক্ষ করে দেশবাসী সকলের প্রতি আমি আমার আন্তরিক ঈদ মোবারক জানাচ্ছি।

আপনাদের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের হাতে ভবিষ্যতের দায়দায়িত্ব তুলে দেওয়ার প্রতীক্ষায় আমি সত্যনিষ্ঠ হয়ে অপেক্ষা করছি। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

## ১০. পরিশিষ্ট

### মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তার এদেশীয় ঘাতকরা ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫-এর কালরাত্রিতে যাঁদের হত্যা করেছে ঃ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব।
জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাত।
জনাব শেখ ফজলুল হক মনি।
জনাব শেখ আবু নাসের।
বেগম সামশুন্নেসা মনি।
শেখ কমাল।
শেখ জামাল।
শেখ রাসেল (বঙ্গবন্ধুর ৮ বছরের কনিষ্ঠ পুত্র)।
বেগম সুলতানা কামাল।
বেগম রোজী কামাল।
জনাব শহীদ সেরনিয়াবাত (আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ভ্রাতুস্পুত্র)।
বেবী সেরনিয়াবাত (ঐ কন্যা, বয়স ১৪ বছর)।
আরিফ সেরনিয়াবাত (ঐ পুত্র, বয়স ১২ বৎসর)।
বাবু সেরনিয়াবাত (ঐ দৌহিত্র, বয়স ৫ বৎসর)।
নান্টু (ঐ ভাগিনেয়)।
কর্নেল জামিল।
বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে কর্তব্যরত ডি. এস. পি।
এ ছাড়া বঙ্গবন্ধুর ও আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়ির কয়েকজন কর্মচারী।
গুলিতে আহত ঃ
বেগম আবদুর রব সেরনিয়াবাত।
বেগম আবুল হাসনাত অবদুল্লাহ (ঐ পুত্র বধূ)।
বিউটি সেননিয়াত (ঐ কন্যা)।
আবুল খায়ের আবদুল্লাহ (ঐ ভ্রাতুস্পুত্র)।
হেনা সেরনিয়াবাত (ঐ কন্যা)।

## ১১. পরিশিষ্ট

### দেশবাসীর প্রতি মেজর জলিল ও আ. স. ম. রবের আহ্বান

প্রিয় দেশবাসী,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

গোটা দেশ ও জাতির এক সংকটময় মুহূর্তে আমরা আপনাদের সামনে এই প্রচারপত্রের মাধ্যমে হাজির হচ্ছি। এর আগে একটি প্রচারপত্র আমরা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যার সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রেখেছি। আমরা আশা করেছিলাম বর্তমান সরকার দেশবাসীকে তাদের পবিত্র দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করবেন। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় এই যে, সরকার আমাদের প্রস্তাবিত সোজা, সরল ও বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণের পরিবর্তে কথার ধাঁধা সৃষ্টি করে চোরাপথে জাতির সার্বভৌমত্বকে বলি দেবার অপচেষ্টা করছেন। জাতীয় পরিস্থিতির দ্রুত অবনতিকে অবিলম্বে রুখে দাঁড়ানোর জন্য আমরা আপনাদের সামনে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ও বাস্তবমুখী কর্মসূচি পেশ করছি।

আপনারা জানেন ১৯৭১ সনের ডিসেম্বর মাসে মুক্তিযুদ্ধের পর পরই ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে যেয়ে এবং ১৯৭২ সনের মে মাসে শেখ মুজিবের ভারত-রাশিয়া ঘেষা আত্মঘাতি নীতি ও কুশাসনের বিরোধিতা করায় আমাদেরকে জেল-জুলুমসহ বহু নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। অবশেষে শেখ মুজিবের চরম জনপ্রিয়তার মুখেও আমরা ভারত-রাশিয়া-আমেরিকার কবল থেকে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার জন্য এ দেশের সত্যিকারের "জনতার গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তসহ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাড়ে সাত কোটি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির পথকে সুগম করার জন্য ১৯৭২ সনের অক্টোবর মাসে জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল (জাসদ) গঠন করি। সে মুহূর্তে আমার ছাড়া এ দেশের অন্য কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী বা অন্য ব্যক্তি শেখ মুজিবের কুশাসনের বিরুদ্ধে এবং ভারত-রাশিয়া-আমেরিকার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রতিবাদ উচ্চারণ করেনি। শেখ মুজিবের চরম নির্যাতনমূলক শাসনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জাসদ

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ ও জাতীয় কৃষক লীগের কর্মীরা দেশবাসীকে রাজনৈতিকভাব সচেতন ও সংগঠিত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ দেশের শতকরা ৯৭ জন শ্রমিক–কৃষক–ছাত্র–যুবক–মধ্যবিত্ত–বুদ্ধিজীবী–ব্যবসায়ীসহ আপামর জনসাধারণ আমাদের ডাকে সাড়া দেয় এবং সমর্থন যোগায়। শেখ মুজিবের ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য আমরা খুবই গোপনে অথচ তৎপরতার সাথে গড়ে তুলি সারা দেশব্যাপী মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, প্রাক্তন সৈনিকদের সমবায়ে "বিপ্লবী গণবাহিনী"। অতি গোপনে আমরা সংগঠিত করি বাংলাদেশের প্রতিটি সেনানিবাসের সৈনিক ভাইদেরকে "বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার" মাধ্যমে। এ সবের খানিকটা আঁচ করতে পেরে শেখ মুজিব আমাদেরকেসহ জাসদ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জাতীয় শ্রমিকলীগ, জাতীয় কৃষক–লীগের দশ হাজারেরও বেশি কর্মীকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। হত্যা করে এক হাজারেরও অধিক কর্মীকে। কিন্তু এ সত্ত্বেও কাজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে। সে সময়ে জাসদ অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলকে নিয়ে শেখ মুজিবের ফ্যাসিবাদী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে।★

খোদা হাফেজ

১৫ নভেম্বর, ১৯৭৫ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

★ এই প্রচার পত্রটির প্রয়োজনীয় অংশটি মাত্র এখানে তুলে দেয়া হয়েছে।

## ১২. পরিশিষ্ট

### কর্নেল ফারুক ও রশীদের সাক্ষাৎকার–১

প্রশ্ন ঃ ১৫ই আগস্টের বিপ্লব জাতিকে একটি সম্ভাবনাময় নতুন প্রভাত উপহার দিয়েছে এবং একদলীয় স্বৈরাচারের জগদ্দল পাথর থেকে জাতিকে মুক্তির নবদিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। বিপ্লবী পদক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বস্তরের জনগণের পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে নজীরবিহীন সমর্থন অভিব্যক্ত হয়েছে তাতে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, জনগণ দীর্ঘ দিন থেকে এমন একটি মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। বিপ্লবের চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে আপনারা কিভাবে জনগণের এই অনুকূল মনোভাব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন?

জবাব ঃ (ক) এ ব্যাপারে আমরা গভীর আস্থাবান ছিলাম যে, জনগণ এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের তরফ থেকে আমরা পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা পাব। সত্যি কথা বলতে কি, সর্বস্তরের জনগণের পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ও নিরংকুশ সমর্থন ও সহযোগিতা না পেলে বরং আমরা বিস্মিত হতাম।

(খ) ইউনিট কমান্ডার হিসেবে সেনা সদস্যদের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং আমরা সাধারণ সৈনিকদের মনোভাব জানতাম। আর সে কারণেই আমরা আন্তরিকভাবে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে কখনও কুণ্ঠিত হইনি। আমরা কোনোরূপ দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়াই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছি।

(গ) বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সৈনিকরা দেশ মাতৃকারই সন্তান এবং বাংলাদেশের জনগণের মত আমরাও ছিলাম ভুক্তভোগী। অন্যদিকে মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীও জনগণের খুব নৈকট্য লাভ করে।

প্রশ্ন ঃ আগস্ট বিপ্লবের তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যসমূহকে চিহ্নিত করবেন কি?

জবাব ঃ তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ঃ আগ্রাসী বহিঃশক্তির মদদপুষ্ট গণবিরোধী আওয়ামী বাকশালী স্বৈরাচারের সুকঠিন শৃংখল থেকে মুক্তির স্বপ্ন ছিনিয়ে আনা এবং জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ঃ বিপ্লবের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য পূরণের অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে জাতীয় আর্থ-সামাজিক শক্তির স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ বিকাশের মাধ্যমে স্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতিতে সঠিক ধারায় বিপ্লবী পরিবর্তন সূচিত করা। বিপ্লবের এই পর্বটি সম্পন্ন হবার পরে আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল ঃ বাংলাদেশকে তার স্বাভাবিক গতিধারায় পরিচালিত করে একটি আঞ্চলিক আর্থ-সামাজিক শক্তির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং একই সাথে বিশ্ব ইসলামী ঐক্যকে সংহত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

প্রশ্ন ঃ কেউ কেউ আগস্ট বিপ্লবকে কতিপয় অসন্তুষ্ট সামরিক অফিসারের হঠকারী পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করতে চান। এ প্রশ্নের জবাবে আপনারা কি বক্তব্য রাখবেন?

উত্তর ঃ এটা সত্যের অপলাপ মাত্র। ১৯৭২ সালের শেষের দিকেই সামরিক বাহিনীর অধিকাংশ অফিসারের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আমাদের মুক্তি সংগ্রামের কষ্টার্জিত সাফল্যকে আত্মসাৎ করা হয়েছে এবং একটি আগ্রাসী শক্তির কাছে মীরজাফররা দেশের আজাদী বন্ধক দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সকলেই অনুভব করছিলেন যে, দেশে মারাত্মক একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

শেখ মুজিবসহ বহু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতার সাথে দেশের ভয়াবহ অত্যাসন্ন বিপর্যয় নিয়ে সামরিক বাহিনীর বেশ কিছু উচ্চপদস্থ অফিসার ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন। তারা শেখ মুজিবের মনোভাব বদলাতে চেয়েছেন, কিন্তু শেখ মুজিবের ঔদ্ধত্যের কাছে সকল আন্তরিক প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। উপরন্তু ঐ সব দায়িত্বশীল দেশপ্রেমিক অফিসারকে তাদের সরলতা ও দেশপ্রেমের জন্য বিভিন্ন কায়দায় তিরস্কৃত ও অপদস্থ হতে হয়েছে।

১৯৭৩ সালের শেষের দিকে অধিকাংশ বিজ্ঞ সামরিক অফিসারের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, দেশের এই সংকটকলে কিছু একটা করা উচিৎ। কিন্তু কেউই এটা নির্ণয় করতে পারছিলেন না যে, কিভাবে সে দায়িত্বটা পালন করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে আগস্ট বিপ্লবের সংগঠকরা ১৯৭৩ সালের শেষদিক থেকেই পরিস্থিতির উপর তীব্র নজর রেখে আসছিলেন। তাঁরা গোটা পরিস্থিতি নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নির্ধারণ করার ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে একটি যৌক্তিক কার্যক্রমের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে বিস্তারিত কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় এবং একটি খসড়া সময়সূচিও নির্ধারণ করা হয়। গোপনীয়তা রক্ষা করার স্বার্থেই বিস্তারিত কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে জন্য প্রায় ৬ মাস কেটে যায়। কেননা এটি বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের কার্যকরণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত চূড়ান্ত আঘাত হানার দুটি নির্ধারিত সময়সূচি ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, দুটি বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিপ্লবের মহড়াও অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে ১৫ই আগস্ট ছিল চূড়ান্ত

পদক্ষেপ গ্রহণের সর্বশেষ সময়সূচি। ১৫ই আগস্টের মধ্যে আমাদের কাছে এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ১৫ই আগস্ট হচ্ছে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মোক্ষম সময়। চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ১২ই আগস্ট ও ১৪ই আগস্টের মধ্যবর্তী সময়কে বেছে নেয়া হয়। পরিকল্পনা কার্যকরী করার আদেশ প্রদান করা হয় ১৫ই আগস্ট এবং ঐ দিনই সূর্যাস্তের অব্যবহিত পর থেকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়। উপরিউক্ত বিস্তৃত ব্যাখ্যা থেকে এটা খুব সহজেই বোঝা যায় যে, ১৫ই আগস্টের পদক্ষেপ আকস্মিক বা হঠকারী সিদ্ধান্তের ফল নয়। দ্বিতীয়তঃ এটা স্বীকার করতে দোষ নেই যে, আমরা অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ ছিলাম সত্য, কিন্তু সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সদস্য ও দেশের সাধারণ মানুষ কেন বিক্ষুব্ধ ছিল? আপনি কি চান যে আমরা এবং দেশের বাকী জনগণ আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা ও অধিকার হারিয়েও অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ না হয়ে বিদেশী শক্তির মদদপুষ্ট আওয়ামী বাকশালীদের পুত্রদের মীরজাফরী ভূমিকায় সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকতাম?

প্রশ্ন ঃ ১৫ই আগস্টকে কেন্দ্র করে দেশে বেশ কিছু গুজব চালু আছে। আপনারা এই পটভূমিতে জাতিকে সঠিক তথ্য জানানোর কোন দায়িত্ব অনুভব করেন কিনা? বিপ্লবের প্রকৃত ঘটনা প্রবাহ জাতিকে অবহিত করাবার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি?

জবাব ঃ এ খবর আমরা রাখি। ১৫ই আগস্টের বিপ্লবী পদক্ষেপ নিয়ে দেশে যথেষ্ট গুজব চালু আছে। এ সব আমরা জানি। তবে আমরা আশাবাদী যে, সময়ে এ সব গুজবের ফানুস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমরা জনগণকে প্রকৃত সত্য জানাবার জন্য সব সময়ই প্রস্তুত। জনগণ চাইলেই আমরা ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়ের পর্দা উন্মোচিত করবো।

আমরা নিজেরা কিছু বিশ্লেষণধর্মী পেপারওয়ার্ক তৈরি করছি, যাতে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির প্রকৃত দিক-নির্দেশিকা থাকবে। অবশ্য জনগণ যদি সেটা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকেন, তবেই এই ধরনের প্রত্যাশা পোষণের সার্থকতা থাকতে পারে।

প্রশ্ন ঃ কেউ কেউ মনে করেন যে, আগস্টের সকালে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এর কোনটাই করা হয়নি। আপনারা এই হত্যাকাণ্ডের স্বপক্ষে আপনাদের যুক্তি-তথ্য পেশ করবেন কি?

জবাব ঃ শেখ মুজিব, শেখ মনি এবং আবদুর রব সেরনিয়াবাত এই তিন জনের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিপ্লবীদের কাছে আত্মসমর্পণ করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতার মদমত্ততা এবং তাদের স্বভাবসুলভ অহমিকা তাদেরকে এতটা অন্ধ করেছিল যে, আত্মসমর্পণের পরিবর্তে এরা গুলিবর্ষণ করতে থাকে। এতে বেশ কয়জন বিপ্লবী সৈনিক ও অফিসার আহত হন এবং কয়জন মৃত্যুবরণ করেন। ফলে বিপ্লবীরা নিজেদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে গ্রেনেড

নিক্ষেপ করেন ও স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলিবর্ষণ করে মীরজাফরদের দুর্গগুলো বিধ্বস্ত করে দিতে বাধ্য হন। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির শিকার হয়ে অনেকেই ঘরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।

তবে এটাও সত্য যে, শেখ মুজিব, শেখ মনি ও আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ব্যাপারে বিপ্লবীদের এই সিদ্ধান্ত ছিল যে, দেশ ও জাতির স্বার্থে চরম বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে বিচারের মাধ্যমে ফায়ারিং স্কোয়াডে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

শেখ মুজিব এবং তার সহযোগীরা যে পদ্ধতি চালু করেছিলেন, সেই পদ্ধতিতে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে তাদেরকে গণ আদালতে বিচার করার কোন পথ খোলা ছিল না। তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হলে আমাদের বিপ্লবী কার্যক্রম সফল করার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণকে আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক আগ্রাসনের কবল থেকে মুক্ত করা সম্ভব হত না।

প্রশ্ন ঃ ১৯৭৫ সালের ৩রা ও ৪ঠা নভেম্বরের ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে প্রভ্যক্ষভাবে কে বেশি লাভবান হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন।

জবাব ঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান, অধিকাংশ উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার এবং উর্ধ্বতন সরকারি আমলারাই এর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের মত নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের একটি দেশ রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামের ভূমিকাকে কিভাব মূল্যায়ন করতে চান?

জবাব ঃ প্রচলিত অর্থে ইসলাম একটি ধর্ম মাত্র নয়। পরিপূর্ণভাবেই ইসলাম একটি আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক জীবন দর্শন এবং সমগ্র মানবতার জন্য ইসলামের আবেদন সমভাবে সত্য। যারা স্বেচ্ছায় ঘোষণা করে যে, "আল্লাহ ছাড়া সার্বভৌম মা'বুদ নেই, মুহম্মদ রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ তাদের জন্য ইসলাম হচ্ছে জীবন পথের অনস্বীকার্য একটা দিক-নির্দেশিকা। এই মৌল বিশ্বাসকে যারা মুখে স্বীকার করবেন এবং জীবনে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করবেন তারাই মুসলমান।

সুতরাং আমরা মনে করি, শতকরা নব্বই ভাগ ধর্মপ্রাণ মুসলমানের দেশে কোন ধরনের ইজম'রাষ্ট্র পরিচালনার দিক-নির্দেশিকা হবে, সে প্রশ্নে কোন সওয়াল জবাবের অবকাশ থাকতে পারে না। সংখ্যালঘুদের অধিকার অবশ্যই সংরক্ষিত ও সুনিশ্চিত করা হবে, তবে সেটা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ন্যায়সংগত অধিকারের বিনিময়ে নয়।

এ ব্যাপারে যদি আমরা এক মত হই যে, নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান, তাহলে কোন ব্যক্তি, দল ও সংগঠনের পক্ষে ইসলামের পরিপন্থী কোন ইজম প্রতিষ্ঠার দাবী জনগণের ইচ্ছার চূড়ান্ত অস্বীকৃতি বলে চিহ্নিত হতে বাধ্য। কিন্তু যদি কোন প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তি, দল বা সংগঠন বাংলাদেশের সংখ্যালঘু

জনগোষ্ঠীর আবেগ ও ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট হয় তবে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদের স্বাধীনতা রয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায়, সংখ্যালঘুদের প্রতি সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীকে হতে হবে সহনশীল ও মানবিক আচরণে উদার। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষায় সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীকে অবশ্যই সক্রিয় ও সচেতন হওয়া দরকার। বিশেষতঃ ইসলাম সংখ্যালঘুদের সর্বাত্মক স্বার্থে নিরাপত্তা দানের যে নিশ্চয়তা দিয়েছে, বর্তমান সভ্যতা তার চেয়ে কোন ভালো ব্যবস্থা দিতে পারেনি।

বাংলাদেশের জাতীয় নীতি প্রণয়নে কোন ধরনের ইসলামী পদ্ধতি উপযোগী ও প্রয়োগযোগ্য, সেটা নিয়েই কেবল আলোচনা হতে পারে। যদি এই অযৌক্তিক সমীকরণ গ্রহণযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হয়, তাহলে আমরা খুব স্পষ্টভাবেই বলতে চাই যে, জাতীয় দিক-নির্দেশ চিহ্নিত করার প্রশ্নে কোন দ্বিধা সংশয়ের প্রশ্নই উঠে না। ঠিক একই ভাবে রাজনৈতিক প্রবঞ্চনা ও শঠতার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণকে লক্ষ্যহীনতার দিকে ধাবিত করারও কোন অবকাশ থাকবে না।

**সাক্ষাৎকার-২**

প্রশ্ন ঃ ১৯৭৫ সনের ৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থান সম্পর্কে অনেকেই মনে করেন; ওটা ছিল আসলে ক্ষমতা দখলের জন্য রুশ-ভারতের অনুগত চক্রের একটি অপপ্রয়াস। ৩রা নভেম্বরের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ উপরোক্ত ধারণা আংশিক সত্য। ওটা অভ্যুত্থান ছিল না; ছিল সেনাবাহিনীর কতিপয় হিংসুক, পরশ্রীকাতর ও উচ্চাভিলাষে অন্ধ সামরিক অফিসারের বিদ্রোহ। বস্তুতঃ ১৫ই আগস্টের সফল বিপ্লব ও তার প্রতি দেশের আপামর গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন, তাদের মধ্যে হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার উদ্রেক করে। রুশ-ভারতের এজেন্টরা সে সময় চেয়েছিল ক্ষমতা দখল করে দেশে ভয়াবহ গোলযোগ সৃষ্টি করতে।

প্রশ্ন ঃ ৭ই নভেম্বরের বিপ্লব কিভাবে সংঘটিত হয়েছিল বলে আপনারা মনে করেন?

উত্তর ঃ পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৫ই আগস্টের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ অনন্য বলে বিবেচিত। প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্কন্ধে জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণের যে নৈতিক দায়িত্ব অর্পিত, ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট তারিখে সেনাবাহিনীর সে দায়িত্বই নিষ্ঠার সাথে পালন করেছে (অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে সেনাবাহিনীকে এই দায়িত্ব সাধারণতঃ পালন করতে না দিয়ে তাদেরকে দিয়ে সরকার এবং শাসকদের নিরাপত্তা বজায় রাখা হয়)। প্রতিরক্ষা বাহিনীর উল্লিখিত নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্যের জন্যই তারা জনগণ কর্তৃক সম্মান এবং প্রশংসা লাভ করেন। রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল্যবোধ ১৫ই আগস্টের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ-এর মাধ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭৫ সনের ৭ই নভেম্বর হচ্ছে আর একটি অনন্য

ঐতিহাসিক ঘটনা যেদিন কোনরূপ নেতৃত্বের অপেক্ষা না করে সিপাহী জনতা স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার অভিন্ন উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই ধরনের গতিশীল ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে যদি। (১) জনগণকে তাদের অধিকার অর্জন ও কর্তব্য পালনে নিরংকুশ স্বাধীনতা দেয়া হয় (২) যদি অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য নির্ণীত হয় যেখানে জনগণ জাতি হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করতে পারে) এবং যদি (৩) বস্তুনিষ্ঠভাবে জাতীয় দিক নির্দেশ নিরুপণ করা যায় (যার মাধ্যমে ব্যক্তি এবং জাতির কল্যাণ সমভাবে অর্জিত হবে)। উল্লেখযোগ্য যে, আগস্ট বিপ্লবের মাধ্যম গৃহীত স্বপ্লকালীন বৈপ্লবিক পদক্ষেপ–এর ফলে উপরোক্ত তিনটি শর্তের বীজ কার্যকারীভাবে রোপিত হয়েছিল। তাই ৭ই নভেম্বরের সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান ছিল আসলে ১৫ই আগস্টের বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত গতিশীল জাতীয় ঐক্যের অনুরণন এবং বিস্ফোরণ। ১৯৭৫ সনেরই ৭ই নভেম্বরের পর যে সব সামরিক ও বেসামরিক নেতা নিজস্ব স্বার্থ ও লোভ চরিতার্থ করার দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত হয়েছে তারা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারেনি এবং কখনও পারবে না। একমাত্র ১৫ই আগস্ট ও ৭ই নভেম্বরের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বার্থে নিজের একীভূত করা ছাড়া ব্যক্তি ও জাতীয় পর্যায়ে কেউ সাফল্যলাভ করতে পারবে না।

প্রশ্ন ঃ ৩রা নভেম্বর বিদ্রোহ সংগঠনের পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণগুলো খোলামেলাভাবে আপনারা বলবেন কি? সেই সময়কার চিফ অব স্টাফ হিসেবে জেনারেল জিয়াউর রহমানের ভূমিকা ও দায়িত্ব কি ছিল?

উত্তর ঃ আমরা পূর্বেই বলেছি যে, সেনাবাহিনীর কতিপয় নগণ্য সংখ্যক অফিসার হিংসা, উচ্চাভিলাষ এবং পরশ্রীকাতরতায় জড়িয়ে সুগভীর ষড়যন্ত্রের ক্রীড়ানকে পরিণত হয়েছিল। সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ হিসেবে জেনারেল জিয়াউর রহমান চায়নি যে, বিপ্লবের পর পরই বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা কিংবা পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্য থেকে কাকেও প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ করা। তিনি এটাও চাননি যে, দেশে তাড়াতাড়ি একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করে তার সাথে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে। অতৃপ্ত বাসনা, উচ্চাভিলাষ এবং লোভ জেনারেল জিয়াকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, তিনি চাইতেন, যে কোনো মূল্যে প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হওয়া। যার জন্যে ৩রা নভেম্বরের বিদ্রোহের জন্য তিনি যে কেবল দায়ীই ছিলেন তাই নয়, বরং সে বিদ্রোহের তিনি ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এর জন্য তিনি বাকশাল ও জাসদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। এর প্রমাণ নিম্নোক্ত ঘটনাবলিতেই স্পষ্ট–

১। একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

২। জাতীয় শত্রু ও গণবিরোধী শক্তিসমূহের পুনর্বাসন এবং ৩রা নভেম্বরর বিদ্রোহ সংগঠনকারী অফিসারদের নানাবিধ সুযোগ–সুবিধা প্রদান।

৩। ১৫ই আগস্ট এবং ৭ই নভেম্বরের বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী দেশরক্ষা বাহিনীর হাজার হাজার লোককে চাকুরী থেকে বরখাস্ত, কারারুদ্ধ এবং মৃত্যুদণ্ড প্রদান।

৪। খন্দকার মোশতাককে অন্যায়ভাবে ভিত্তিহীন ও মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাকে রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা।

৫। কর্নেল ফারুককে মিথ্যা অভিযোগে কারারুদ্ধ করা।

৬। আমাদের দুই জনকে (রশিদ এবং ফারুক) অন্যায় ও অবৈধভাবে এবং জোর করে নির্বাসনে প্রেরণ।

প্রশ্ন ঃ আপনারা প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সর্বদাই একজন ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তি ও ৩রা নভেম্বরের বিদ্রোহের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু দেশের প্রায় সর্বমহল এই মর্মে অবহিত যে, ৩রা নভেম্বরের বিদ্রোহীরা তাকে আটক করে রাখে এবং ৭ই নভেম্বরের সিপাহী জনতা তাকে বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্ত করে আনে। এতদসংক্রান্ত কোন্ তথ্যগুলো সঠিক?

উত্তর ঃ প্রথমে কথা হচ্ছে তার স্বসৃষ্ট স্টাইলে নিজের বাসভবনে তিনি আটক ছিলেন। দ্বিতীয়ত ঃ তিনি তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ও পদাতিক বাহিনীর একটি কোম্পানির প্রহরাধীন ছিলেন। সেখানে তার ব্যক্তিগত স্টাফ অফিসারও ছিলেন। বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি নিজে কোন উদ্যোগই নেননি। উপরন্তু প্রতিরক্ষাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এই ব্যাপারে তাঁকে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি বিদ্রোহ দমন করতে অস্বীকার করেন। তাঁর বাসভবনের টেলিফোন বারবারই সম্পূর্ণরূপে কাজ করছিল। তার স্ত্রী আমাদের এই মর্মে নিশ্চিত করেছিলেন যে, তিনি গ্রেফতার কিংবা আটকাবস্থায় নেই। টেলিফোনে তার সাথে কথা বলতে চাইলে তার স্ত্রী জানান যে, তিনি কতিপয় সামরিক অফিসারের সাথে আলাপ করছেন। এরপর বঙ্গভবন থেকে তাকে যতবারই ফোন করা হয়েছে ততবারই তিনি ফোনে কথা বলতে অস্বীকার করেন। পরবর্তীতে অর্থাৎ ৭ই নভেম্বর পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেকটা বিভ্রান্তির বশবর্তী হয়েই ১৫ই আগস্টের মূল্যবোধে উজ্জীবিত সিপাহী জনতা সেই সময় দুই জনকে মুক্ত করে আনে, যে দুই জনকে (অর্থাৎ খন্দকার মোশতাক এবং জেনারেল জিয়া) ১৫ই আগস্টের পর নিয়োগ করা হয়েছিল। সিপাহী জনতা আমাদের সাথেও যোগাযোগ করেছিল যাতে আমরা দেশে প্রত্যাবর্তন করি। চিফ অব আর্মি স্টাফ–এর পদবী অপব্যবহার করে জিয়া সর্বদাই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জনগণ ও সৈনিকদের ধোঁকা দিয়েছেন।

বাংলাদেশের সব চাইতে বেশি ক্ষমতাধর ব্যক্তি হয়েও তিনি অসহায়ভাবে নিহত হয়েছিলেন তারই ঘনিষ্ঠ সহচরদের হাতে যারা এক সময় তাঁর পর্যায়ক্রমিক বিশ্বাসঘাতকতা এবং সন্ত্রাসের পেছনে মদদ যোগাতো।

প্রশ্ন ঃ এই মর্মে বিভিন্ন মহলে গুজব আছে যে, জিয়ার শাসনামলে প্রায় এক ডজনের মত ব্যর্থ অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল। এইসব ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সাথে

জড়িয়ে সামরিক বাহিনীর বহু অফিসার ও জোয়ানকে নাকি নৃশংসভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এই ব্যাপারে আপনাদের কিছু বলার আছে কি?

উত্তর ঃ এইগুলো সব গুজব এবং মিথ্যা। জিয়ার শাসনামলে একমাত্র অভ্যুত্থান করেছে তারাই যারা তাঁর সামরিক ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী এবং সেই অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন। তাঁর ঐ সব উত্তরাধিকারীদের একাংশ বর্তমানে বাংলাদেশের ক্ষমতা উপভোগ করছে। অতীতে যে সব অভ্যুত্থান সম্পর্কে গুজব ছড়ানো হয় তা ছিল আসলে পূর্ব থেকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পরিকল্পিত ব্যাপার। এইসব তথাকথিত অভ্যুত্থানের কথা জিয়া সেই সময়কার ডাইরেক্টর অব ফোরসেজ ইন্টেলিজেন্স এবং মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স ডাইরেকটরেট–এর সাহায্যে রটনা করিয়েছিলেন নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে ঃ (১) প্রতিরক্ষা বাহিনীসহ বিভিন্ন স্তরের জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহকে চিহ্নিত করার একটা ক্ষেত্র সৃষ্টি করা (২) ভয়ভীতি ও ত্রাস সঞ্চার করে তার মাধ্যমে অর্জিত ফল তাঁর রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার কাজে লাগানো এবং (৩) বাইরের জগতের সামনে নিজেকে খুব শক্তিশালী এবং স্বীয় অবস্থানকে অত্যন্ত সুসংহত প্রমাণ করা।

প্রশ্ন ঃ কর্নেল তাহেরের ভূমিকা ও পরিণতি সম্পর্কে আপনারা কি জানেন?

উত্তর ঃ জেনারেল জিয়া এবং মঞ্জুরের সাথে কর্নেল তাহেরের গভীর হৃদ্যতা ছিল। জেনারেল জিয়া কর্নেল তাহেরের মাধ্যমে জাসদের যোগসাজশে তার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার ষড়যন্ত্র করে। জিয়া ক্ষমতা দখল করার পর কর্নেল তাহেরকে নিঃশেষ করার পথ বেছে নেন। কেননা, তার মাধ্যমেই জাসদের সাথে জিয়ার যোগসূত্র রচিত হয়েছিল। তিনি এতদসংক্রান্ত সকল সাক্ষ্য–প্রমাণ গায়েব করার সিদ্ধান্ত নেন। আর এই উদ্দেশ্যে (ক) জাসদের গণবাহিনীর হাতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো ও (খ) জাসদের সাথে রাজনৈতিক যোগসাজশ ধামাচাপা দেবার জন্য জেনারেল জিয়া হিংসাত্মক পথ বেছে নেন। কেননা, এই দুটো বিষয় প্রমাণ হলে জিয়ার রাজনৈতিক মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠত।

১৫ই আগস্টের বিপ্লবের পর কর্নেল তাহের আমাদের সাথে বেশ কয়েকবার দেখা করতে আসেন। তিনি জিয়ার পক্ষ থেকে আমাদেরকে মোশতাককে অপসারিত করার প্রস্তাবও দিয়েছেন। মোশতাকের পরিবর্তে আমরা যাতে জিয়াকে প্রেসিডেন্ট মনোনীত করি, সে ব্যাপারে কর্নেল তাহেরের পীড়াপীড়ির অন্ত ছিল না। এ ক্ষেত্রে জাসদ আমাদেরকে সকল বাকশালী চক্র নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে সহযোগিতারও আশ্বাস দেন।

আমরা পূর্বাপর এই ষড়যন্ত্রমূলক কুমন্ত্রণার বিরোধিতা করে আসছি। আমরা তাদেরকে সংবিধানিক উপায়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায় নেবার পরামর্শ দিয়েছি। প্রস্তাবিত নির্বাচনে খন্দকার মোশতাকের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত প্রশ্নেও আমরা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে বলেছি যে, তিনি যদি রাজনৈতিক কার্যক্রমে

অংশ নিতে চান তাহলে নির্বাচনের ছয় মাস আগেই প্রেসিডেন্টর পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে। কর্নেল তাহেরকে আমরা আরও বলেছি যে, দেশের জনগণই হচ্ছে সবকিছুর শ্রেষ্ঠ বিচারক। জনগণই চাইলে তারা বাকশালীদের রাজনৈতিক ভাবে সম্পূর্ণ নির্মুল করতে পারবেন। আমরা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেই বিশৃংখলা বা গোলযোগ সৃষ্টির সুযোগ দিতে পারি না। জনগণ যদি জিয়াকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চায় তাহলে জিয়াকে সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব ছেড়ে নির্বাচনে অংশ নিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ৩রা নভেম্বরের বিদ্রোহের মূল লক্ষ্যই ছিল আগস্ট বিপ্লবের ফলশ্রুতিকে নস্যাৎ করা। অন্যদিকে ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা জানা সত্ত্বেও খন্দকার মোশতাক নাকি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে গড়িমসি করেন। তাঁর এই ভূমিকা গ্রহণের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। মোশতাক ইচ্ছা করেই কতিপয় জেনারেলদের সুপরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন (ক) তদানীন্তন প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা জনাব এম. এ. জি. ওসমানী (খ) নবনিযুক্ত চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ ও বিডিআর-এর ডাইরেক্টর জেনারেল মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান এবং (গ) চিফ অব আর্মি স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান।

পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করে যে, এ সব জেনারেলরা বাংলাদেশের শত্রুদের ক্রীড়ানক হিসেবে কাজ করেছেন।

এ ছাড়া যদি অন্য কোন কারণ থেকে থাকে, তবে মোশতাক নিজেই সে ক্ষেত্রে পরিষ্কার ধারণা দিতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ কারো কারো মতে, খন্দকার মোশতাকের আওয়ামী লীগ ঘেঁষানীতিই বিদ্রোহের পটভূমি তৈরি করেছে। এই ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ এটি একটি অর্থহীন যুক্তি।*

---

★ সাক্ষাৎকার দুটি কর্নেল রশিদ-ফারুক লিখিত 'মুক্তির পথ' বই হতে গৃহীত। এখানে প্রয়োজনীয় অংশমাত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে।

## ১৩. পরিশিষ্ট

### কর্নেল (অব.) শাহরিয়ারের সাক্ষাৎকার

শাহরিয়ার : তবে এটা বলতে পারি এ বিষয়ে মিটিং অনেক জায়গায়ই হয়েছে। জিয়াউর রহমান সাহেব ১৯৭৫ সনে ডেপুটি চিফ ছিলেন, ডেপুটি চিফের অনেক ফাংশান ছিল। তাই তার সাথে আমাদের অনেক সময়ই কথা হয়েছে। দেশের ভেতর তখন হানাহানি, অনিশ্চয়তা বিরাজ করছিল। সে বিষয়ে তার সাথে আমাদের আলাপ হয়েছে। এই সব আলোচনা সিনিয়র অফিসারদের নিয়েই হয়। জিয়াউর রহমান সাহেবের ঐখানে শুধু নয়, জেনারেল শফিউল্লাহ সাহেব, খালেদ মোশাররফ সাহেবের সাথেও কথা হয়েছে। আপনি যে প্রশ্ন করলেন, এই সব অভ্যুত্থানের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা সম্পর্কে .... তা অনেকেই জানতেন। 'অল দিস পিপলস্ নিউ এবাউট ইট।' তারা সকলেই এ সব বিষয়ে জানতেন। এতটুকু বলতে পারি, তখন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন বিভিন্ন অফিসার জানতেন এমন কিছু হতে পারে, তবে কিভাবে কারা কবে কি কবে তা হয়তো সবাই জানতেন না। তবে তাদের কিছু করার ছিল না। হয়তো 'অলদো দে নিউ সামথিং উইল হ্যাপেন, বাট দে ক্যান নট স্টপ ইট।' অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। অনেক কিছুই ঘটতে পারতো— অনেকভাবেই। আর্মীর মধ্যেই হবে এমন কথা নয়—'দেয়ার ওয়াজ এ হেল অফ লট অফ ফোর্সেস আউট—সাইড্ দি আর্মি।' মুক্তিবাহিনীর কাছে অস্ত্র ছিল। জাসদ একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে এমার্জ করছিল। অনেক গোপন বাহিনীও ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন ফোর্সের মধ্যে তিক্ততাও সৃষ্টি হয়। রক্ষীবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছিল। তাদের সাথে সরকারের অন্যান্য বাহিনীর সম্পর্কের বিন্যাস ছিল না। বিভিন্ন মহলের লোক বিভিন্ন লয়ালিটি নিয়ে কাজ করছে।

মেঘনা : আপনাদের সাথে কি রাজনৈতিক নেতাদেরও যোগাযোগ ছিল?

শাহরিয়ার : পলিটিক্যাল লিয়াজোঁ এক সেন্সে ছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক আলাপের একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, আমরা তাঁদের স্বাধীনতা ফোর্স হিসেবেই মনে করতাম, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পর আবার আমরা বিভিন্ন ফোর্স হোলাম। তবে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ যে বন্ধ হয়েছিল, তা নয়। এই ধরনের ব্যাপার নিয়ে অনেক রাজনৈতিক নেতার সাথে আলাপ

হয়েছে। যেমন তাজউদ্দিন সাহেবের সাথে আলাপ হয়েছে, কামারুজ্জামান সাহেব ও মোশতাকের সাথে আলাপ হয়েছিল তা আমার জানা।

মেঘনা : আগস্ট মাসের ১০-১২ তারিখে কি সিদ্ধান্ত হয়েছিল, এমন কথা অনেকেই বলেন ...

শাহরিয়ার : আগ টর ১২ তারিখে (৭৫ সনের) ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন কর্নেল শাফায়েত জামিল। ওনার সাথে আলাপ হয়েছিল। খালেদ মোশাররফ সাহেবের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। তবে কেমন করে 'অপারেশন' হবে তা হয়নি। তবে যে অবস্থা চলছিল তা যে বন্ধ করার দরকার সে বিষয়ে হয়েছে।

মেঘনা : খালেদ মোশাররফ সাহেবের 'সেন্টিমেন্ট' কি ছিল?

শাহরিয়ার : তার 'সেন্টিমেন্ট' ছিল—এগুলোর মধ্যে আমরা খামাখা জড়াব না। আমাদের আর্মড ফোর্স এখনও (১৯৭০) দেশ চালাবার মত হয়নি। অত সেন্টিমেন্টাল হলে চলবে না।

মেঘনা : ১৫ই আগস্ট ভোরের ঘটনার পর অবস্থা কিভাবে সামলান—তখন তো সামরিক বাহিনীর হাই কমান্ডার ছিল। রক্ষীবাহিনী ছিল—তাদের কাছ থেকে প্রতিরোধ না হলেও প্রতিবাদ আসেনি?

শাহরিয়ার : এ প্রশ্নটা জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ সাহেব বেঁচে থাকলে করলেই ভালো হত। এখনতো তাঁরা বেঁচে নেই। তবে তখন ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন শাফায়াত জামিল সাহেব। তিনিই একটিভ ফোর্সের কমান্ডার ছিলেন। তিনি এখনও বেঁচে আছেন। এ প্রশ্ন তাকে করলে সবচেয়ে ভাল হবে, সম্পূর্ণ উত্তর পাবেন। আর সম্ভবত তিনিই একমাত্র ব্যক্তি এখন বেঁচে আছেন যিনি এই প্রশ্নের উত্তর জানেন।*

---

★ ১৯৮৫ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত সাপ্তাহিক মেঘনা পত্রিকায় কর্নেল শহরিয়ার প্রদত্ত সাক্ষাৎকারের অংশ বিশেষ।

## ১৪. পরিশিষ্ট

# ITV INTERVIEW WITH LT. COLS. FAROOQ RAHMAN AND ABDUR RASHID ON 2ND AUGUST 1976 BY ANTHONY MASCARENHAS.

A TV Interview with Lt. Cols. Farooq and Rashid about the first Coup in Bangladesh and killing of Sheikh Mujibur Rahman on 15th August 1975 broadcast by the ITV.

Having not been a wittness to the coup which none could describe accurately it is possible to have a glimpse from the interviews given by the ring leaders. Thus an interview report received from London is reproduced below. The report is not edited and given as it has been received :

"The following interview with Lt. Cols. Farooq and Rashid was broadcast by the ITV on 2nd August 1976. They were interviewed by Anthony Mascarenhas of the Sunday times for the current affairs pogramme "World in Action."

Narrator : A year ago this month, this man, Sheikh Mujibur Rahman the President of Bangladesh was killed in a military coup. The act was all the more tragic because four years earlier he (had) led his country to independence. (Slogans).

Narrator : Tonight two Bengali army officers Lt. Col. Farooq Rashid and Lt. Col. Abdur Rashid tell why they overthrew and killed Mujib, the man who had been called the Father of Bangladesh (Slogns).

Narrator : One man close to the tragic events in Bangladesh over the last five years as journalist. Anibhony Mascarenhas. He himself was a close friend of Sheikh Mujib and it was he who first broke the story of Bangladesh's bloodly struggle for independence over Pakistan in 1971 Tonight he traces the story of last years coup and talks to the two army oficers who murdered Mujib.

Narrator : What does this coup represent?

Anhony Mascarenhas, In Third World countries there is immense

economic deprovation, its corrupton is scandelous, millions of people are ruled by a handful of politicians, if you want to change, you can't get it. Under these circumstances, the army has come to represent courts of last appeal (Music).

A.M. Sheikh Mujibur Rahman returned from imprisonment in Pakistan in January 1972 to become the father of the new State of Bangladesh. No leader, perhaps in modern times has had more pupular support. His people affectiontely called him 'Bangobandhu' which means Friends of Bangalis and they hoped he would lead them to prosperous life, but Mujib disillusioned them in the worst possible way. When he was killed four years later it was a tragedy of his won making, a tragedy of total power and the corruption that it brings. The seeds of his death lay in his attitude to the Bangladesh army. All his life. Sheikh Mujib had been persecuted by army-men and over the years had developed a hatred for all things military. He could not bring himself even to trust his newly formed Bengoli army. He once told me, "I do not want another monoster in Bangladesh" so. instead of building up his own forces, Mujib turned to India for his countury's defence. The Indian army had put him in power, so, it was to India that Mujib looked for security and he deliverately neglected his own army. At the same time Mujib created a powerful private force, the Rakshi Bahini, to keep order for him (Slogans).

A.M. Mujib's stormtroopers became the custodian of the new state, while the Bengali army and men like Cols. Farooq and Rashid were humiliated with minor border duties and antismuggling patrols. While the country starved, members of Sheikh Mujib's own party the ruling Awami League, grew rich on patronage, smuggling and manipulating the rich market. The Army watched helplessly because the Awami League was above the law, its members immune to arrest, Inevitable the young colonels began to plot his downfall.

Farooq Rahman. One of the orders, written orders, we did reveive from our Commanding Officer was that future if (we) arrested anybody, who is a Awami Leaguer or connected with the Awami Lague, we would suffer the consequences.

A. M. Was the army involved in and particular operation at that time?

F. R. Yeas we were involved in carring our these anti smuggling and various other duties fighting corruption, foodgrain movements and general stability of the country which was at that time going out of the control, the shooting and killing in the countryside.

A M. So the instructions from Mujib's office was that you should not catch Awami Leaguers involved in these things but only members of the opposition parties?

Abdur Rashid. Yes,

F. R. In fact we seemed to be having headed by a criminal organisation say for example. Mafia was running America.

A. R. He has allowed everyone to become corrupt and he did not take any action against anybody any of his Party members who has done such a crime which is inhuman and intolerable by any body.

A. M. So Mujib was intervening to protect members of his political party whenever they caught for corruption or infringement of the law, is that correct?

A. R. Yes,

A. M. Did you make any effort to make it know to Mujib that his should be changed?

A. R. Well, no, I cannot make any effort because I am just a junior officer in the army. I have no hand to tell him that you should correct yourself.

A. M. In these circumstances, could you have forced him to resign or was necessary to kill him?

A. R. As I said earlier on...but he is not an administrator, the only thing that he has got a very good quality to agitate the general mass. So he (had) remained alive it would have been very difficult for us to conclude the situation- he is being more exprienced on the political side (Slogans).

A. R. So just to stay in power he would have done any short of mischievous and at the cost of even the country.

A. M. So you would think that had Muijb remained alive he would have turned the tables on you?

A. R. Yes, that would have been his first effort.

A. M. So you had to kill him.

A. R. Yes, I had to.

F. R. I decided that he should go, but then in March 1974. I was until then a purely professional soldier. I didn't have any political understanding and one thing I did know was that if you removed him what would happen, what would be the reaction, I had to talk, read a lot, catch up on various, subjects, inncluding economics, because up until that time people had been saying that Bangladesh is not vaible State. So, I had to prove to myself that, is it not a viable State or is it because of Sheikh Mujib it is not a viable State.

A. M. Once set on removing Mujib, the young Colonels had to find someone to put in his place. Their obvious choice was a man of their own kind an armyman, so they approached Major General Zia.

F. R. The first obvious choice was General Zia, because, at least, he was not tarnished. So after a lot of arrangements I managed to see him on 20th March 1975 in the evening. General Zia said I am a senior officer. I connot be involved in such things. If you, junior officers want to do it, go ahead.

A. M. Did you specifically tell General Zia that your intention was to overthrow Sheikh Mujibur Rahman?

F. R. Remember that I was meeting the Deputy Chief of Army Staff. A Major General and if I blantly put it that I wanted to overthrow the President of the country, straightway like that there was a very good chance that he would arrest me with his own guards there and then and put me into jail, I had to go about it a bit roundabout way. Actualy, we came around it by saying that (there is) a lot of corruption, everything is going wrong, the country requires a change-- Yes, yes let us go outside and talk in the lawns.

A. M. Zia told you this?

F. R. Yes, Then we go up to lawn and I told him that we are professional solders, we serve the country, we do not serve any individual, the army, the civil (service), the Government everybody is going down the drain. We have to change it, we the junior officers, have already worked it out we want your support and your leadership; and he said, I am sorry, would not like to get involved in anything like that. If you want to do something the junior officers should do it themselves.

A. M. He didnot report you to the President, for even suggesting this.

F. R. No, but he did tell his A. D. C. that I was not to be or if I asked for interview anytime, not to be given.

A. M. You mean, after this meeting he let it be known to you that he didn't want to meet you again?

A. M. So the first man to be approached from the army backed out but General Zia waited and watched while the junior officers plotted Mujib's downfall, Within eight months the strategy would pay off. General Zia would be running the country, Denied leadership from the army, the Colonels turn to a civilian and a politician the man on the left, Khondakar Mustaque Ahmed.

A. M. Col. Rashid you and cornel Farooq made Mr. Mustaque, Preseident after Mujib's death. Did you bring him into the front before that?

A. R. Yes I had the first talk with him during the first week in August and subsequently I met him on 12th. 13th and 14th.

A. M. Did you discuss the killing of Mujib with him?

A. R. Not the killing but it has been shown in a way that they are to be removed by force from the power and it may lead to a killing of Sheikh Mujib.

A. M. Could you give me some idea what you talked about?

A. R. Yes after the discussion I asked him two perticulars questions that according to him as he was close to Seikh Mujibur Rahman I asked him that could you feel that this country can progress under the leadership of Sheikh. He said there is no possibility and I asked him that if there was no possibility, as you feel so as another political leader then why didn't you advise him to correct him. He said that, for us it is very difficult.

A. M. You mean difficult to remove or difficult to advise him?

A. R. Difficult to remove him and difficult to advise him also

A. M. Did you give him any indication of what you were planning.

A. R. He said, well if somebody had that courage and guts to do it, well, that's good think probably for the future leaders whom we are going to choose... So we just wanted to know that he had no programme of immediately going outside the country anywhere.

A. M. Did he specifically aseked you whether you would be available the next few days?

A. R. Ye.

A. M. Is that what yo asked? Is that you intention of going on 13th?

A. R. Yes.

A. M. You didnot give him any idea of the coup?

A. R. No ... beacuse how could I trust, he also might tall it do Sheikh and become his right-hand.

A. M. Did you get the impression that he was playing along with you?

A. R. Yes.

A. M.So here was another man, one of Mujib's ministers, also waiting and watching for the big moment when he knew the leader would die.

Colones Farooq and Rashid were ideally placed in Dhaka to carry out the coup Rashid commanded the 2nd field Artilary conveniently based in the capital and Farooq lead the Bengal Lancers. Bangladesh's only tank regiment. Between them they had more fire power than anything Mujib could hope to muster.

A. M. Did you have any date in mind?

F. R. Then I started thinking when it would be the bes. but at that time I had already started a series of training unit training, by which every month, twice every month, we had night-training.

A. M. You are referring to your Bengal Lancer?

F.R. Yes, the Bengal Lancers and the 2nd Field.

A. M. But this was the normal training exercise and nothing specifically to do with the killing of Mujib when this exercise was started?

F. R. No, it was specifically with the operation in mind that I started build up this thing, because you had to start the operation. Unnecessary movement or unprogrammed activities, suddenly on old nights, would be noticed, so from March I had started this night-training business so that twice a month...

A.M. Night training of the tank regiment the Bengal lancer...

F. R. And also the 2nd Field.

A. M. Coordinated with the 2nd Field Artilery, which is Colonel Rashid's regiment.

F.R. He had come back from India by this time, and I told him to do it so that if we ever did anything we would have a convenient time and place which to everybody it would look and sound normal.

A. M. Why did you pick August 15th 1975 as the day for Mujib's assassination?

F. R. First, it was a night-training, 14/15 night was one of the night-training night. Second, monsoon, In monsoon, Bangladesh is very dificult place to attack, and India, even if it did, would have tied up 6 to 8 India Army Division.

A. M. So you thought that if Mujib was removed on 15th August in the middle of the monsoon the Indians couldn't react fast enough.

F. R. Yes.

A. M. Why did you have India in mind? Did you anticipate some trouble from India?

F. R. Yes, because on of the treaties Sheikh Mujib had signed with India was (that) in case of any trouble he would call in the indian army.

A. M. So you thought that Sheikh Mujib, before he died, may have summoned the Indian troops to protect him?

A. R. Myself and Farooq are best frind .... you see he married my sister-in-law so he my brother-in-law.

A. R. You are marrid two sisters.

A. R. Yes so that why we could trust in each other and we could

discuss anything we feel like and we were both in Dhaka, he was commanding the Lancers Regiment and I was commanding the Arilery Regiment.

A. M. Lancers had he tanks...

A. R. Yes.

A. M. That is all the tanks that Bangladesh had.

A. R. Yes.

A. M. How many tanks was that?

A. R. That was 20/30 tanks.

A. M. 30 tanks- how many people involved?

A. R. It was about a total of 700 men.

A. M. 700 men. 30 tank how many guns?

A. R. I had about 18 guns.

A. M. What guns were those?

A. R. 105 mm.

A. M. You were planning to overthrow Mujib with 28 tanks, eighteen 105 mm guns and 700 men.

A. R. Yes.

F. R. But Colonel Rashid throught that it would be better to have some officers with personal grudge. So we got in some of those officers who had been retired prematurely on the 14th night.

A. M. You bought them into the .... on the night of the 14th, that is only hours before Mujib was killed.

F. R. Yes, They were told that we were planning something. You come to the new airport.

A. M. On the 15th morning between 5.00 and 5.30 you sent your teams out to their allotted tergets. What did you do? What role had you assigned yourself?

F. R. My main role was to neutralise any opposition.

A. M. The plotters expected that the opposition would be coming from the Rakshi Bahini : Seikh Mujib's personal bodyguard. There were 3,000 men of this para-milltary force in Dhaka. But they were armed with only light weapons. So the plan that Colonel Farooq divised was simple.

F. R Killing Seikh Mujib, Serniabad and Sheikh Moni. I was 99% sure that would be achieved. What I was not sure was the aftermath. For that I was used the tanks as a psychological threat.

A. M. How many tanks did you have?

F. R. We had on the road on that day 28 medium tanks.

A. M. And what armraments and ammunition did you have?

F. R. We were not issued with ammunition.

A. M. Do you mean the tanks were unarmed?

F. R. Yes.

A. M. In fact, no ammunition at all in the tanks?

F. R. No.

A. M. How did you... why did you take them out?

F. R. I did not expect that everybody would had common knowledge that we didn't have ammunition. I thought, it would be just a knowledge to a few important people that the tanks didn't have ammunition ... I mean it was of game of sheer bluff.

A. M. Colonel Farooq's tanks may have had not ammunition, but the field guns of Colonel Rashid were amply supplied. His guns began firing over the top of Mujib's house. The objective was to over-awe the Rakshi Bahini and to prevent them from going to Mujib's assistance.

A. M. So you moved on the Rakshi Bahini hed-quarters with 30 tanks.

F. R. I left the garage with 28 tanks, but when I actually came out of the second capital I had only one tank following me when I cossed the airport.

A. M. You lost the oher 27?

F. R. Got stuck up some where in the Cantonment or in the airport.

A. M. And what did you do?

F. R. I didn't anything, I just want on- broke through the wall, the perimeter wall, of the airport, smashed a couple of trees, crossed and I found a brigade of 3,000 Rakshi Bahni ined up. 6-deep. They were battle-equipped, full helmets ... and all that soit of things ... the driver said, what am I supposed to do, and I said you drive past right 6' in front of their nose; told the gunner to keep his gun pointed towards them and told the rest of them, the other chaps to look brave and we just did it like that and those chaps kept on looking at us and we kept on looking at them and I told the driver if they did start something, you just steer right and drive on.

A. M. So you were going to run over them it any opposition took place?

F. R. That was the only one thing I could think of, there was nothing else I could do.

A. M. So in point of fact, you reduced Shaikh Mujib's private elite force of of 3,000 men with a single, unarmed tank?

F. R. Once a troop does not react normally, it takes them quite sometime to react again. As far as I was concerned, psychologically I

was sure that they were not going immediately to react. They would, you know, start studying the situation, and once somebody starts studying situation, they didn't take any action.

A. M. So you went on to your other targets.

F. R. I then on to Sheikh Mujib's house. At Sheikh Mujib's house they ... stoppoed me and said that everything is all right.

A. M. All right meaning what Mujib had been killed?

F. R. Yes.

A. M. Now what was happening in Mujib's house? Why did all the family have to get killed as well?

F. R. The Sheikh was told to surrender come down. Then what happened, he want inside the room and he immediately rang up the army headquarters and the army Chief General Shafullhah and also he rang up his Military Secretary, Colonel Jamil and also he reange up his Rakshi Bahini Headquarters to come to his resue and they all assured him that they are coming immediately. So evidently he got the courage to tell his sons and daughters to pick up their firearms and to resist the army people.

A. M. So Mujib felt that help was coming and he began to resist you and the army?

F. R. Yes, and they oppened fire. They were the first ones to open fire. We the soldiers had the first casualy and one on the spot died, and about 4 other had serious injuries, bullet injuries. So once that happended one could not waste any more time. We just asked him to (come out of) the house and they also fired, and we also throw a grenade inside the room because all of them were actully firing from the rooms. As it was a closed room and inside everybody .... So there were the lady members also and children (So they) also got killed in the action. This was very unfortunate, but as the soldiers got killed so they did not take any opportunity or a chance to wait for him further...

A. M. Did you expect Mujib to come out and surrender?

F. R. the did so, probably this incident would not have occurred. Probably his family would have been saved.

A. M. But how could you expect Mujib to do that, I mean just to walk out....

F. R. I said .. as you will see the Army has surrounded him and they asked him to surrender, his should have surrendered.

A. M. So when he didn't surtender .... he had been forced to.

F. R. From there I went to the Radio Station to check if the Radio Station had been seized. I saw that the Radio Station was secure, And at the Radio Station Mr. Khondakar Mushtaque had declared himself President and had made some annoucement.

A. M. So the man you selected before the coup, Mr. Mushtaque Ahmed had made himself President?

F.R. I was introduced to him. It was the first time I was introduced to M. Mushtaque. He told me to silt down but I was feeling uncertain ... I had to do regrouping. After a milltary operation, you have to do regrouping.

A. M. So the first of the men who had quietly waited on the sidelines. Mushtaque Ahmed, became President.

On 15th August when he handed over to Khondaker Mushtaque Ahmed, as new President in sucession to Shelk Mujib, he was 83 days in office. Did he fulfill your expectations?

F. R. No. he, promised, but he did not.

A. M. Did he continue Mujib's polices or did he make a change in them, in the polices?

F. R. He said he would but, he did not at that time.

A. M. On 3 November last year Mushtaque Ahmed was removed by Brigadiar Khaled Masharraf who immediately promeoted himself to General. Within four days Brigadiar was dead killed in yet another military uprising. Then the second man who had bided his time. General Zia, was brought to power. Only this time, for his own safety he removed Farooq and Rashid. Such is the law of the jungle. They have been kept in exile and Bangladesh's brief history has learned to live with the coup d'etat. after Mushtaque was removed in November 1975 and General Zia, to all intents and purposes is running the Government, had he changed in any way Mushtaque's polices.?

F. R. Genera Zia has done absolute by nothing and he is not capable of doing anything.

A. M. So he is as bad as Mujib in the way he is running the country?

F. R. But he is continuing Shelkh Mujib's policy.

Narrator : Did Bangladesh gain anything from Mujib's death?

A. M. In the circumstances of the last 12 months, there seems to me to be very litile change. But there is no democracy. The opportunity still not available to the people. There is great deprivation. There is a certain amount of corruption, very much there. Police harassment and this great uncertainty .... Under these circumstances one can feel that the question is asked all the time. Why had Mujib to die? And the final irony is that the people who started the process. Lt. col. Farooq Rahman and Lt. Col. Abdur Rashid, they have been sent into exile and completely isolated from Bangladesh".

## ১৫. পরিশিষ্ট

**THE**

**Bangladesh Gazette**

Extraordinary

Published by Authority

FRIDAY SEPTEMBER 26, 1975

GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF LAW. PARLIAMENTARY AFFAIRS AND JUSTICE

(Law and Parliamentary Division)

NOTIFICATION

Dhaka, the 26 September 1975

No. 692-Pub ... The following ordinance made by the president of the People's Republic of Bangladesh on the 26th September 1975, is hereby published for general information :-

THE INDEMNITY ORDINANCE, 1975

Ordinance No. XIX o 1975

ORDINANCE

to restrict the taking of any legal or other procedings in respect of certain acts or things done in connection with, or in preparation excution of any plan for, or steps necessitating, the historical change and the proclamation of Martial Law on the morning of the 15th August, 1975. Whereas it is expendient to restrict the taking of any legal or other proceedings in respect of certain acts or things done in connection with, or in preparetion or execution of any plan for, or steps necessitaing, the historical change and the proclamation of Martial Law on the morning of the 15th August. 1975:

And whereas parliament is not in session and president is satisfied that circumstances exist which render immediate action necessary;

Now, Therfore, in persuance of the proclamation of the 20th August, and in exercise of the conferred by clause (1) of article 93 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, the president is pleased to make and promulgate the following Ordinance :-

1. Short title. This Ordinance may be called the indemnity Ordinance, 1975.

2. Restrictions on the taking of any legal to other proceedings against persons in respect of certain acts and thing .... (1) Notwithstanding anything contained in any law, including a law relatigh to any defence service, for the time being in force, no suit, prosecution or other proceedings, legal or disciplinary, shall lie, or be taken, in before or by any Court including the Supreme Court and court Martial. or other authority against any person including a person who is or has, at any time, been subject to any law relating to any defence service, for on account of or in respect of any act, matter or thing done or step taken by such person in connection with, or in preparation or execution or any plan for, or as necessary step towards, the change of Government of the People's Republic of Bangladesh and the proclamation of Martial Law on the morning of the 15th August, 1975.

(2) For the purposes, this section, a certificate by the president, or a person authorised by him in this behalf, that any act, matter or thing was done or step taken by any person mentioned in the certificate in connection With, of in opreparation or execution of any plan for, or necessary step towards, the change of Government of the People's Republic of Bangladesh and the proclamation of Martial Law on morning of the 15th August, 1975, shall be sufficient evidence of such act, matter or thing having been done or step having been taken in cennection with, or in preparation or execution of any plan for, or as necessary step towards, the change of such Government and the proclamation of Martial Law on that morning.

Dhaka<br>The 26th September<br>1975.

KHANDAKER MOSHTAQUE AHMED<br>President<br>M. H RAHMAN<br>Secretary.

১৬. পরিশিষ্ট

**THE**

**BANGLADESH GEZETTE**

WEDENESDAY, NOVEMBER 5, 1975

GOVERNMENT OF THE PEOPLE's REPUBLIC OF BANGLADESH

PRESIDENT'S SECRETARIAT

(President Division)

ORDER

Dhaka, the 5th November, 1975

No. 768 Law A three member Judicial Inquiry Commission is hereby constituted to hold immediate judical enquiry into the circumstances under which four prominent persons were brutally murdered in Dhaka Central Jail recently. The commission Will be headed by Mr. Justice Ahsanuddin Chowdhury, Judge of the Supreme Court (Appellate Division) with MR. Justice K. M. Subhan and Mr. Justice Syed Mohammad Hossain of the Supreme Court (High Court division) of Bangladesh as members.

The enquiry Commission will also investigate under Which circumstances some of the criminals were given safe passage leave the country.

KHANDAKER MOSHTAQUE AHMED
President

## ১৭. পরিশিষ্ট

## MUJIBS DEATH CAST A LONG SHADOW....

FROM THE SUMMER of 1974 Farook and Rashid began to plan for Mujibs over-throw and the establishment in Bangladesh of an Islamic Republic. The plotters were a well-matched pair.

Farook was an aggressive but meticulous tactician who had won his spurs as a tank commander when seconded to the Abu Dhabi forces in 1970-71. His regiment, the Bengal Lancers, with 30 obsolute American and British tanks (a gift from Egypt) was the main strike force of the Bangladesh Army. Based in Dhaka, its 800 officers and men wore distinctive black overalls, jackboots and berets. Farook was their defacto commander and had trained them to operate in 'hunter-killer' packs. They were intensely loyal to him.

---

'Sheikh Mujib has been Killed, the announcement said. 'Praise God, Bangladesh is now and Islamic-Republic'.

---

Rashid more the political strategist, commandeed Number Two Field Artillery and also conventently based in Dhaka. He had 18 howitxers and 600 men. So between them Farook and Rashid commanded 1,400 troops and all the tanks and artillery available in the capital. Since, they lived in adjoining bungalows in Dhaka cantonment, they could spend hours together plotting.

At the end of 1974 the majors sought and obtained permission from Army Headquarters for the Lancers and artillery to hold combinted night exercises at monthly intervals near Dhaka airport, barely a mile from Sheikh Mujib's house. In this manner they hoped the movement of tanks, guns and troops at the moment of the coup would not cause any alarm.

Farook anticipated that the man opposition to the coup would come from the Rakhi Bahini, the well-trained and well- equipped paramilitary force which served as Mujib's private army and took orders from him alone. At least 3,500 of this storm troops were always on call in a garrison situated between the contonment and Mujibs house. Normal it would not have been difficult for 30 tanks to smash such a body of men grouped in a single compound. But the hard fact was that Farook's tanks

were not armed. All tank ammunition, even machine gun belts, were locked away in the Ordinance Depot at Joydevpur, 22 miles from Dhaka. Mujib wanted to be doubly sure the tanks would not be used against him.

But Farook was counting on a dangerous bluff. He knew that apart from his own regiment, only a handful of staff officer were aware that the tanks were unarmed. In any case', he told Rashid, who will think lam so mad as to take on the Rakhi Bahini and GHQ with a string of unarmed tanks.

The major's main problems were, in fact, non military ones. while confident they could overcome Mujib with the element of surprise, they realisede that they were too inexperinenced to run the government. Someone would have to be found who would 'front' for them, and operate within the broad outlines of the Islamic patterns the wanted for Bangladesh.

But such a man would also need to have other important qualification. He would have to be acceptable to Mujib's monolithic. Awami League and the Rakshi Bahini or they would combine to present the majors with and impossible fight. Rashid explained his strategy. I wanted someone who would immediately make everyone sit back quietly and tell themselves, 'Dont panic, Let's see what happens.' One they decided to hold back they would be more inclined to accept the failt accomplid and we would be home and dry.

Rashid's choice, was Khandaker Moshtaque Ahmed, Mujib's Commerce Minister and ranking member of the Awami League executive Mostaque had publicly greeted Mujib with a kiss on his retern from Jail in Pakistan in 1972 but since then there had been no love lost between the men. It was common knowledge that Moshtaque wanted Mujib out was too frightened to do anything about it himself.

Rashid says he recruited Moshtaque less then three weeks before the coup. He now admits this was a blunder, because the surrougate president was the first to betrey the majors by turning the clock back on the proclamation of the Islamic Republic.

At 4 a.m. on 15 August 1975 the majors were ready to strike. Their force had been divided into three terams. One each to attack the home of Sheikh Mujib, his brother in law. Abdur Rab Serniabatt and this nephew Sheikh Fuzlul Haqe Moni, all the President's confidantes. The terms were led by six young officers who had recently been discharged from the army and, according to Rashid were specially chosen because they had a grudge against the Sheikh.

Farook's own self-appointed task was to neutralise the Rakshi Bahini, Rashid was to provide artillery cover if needed and to bring in Khandaker Moshtaque Ahmed to take power at the appropriate moment. Increadibly these preparations were made just 300 yeards from the

GHQ's Field intelligence Unit, which was supposed to operate round the clock. The major's startegey of combined night exercises had paid off.

As the strike teams and the tanks rolled out. Farook in the lead tank heard the azam or c ll to prayer from the cantonment mosque's loudspeakers. He wave l the columns forward. Then everything seemed to go wrong.

Roaring down the airport runway, Farook turned to discover only one tank was following him. Somehow he have lost 28 and within a minute the other one had also disappeared. Undaunted he charged forward alone, crashing through the compound wall of the Rakshi Bahini barracks. What he saw there took his breath away.

The Rakshi brigade had somehow been alerted by Sheikh Mujib and were lind up six deep in full battle jeal wating to climb into trucks. His driver shouted. What shall I do? Farook told him, 'Drive slowly past them with the gun pointed straight at their nose and move than six inches from it. And by way of an after though he added,'and since we haven't got any ammuntion, if they try anything, run them over.'

It was a tense moment as the tank confronted the troops. Then as they heard gunfire coming from the direction of Mujib's house the second tank arrived alongside Farook's. Not a soldier moved. The Rakshi Bahini had been neutralisssed by two useless tanks. Farook's bluff had succeeded brillantly.

By this time the first strike team was swarming all over the ground floor of Sheikh Mujib's house in the Dhanmondi district of Dhaka. Kamal and Jamal, the Sheikh two older sons were killed in the opening exchanges of fire as they tried to fight back with automatic weapons from the presidt nt's well-stocked arsenal. His personal bodyguards were the next to die. Then Mujib, wearing a wite knee-length kurta over a grey, checked loungi wrapped around his waist, was confronted on the winding staircase by two of the ex-army officers.

Mujib put on a bold face, obviously playing for time and his withering remarks at first confiused one the attackers. But this man was pushed away by the other, who shattered the President's body with a burst of attomatic fire, Mujib slid down the steps, his pipe still gripped firmly in his right hand.

The massacre continued. The troops went from room to room killing Mujib's wife, his younger brother, two daughters-in law and his 10-year-old son Russell (named after the philosopher. Bertrand Russell). Eleswhere the strike terms wiped out Serniabat, Moni and their familliers. Then they raced to the radio station.

Sheikh Mujib has been killed, the announcement said. Praise God. Bangladesh is now an Islamic Republic.

Khandaker Moshtaque made his first broadcast as president four hours after Mujib was killed. He laced his speech with pious varses and exhortations to Allah, but nowhere was there any endorsement of the proclamation of the Islamic republic. Bangladesh were understandably confused.

In Britain, which has a sizeable Bangladesh community, the High commission switchboard in London was jammed with callers asking. 'Is it or is it not an Islamic republic? When the duty oficer had to reply.' There is no change, one caller irately demanded. If there is to be no change, why did you kill the Sheikh?

The Islamic republic had vanished, Rashid recalls bitterly. We were betrayed from the start by the man we trusted most. To the embarranssment of the Muslim states which had rushed to recognise the new 'Islamic Republic'.

President Moshtaque made it clear that the country's secular status was to remain. According to Rashid. Then we pressed Moshaque to honour the change, he fobbed us off with the excuse that the prolamation would be formalised at an appropriate time.

The majors were also rebuffed from another, unexpected, quarter. They had insisted on the appointment of General Ziaur Rahman as the army commander-in chief. But on assuming offiice General Ziaur Rahman went his own way with appointments, transfers and deployments. Farook, Rashid and their men received the Presidential pardon. The two majors moved in with Moshtaque in the ornate presidential residence. They clung to thier tanks and artilery but were soon isolated from the rest of the army and reduce to the role to guardians of the Presidential place.

Then on 3 November 1975, less than three months after Mujib's death, Khanadaker Moshtaque and General Ziaur Rahman were cousted in a coup led by Brigadier Khaled Musharraff, who immediately promoted himself to general and Chief of the Armed Forces. Farook,Rashid and their followers were exiled to Libya, Rashid, still lives there, but Farook has been in a Bangladesh jail since January 1976.

On 7 November, only four days after the assumed power, Khallid Musharaff was killed in a spectactular sepoy mutiny. Genreral Ziaur Rahman returned to head the army and since then has occupited the Presidental seat despite a series of attemped coups. Sheikh Mujib's death has cast a long shadow on Bangladesh.*

---

* From The 8 Days, August 1976.

১৮. পরিশিষ্ট

## Dhaka Coup-Pro-West
## From News Dispatches

NEW DELHI, India Aug 15-A millitary backed government belived to favour both Islam and the West took power in Bangladesh today after a bloody predawn coup.

The overthrow claimed the life of leftist President Mujibur Rahman, the Father of the impoverished country's Independence movement who had assumed near diciatoral powers.

The newly instalied president, Khandaker Moshtaque Ahmed said in a broadcast 18 hours after the coup that Mujib was responsible for Bangladesh's poverty.

"There was corruption, nepotism and ettempts to concentrate powers on one head", he said.

He went on "In spite of the fact that millions gave thier lives for the independence of this country, no attemps were made to fulfill the peoples aspirations, only one segment amassed wealth while others were suffering".

Official word that 55 year's old Sheikh; once revered as the Father of Bangladesh; had been killed during the military takeover came from the state radio station, but the broadcast gave no details of the slaying.

Diplomatic reports said Prime Minister Monsoor Ali and two of the president's nephews also were killed. One report said that one of the nephews was Sheikh Moni, an influential leader of the ruling Awami Lague and editor of one of the few remaining newspapers in Bangladesh.

Tanks were reported in the streets of Dhaka. The international airport was closed and normal telegraph and telephone lines were severed. A state Department source in Washington said, however, there was no threat of danger to American lives or property in Bangladesh.

The press Turst of India, reporting from the Indian frontier town of

Agartala said accounts reaching there said that fighting had broken out in a number of areas and that 200 followers of Mujib had been killed.

The shift in power was expected to have repercasions in Pakistan, which once controlled Bangladesh as its estern province and in India, which backed Mujib's independence struggle and strongly supported him in office.

Pakistan became the first nation to recognize the new government Friday. India maintained official silence. In 1971 India come to the aid of Mujib's secessionits cause after month of civill war in what was then East Pakistan and defeated the Pakistani troops.

In Washington, a State Department spokesman said that the United States is prepared to conduct normal diplomatic relations with the new government.

Britain reacted coolly to the news of the takeover. A Foreign Ministry spokesman said that Mujib had been slain "will be received with widespread regret in this country...Sheikh Mujib was a well-known and much respected statesman who played a notable part in the creation of Bangladesh'.

The Soviet government newspaper Izvestia, published news of the coup on an inside page without comment. There was no official notice taken of the event by the Chinese government or media.

Ahmed said Bangladesh would honour its International treaty, commitments, remain in the commonwealth and the nonaligned block.

"Our policy will be one of friendship towards everyone", he said, adding that Bangladesh will continue to back the postion of "brother Arab countries" struggling to recover Israeli occupied terrtories.

He said Bangladesh desired "closer and friendlier relations" with the three great powers, naming the United states, the Soviet Union and China. Under Mujib, Bangladesh's basic friendships were with India and the Soviet Union, while rival Pakistan was aligned with China and the United States.

Bangladesh radio said about seven hour after the coup that a new Cabinet was sworn in, led by Ahmed, who had been Mujib's commerce minister, Several members of Mujib's old government were in the new one.

The Bangladesh station said that Ahmed had received pledges of loyalty from the three chiefs of the armed forces, the inspector general of Dhaka police and other law enforcement agencies and from the acting chief of the Rakshi Bahini, a paramilitary force that had become Mujib's personal elite guard. There was one report that Mijib was killed by his own bodyguards.

Ahmed himself had been a close and long-time associate of Mujib helping found the Awmi League in 1949 and serving as foreign minister in the Bangladesh revolutionary government during the 1971 civil war.

Ahmed, 57 was considered head of a Pro-Western loblby in the government. But there was no indication whether there would be any immediate shift in Bangldesh's ties with India and the Soviet Union.

The death of Mujib was a personal blow to Indian Prime Minister Indira Gandhi. Who had often endorsed his policies of secularism and socialism, the two pillars of her own government.

It appeared the new Bangladesh government would change both policies. Diplomatic reports reaching New Delhi said the new regime had changed the name of the country to the "Islamic Republic of Bangladesh."

Diplomatic sources in New Delhi speculated that the Ahmed government may be hoping to receive considerable financial assistance from the wealthy oil states of the Moslem Maddle East. In Pakistan's statement of recognition, Prime Minister Zulfiqar Ali Bhutto made an appeal to the 40 nations of the Islamic Conference recognize the new government.*

---

*The Washington Post Saturday, August 16, 1973.

১৯. পরিশিষ্ট

## Moscow Fears Bangladesh May Look to Peking

By CHRISTOPHER R. WREN

Special to the New York Times

MOSCOW. Aug. 22-The Kremlin, in this first substantial reaction to last week's coup d'eat in Bangladesh, hinted today that the overthrow of Sheik Mujibur Rahman might swing her away from the Soviet Union and toward China.

In an authoritative commentary, the communist party news paper Pravda contended that "political observers in various countries" were asking whether "forces hostile" to the aspirations of the Bangladesh people might now exert "an influence on future developments in the country." The Soviet press often uses the device of quoting others to express Moscow's sentiments.

This anxiety is well-founded since such forces actually exist," Pravda asserted, "These are impertalism. Maoism and internal reaction."

**CONCERN IN SOVIET**

The coup in Bangladesh comes at a time when the Soviet Union is apprehensive about increasing Chinese influence in South and Southeast Asia after war in Indochina. Moscow has incrasingly accused Peking of trying to press its hegemomy over the region, in part by subverting legtimate governments.

The Pravda Commentary was nonetheless cautious in tone, making clear that the Soviet Union wanted to remain in good standing with the new Government in Dhaka. It noted that President Khondokar Mushtaque Ahmed had said he would abide by Bangldesh's existing treaties and agreements.

The coup is also believed trouble the Kremlin because it has carefully cultivated its relations with Bangladesh During the 1971

Bangladesh war for independence, the Soviet Union support the secesionist movement and subsequently become the first major power to extend diplomatic recognition.

## RUSSIANS SENT SHIPS

The Russians sent mine sweepers to clear the port of Chittagong and brought Sheik Mujib to Moscow for medical treatment as well as for discussions.

Today, Pravda Indicated the Kremlin's unhappiness over Sheik Mujib's slaying, saying that if had "called forth the righteous Indignation of democratic public opinion".

Pravda recalled Indian's close ties to the former regime in Dhaka by referring to Prime Minister Indira Gandhi's praise of the late president.

The Soviet people also grieve over the tragic death of Mujibur Rahman who had contributed to the establishment and development of friendly relations and cooperations," the paper said.

The commentary was signed by "An Observer", usually an indication that it was prepared under Kremilin-level Supervision.*

---

* The New York Times, Saturday, August 23, 1975.

## ২০. পরিশিষ্ট

## Dhaka Jubilant over Peking recognition

From D. San Hindustan Times Correspondent

DHAKA, Sept, 1-There is visible jubilation here over China's recognition of Bangladesh to announce last night by an hour.

Chinese recognition comes a week after the Soviet Union recognised the new regime and a few days of Indian's official statement that it would continue its relation with the Mushtaque Government.

With Premier Chou En-Lalis message to President Khondoker Mustaque Ahamed yesterday, Paking ended its stubborn refusal to acknowledge the existence of the State of Bangladesh for a little more than 37 months, although recently representatives of the two countries had a few confacts in third countries.

The Government-owned Bangladesh Times, which flashed the news in a banner headline, carried a story saying that in Peking Pakistan Ambassador Mumtaz Ali yesterday had met the Chinese Vice Premier. Mr. Teng Hsiao-ping.

Another report said a Chiness Party and Government delegation, led by a Polit Burreau member, Mr. Chen Asilien, left yesterday for Hanoi attend the 30th aniversary celebration of the founding of North Vietnam.

The Hanoi celebrattens will also be attended by M. K. M. Kaiser, Bangladesh's Ambassador in Rangoon and for years a popular Pakistan envoy in Peking before-the birth of Bangladesh. Mr. Kaisar has left Dhaka for Hanoi.

News About Chinese recognition was preceded by a Dhaka annuncement that Peking has agreed to by 4.000 tonnes of Jute from Bangladesh and that the consignment would be shipped between November and December.

According to a report in Bangladesh Time the deal is a follow-up of the visit to China of a Bangladesh trade delegation last May, During that period, Mr. Kaiser also visit China.

There has been some trade between Bangladesh and China through third country contacts, mainly Hong Kong and Singapure since 1973. The consignment of 4.000 tonnes of jute is the first official one between the two Governments.

The Hindustan Times, 2 Sept. 1975.

## ২১. পরিশিষ্ট

## THE INTERIGUE BEHIND THE ARMY COUP WHICH TOPPLED SHEKH MUJIB

Stories get told and stories get reported. Frequently a foreign correspondent, trying to penetrate the surface appearance of an intricate set of events filled with there own macabre web of killings and berayals, fails at first to get the report right. Coups d'etat or midnight butcherles occurring in distant sports at moments of unexpected crisis, are often report with little real accuracy at the time. Few writers go back to those reports once put on page one, to discover later that real story was a very different one.

Just such a case occurred four ago on the night of august 14, 1975, when the founding nationalist leader of Bangladesh. Sheik Mujibur Rahman was killed in a millltary putsch. For years the Guardian, Martin Woolacott and I filed one of the most detailed accounts of what happened. It ran as the lead story on August 28, 1975 Looking back, it appears that we inevitably massed a lot. But as with all such events knew what had really gone on.

The coup happend on one of those hot sweltering monsoon night that blew up each summer from the Bay of Bengal. It was a quiet and the political talk in the tea shops of Dhaka that day was about Mujib's speech planned for the next morning at the university. Life had been going from bad to worse in Bangladesh and people wonderd if one of the left wing underground partise might try to make trouble during the university ceremony. But otherwise, the night did not seen much different from many otherrs that summer.

Yet life in Dhaka did take a sudden turn that August evening Just after midnight the Bengal Lancers and the Bangladesh Armoured Corps slowly trundled out of the capital's main cantonment toward the runways of the abandomed half-buillt second airport on the capital's edge. As they lined up in formation on the main runway, the commanding officer of the column, Major Farooq, stood on a tank and told his men that

night, they would overthrow Mujib's regime. It was a fire-eating speech and by the time Farooq had finished they were ready to go. They moved out and spillt into three columns. Within three hours Mujib and more than forty members of the family were dead.

The version of events which emerged at the time was that six junior officers with three hundred men under their command, had acted on their own in over throwing Mujib The motives for the coup were attributed to a comibination of personal grudgas held by certain of the officers against Mujib and his associates togather with a general mood of frustration at the widemead corruption which had come to characterise mujib's regime.

In reporting the coup no foreign of Bengali journalist probed beyond the superficial aspects of what had happened. What contacts the officers had before August, which politicians had been contacted were ignored. The version of eavants that the officers had acted alone. Without prior political planning, was a myth that came to stand as fact.

The morning Mujib and his family were killed, the figure installed by the young majors as President was Khondokar Mustaque, generally considered to be the representative of the rightist faction within Mujib's Awami Leagiue. After the putsch Mustaque remaind impeccably reticent about any part he personally might have played in Mujib's downfall. He neither confirmed nor denied his prior involvement.

He simply avoided any public discussion of the question and desperate attempted to stabilise is regime.

A year following the coup, after had himself been toppled from power and before his own arrest on corruption charges, Mustaque denied to me any prior knowledge of the coup plan or prior meetings with the army majors who carried out the action. The majors, However, have told a very different story.

They have confirmed prior meeting and prior links with Mustaque and his associates. Knowledgeable Bengali and foreign diplomatic sources now claim that Mostaque and his political friends had been involved of more than a year in plans designed to bring about the overthrow of Mujib. According to information obtained from senior US Officials at the American Embassy in Dhaka and form wellinformed Begali sources, it appears that the United States had prior Knowledge of coup which killed Mujib, and that American Ambassy personal had held discussions with individuals involved in the plot more than six months prior to his death.

According to one highly-placed US Embassy diplomat, officials at

the American Embassy were approached by people intending to overthrow the government of Sheikh Mujibur Rahman. This Embassy source has stated that a series of meetings took place with Embassy personal between November 1974 and January 1975. These discussion were held with the purpose of determining the attude of US Government towords a political change in Bangladesh if a coup ditat were actually to happen.

The contacts occurred during the period in which the Church and Pike Congressional Committee hearings in Washington on CIA assassinations of foreign leader were gearing up. The committee hearing were having their own impact within the American diplomatic and intelligence bureaucracies, creating great nervousness and anxiety. The American press was openly speculating that senior American intelligence officials might face imprisonment for illegal clandestine action in Chile and elsewhere.

In the atmosphere emanting from the Senate hearings, a decision was taken by US Embassy in Dhaka in January 1975. According to a sentior official; 'We came to an understanding in the embassy that we would stay out of it and disengage from those people." Although a decision was made at a high in the embassy that there would be no farhter contact with the anti-Mujib group, what happened subsequently is a matter of countroversy among US officials interviewed.

Those who knew of the earler meetings deny any personal knowledge of what happened after early 1975. Others allege that while contact was broken off at the level of diplomatic and foreign service official, who wished to remain "clean", liaison was taken over and carried on through the channel of the American Embassy's CIA station chief, Philip Cherry and other station agents.

When interviewed, Cherry categoricaly denied this allegation. "The Bangladeshies were doing into themsalves," said Cherry. "It's a great canard to think any coup tanks place because of an (outside) government involvement. Almost always coups take place because of the people themselves." When asked about the Mostaque network's privious history of confidential contact with the United States. Cherry stated : There are politicians who requently approach embassies and perhaps have contacts there. They think they may have contact. But that's a far cry from any of those embasies involved in assisting them in involment in a coup."

Indeed Khondokar Mustaque had and an important basis on which to think he had contacts. For years among those familiar with the events of Pakistan's civil war. There have circulated vague stories and

negotiations carried out by the Americans in 1971. However, there never been any precise information confirming the existence and nature of these contacts. Yet according to documents contained in an unpublished study commissioned by the Washington-based Carnegie Endowment for international Peace, a leading American froiegn policy research institution, the existence of these links has been definitively established.

In 1973 the Carnegie Endowment commissioned a study of the conduct of US policy during the 1971. Bangladesh crisis to examine the process whereby the US "tilt" toward Pakistan virtually contenance a situation of genocide. Due to internal dissension at Carnegue the nine month study was never completed although over 150 senior official- from the State Department to the Central intellgence Agency- been interviewed detail.

What the Carnegie documents make unequivocably clear is that secret contacts were made in 1971 in Calcutta with a faction of the Bangladesh Provisional Government in the hope of spliting independence movement and arriving at a sttlement short of the independence. The US contacts were made with the Mustaque faction of the Awami League in Calcutta and were highly sensitive sinece they bypassed the provisional government in the person of the then prime Minister Tajuddin Ahmed.

Tajuddin and virtually the entire Bengali leadership were adamant ragarding complete independence. The refusal of the Pakistan authorities in March 1971 to accept the results of the elections (which would have made Mujib the prime minister of all Pakistan), combined with the brutal magnitunde of the repression, made the provisional Government's standpoint clear and unconditional; would be no negotiated solution short of full independence for Bangladesh.

The solitary exception to this among the exiled Bengali leadership was Khondokar Mustaque. Henry Kesinger then working with Pakistan's military junta, through whom he was simultanously channeling the most sensitive nogotiations of this career- those with China- began and exericise aimed at dividing the exiled Awami League in the question of independence. Absolute discretion and secrecy was the key to splitting the Bengali leadership and suporting that faction which would be prepared to compromise with Pakistan and not demand full independence. However, Mustaqu's seceret liaison was discovered in October 1971 and he was pleaced under virtural house arrest in Calcutta.

Following the independence of Bangladesh in 1971 Mustaque was

pardoned by Mujib for this indiscretion but give only minor position in the post-indipendence regime. Yet four year later it was mustaque and his two leading protdges from the days of the Calcutta liaison- Mahbub Alam Chashi and Taheruddin Thakur- who emerged as the political leadership of the putsch which killed Mujib. In the immdiate postcoup period Mustaque appointed to leading positions in the bureaucracy and national intilligence organisations people who had been prominent among the Bangali "Vichy" of 1971- the minute percent of the Bengali population who had actually collaborated with the Pakistan Army following Pakistan's crackdown in Dhaka in March 1971.

Among these were A.M.S Safdar. Director-General of the national Security intelligence Agency and Shafiul Azam. Former chief Secretary of East Pakistan Government during the period of the civil war. A cohensive right-wing political and intelligence group, which had risen to promenence in the Pakistan period and were swept aside by Mujib after independence in 1971, finally staged the coup in August 1975, in alliance with a faction of Mujib's own party, and reinstated themselves in power.

What happened in Bangladesh in August 1975 was by no means as simble as it was once made to appear. The version accepted by both the foreign and Bangali press was a simple story. Mujib's regime was in trouble.

The country had just suffered a famine that had killed an estimated 50,000 Peasants, for which government incompetence and corruption was blanmed. Democratic right were increasingly being crushed by the authoritise who were closing newspapers and looking. Mujib's opponents away. Civil unrest and rural insurgency were growing problems. In this atmosphere, so the story went, six young majors with 300 men under their command took it upon themselves to organise a putsch, action with a mixture of motives stretching form personal embitterment to their own Massianic delusions of the Islamic Bonapartism.

The story emphasised that they had acted alone and unlaterally and that after the killing of Mujib they suddenly decided to pick up Khondokar Mustaque as a replacement. In taking in the presidency. Mustaque as protrayed with all the innocent of a victim of circumstance. But whether Mustaque had himself taken part in a complicated plan nearly a year old, involving a variety of links remained unexamined.

The military men who actually killed Mujib appear to have been brought firmly into the Mustaqe cricle's scheme of things only in late

March of early April. The majors had ideas of their own before that, but lacked a political glove to fit their gun hand into. Mustaque and his political circle were in the process of discreetly checking millitary contacts whom they could adopt and integrate into their own strategy. While one of the majors was a relative of Mustaque's the Mustaque group initilaly preferred senior officers coup detat.

According to Bangladesh miliatary sources with intimate knowledge of the events approaches were made to the deputy chief of army staff. Major-General Ziaur Rahman (Zia) currently Bangladesh's head of state. Mustaque's representive in the approach of Zia is alleged by Bangladesh millitary sources to have been Mahbub Alam Chashi, one Mustaque's trusted deputy in Calcutta in 1971' and the principal go-between in contacts with the United States at the time.

General Zia, these Sources report, expressed interest in the proposed coup plan, but expressed reluctance to take the lead in the required milltary action. Zia on March 20 1975 was subsequently approached again by Majors Rashid and Farooq. The Junior officers had already worked out a plan, Rashid told Zia, and they wanted his support and his leadership Zia, and again temporised. According to Rashid. Zia told him that as a senior officer he could not be directly involved, but if the junior officers were prepared they should go ahead.

Having failed to secure reliable leadership for the coup for the senior officer cade, the Mustaque group went forward with the junior officers' plot. While they might have preferred a senior officers' coup, they secured the next best option. With Ceneral Zia's nutrality of even tacit support assred, the junior officers could move ahead without fear that Zia would not throw his forces against them after the coup.

From April onwards the scheme moved to maturity. Three months after the August putsch following new upheavals, Zia was to take over as the country's milltary strongman and ultimatelly arrest Mustaque who remains in prison to this day.

Since the coup occured, there had been little analysis of the contradictory phenomena which existed. Ignored was the stark juxtaposition that, in the two years prior to the coup it was the country's organised left wing parties, such as the J.S.D. (Socialist National Party), the National Awami Party (Bhashani) and the underground organisations like the Sharbohara Party, which had developed and mobilished public centiment against Mujib's regime; yet when the critical moment of collapse came for Mujib, it was not from a leftist mass uprising- "The Revolutation"- as had been feared, but from a narrawly based conspiracy of the right.

The challenge being developed and prepared by radical nationalist forces was pre-empeted by the August events. The coup itself was an inside joy by right wing elements within Mujib's own party, his own cabinent, his own secretariat and his own national intelligence service, who viewed Mujib's leadership as no longer capable of holding out against a left wing challenge to their Interests.

Whether or not the United States had prior knowledge of these plans- given the assertions of State Department sources and the country insertions of C/A official- cannot both be conclusively setted wihout, the power of Congressinal subpoena. But it is clear beyond a doubt that the United States had important prior relationship with the poiltical and intelligence leadership of the coup.

Mujibur Rahman's demise in Bangladesh marked as did Bhutto's four years later in Pakistan, the end of an entire era of hopes and illusions surrounding the prospects for social democracy in conditions of several backwardness and under development. In both societies-Bangladesh and Pakistan- the regression to froms of milltary and but reaucratic dietatorship has reasserted itself like an told and deperssing cancer. During the decade of the 1960s much of the democratic and socialist opposition including democrats like Mujibur Rahman, found themselves in prison.

Only the arrival of mass politics and mass politicisation swept the miltary dictatorships back to the barracks. Now the cycle has spun around again in both societies and although elections under millitary hegemony is the order of the generals there can be no illusions of a popular "new democracy emerging under such conditions.

Whether, at least in Bangladesh, the long arm of American power and the, "security' vision of Kissinger assisted in this reversion to past authoritarian froms is yet to be dug out down to the last detail. In the meantine the long night of "martial domocracy" will continue in Bangladesh until the history of what happened in the past half decade finally breaks out of obscurity and into the open.*

---

* THE GURDIAN, Wednesday, August 15, 1979- Lawrence Lifschuitz, formerly South Asia Correspondent of the "Far Easterr Economic Review."

## ২২. পরিশিষ্ট

### জিয়াউর রহমান লেখককে যে চিঠি লিখেছিলেন

DEPUTY CHIEF OF ARMY STAFF

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম
সেনাসদর
ঢাকা সেনানিবাস
দূরালাপনী : সামরিক ৮ ৬১০
ডি/৩ নং ব্যক্তিগত নথি/৫১১৩/২৬
১৭ জুলাই ১৯৭৫

অধ্যাপক আবু সায়ীদ
জেলা গভর্নর পাবনা

প্রিয় অধ্যাপক সায়ীদ

পাবনা জেলার গভর্নর নিযুক্ত হওয়ায় আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহন করুন।

দোয়া করি যাতে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আপনার কর্মদক্ষতাকে উৎসর্গ করার জন্য আল্লাহ আপনাকে সাহস ও শক্তি দান করেন।

আন্তরিকতার সহিত,
জিয়া

---

সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত অবস্থায় গভর্ণরদের নিকট লেখা জিয়াউর রহমানের এই পত্রটি অসুস্থ রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ।

## ২৩. পরিশিষ্ট

রেজিস্টার্ড নং– DA-1

### আল্লাহর নামে মোশতাকের ক্ষমতা গ্রহণ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ

**বাংলাদেশ গেজেট**

অসাধারণ
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
বুধবার ২০শে আগস্ট ১৯৭৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রাষ্ট্রপতি–সচিবালয়
ঘোষণা
২০শে আগস্ট, ১৯৭৫

যেহেতু আমি, খন্দকার মোশতাক আহমদ, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ও দেশবাসীর আশীর্বাদ নিয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের প্রভাত হতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেছি;

এবং যেহেতু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের প্রভাতে আমি রেডিও বাংলাদেশের সকল কেন্দ্র থেকে একটি সামরিক ঘোষণা প্রচারের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে সামরিক আইন জারি করেছি;

এবং যেহেতু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের প্রভাত হতে আমি শাসনতন্ত্রের ৪৮ অনুচ্ছেদ বর্ণিত রাষ্ট্রপতির নির্বাচন স্থগিত রেখেছি এবং সেই সাথে শাসনতন্ত্রের ১৪৮ অনুচ্ছেদের ধারাসমূহ সংশোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত শাসনতন্ত্রের তৃতীয় তপশীল পরিবর্তন করে প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ এবং রাষ্ট্রপতির অফিস অধিগ্রহণ ও রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হওয়ার বিধি সংযোজন করেছি;

এখন, অতএব, আমি খন্দকার মোশতাক আহমদ, আমাকে অর্পিত সর্বময় ক্ষমতাবলে এই মর্মে ঘোষণা করছি যে—

(ক) ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের প্রভাত হতে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হলাম ও রাষ্ট্রপতির অফিস অধিগ্রহণ করলাম।

(খ) সময় সময় আমি নিম্নোক্ত সামরিক আইনবিধি ও সামরিক আদেশ জারী করতে পারি--

(১) সামরিক আইনবিধি বা সামরিক আদেশ ভঙ্গকারী বা এর সাথে দ্বিমত বা ভিন্নমত পোষণকারী এবং যে কোন আইন ভঙ্গকারী যে কাউকে উক্ত সামরিক আইনবিধি বা সামরিক আদেশ বা অন্য যে কোন আইনের আওতায় বিচারের সম্মুখীন করা বা শাস্তি দেয়ার জন্য বিশেষ সামরিক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল গঠন সংক্রান্ত আইন;

(২) সামরিক আইনবিধি বা সামরিক আদেশ বা অন্য যে কোন আইনের অধীনে উপরোক্ত সামরিক আইনবিধি ভঙ্গকারী বা সামরিক আদেশ অমান্যকারী বা অন্য যে কোন আইন অমান্যকারী যে কাউকে যে কোন ধরনের জরিমানা বা বিশেষ জরিমানা করা সংক্রান্ত আইন।

(৩) সামরিক আইনবিধি বা সামরিক আদেশ ভঙ্গকারী যে কাউকে বিচারে সোপর্দ এবং শাস্তিদানের জন্য যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালকে ক্ষমতা অর্পণের আইন;

(৪) সামরিক আইনবিধি বা সামরিক নির্দেশ বলে কোন অপরাধের জন্য কাউকে বিচার বা শাস্তিদানের ক্ষমতাকে দেশের অন্য কোন আদালত বা ট্রাইবুনালের এখতিয়ার বহির্ভূত করার আইন;

(গ) ১৯৭৫ সালের ১৬ই আগস্টের প্রভাতে জারীকৃত সামরিক আইন আমি যে কোন সময় দেশের যে কোন অংশের বা সকল অংশের জন্য সাময়িকভাবে প্রত্যাহার বা তদস্থলে আরেকটি সংশোধিত সামরিক ঘোষণার মাধ্যমে পুনরায় আমি সামরিক আইন জারী করতে পারি;

(ঘ) এই সামরিক শাসনের ঘোষণা এবং সামরিক আইনবিধি এবং সামরিক নির্দেশাবলি যা আমার দ্বারা প্রণীত ও ঘোষিত হয়েছে তার সাথে শাসনতন্ত্রের যে সকল অনুচ্ছেদ ও ধারা বা যে সমস্ত আইন অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সামাজিকভাবে সেগুলোও বলবৎ থাকবে।

(ঙ) সামরিক শাসনের এই ঘোষণা এবং সামরিক আইনবিধি এবং সামরিক নির্দেশাবলি যা আমার দ্বারা প্রণীত ও ঘোষিত হয়েছে তার সকল কিছু সম্পূর্ণভাবে বলবৎ ও সক্রিয় রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র বহাল থাকবে;

(চ) ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের প্রভাতে যে সমস্ত আদেশ, অধ্যাদেশ, রাষ্ট্রপতির আদেশ, অন্যান্য নির্দেশ, ঘোষণা, আইন, ধারা, উপধারা, বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য বৈধ ইন্সট্রুমেন্টস প্রয়োগ ও কার্যকরী করা হয়েছিল সেগুলো আমার দ্বারা

পরিবর্তিত, প্রত্যাহৃত ও পরিশীলিত (সংশোধিত) না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বহাল, সক্রিয় ও সচল থাকবে;

(ছ) আমার ঘোষিত এই অধ্যাদেশ অথবা সামরিক আইনবিধি অথবা আদেশ সম্পর্কে অথবা এই ঘোষণার অধীনে দেয় বা উল্লেখিত কোন ঘোষণা অথবা এই ঘোষণার অধীনে নেয়া কোন ব্যবস্থা বা কাজ সম্পর্কে অথবা এই ঘোষণা উল্লেখিত কোন কাজ অতীতে করা হয়ে থাকলে, বা ব্যবস্থা নেয়া থাকলে, এই ঘোষণার বিধি বলে জারীকৃত কোন সামরিক আইনবিধি বা নির্দেশ অনুযায়ী কৃত কোন কাজ বা নেয়া কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন রকমের প্রশ্ন তোলার অধিকার সুপ্রীম কোর্ট, ট্রাইব্যুনাল অথবা কোন কর্তৃপক্ষসহ কোন আদালতেরই থাকবে না।

(জ) সরকারী গেজেটে প্রকাশিত নির্দেশের মাধ্যমে আমি এই ঘোষণার সংশোধন করতে পারি।

খন্দকার মোশতাক আহমদ
রাষ্ট্রপতি

ঢাকায় বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়ের বিশেষ অফিসার কর্তৃক, মুদ্রিত, ভারপ্রাপ্ত সহকারী নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ এবং প্রকাশনা অফিস ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

## ২৪. পরিশিষ্ট

# লন্ডনে গঠিত শেখ মুজিব হত্যার তদন্ত কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক রিপোর্ট

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা এবং ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বিনা বিচারে অন্তরীণ থাকাকালীন সময়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম (উপ-রাষ্ট্রপতি), তাজউদ্দিন আহম্মদ (প্রথম প্রধানমন্ত্রী), মনসুর আলী (প্রধামনন্ত্রী) এবং কামরুজ্জামান (শিল্পমন্ত্রী এবং দলের প্রাক্তন সভাপতি), এ চার জাতীয় নেতা হত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন ও বিচারের প্রক্রিয়াকে যে সমস্ত অবস্থা বাধাগ্রস্ত করছে সেগুলোর তদন্ত করার জন্য ১৯৮৩ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্ত কমিশন গঠিত হয়।

মরহুম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রক্ষাপ্রাপ্ত দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং প্রধানমন্ত্রীর পুত্র জনাব মোহাম্মদ সেলিম ও উপ-রাষ্ট্রপতির পুত্র সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের আবেদনক্রমে স্যার থমাস উইলিয়ামস্, কিউ, সি, এম, পি'র নেতৃত্বে এই কমিশন গঠনের উদ্যোগ গৃহীত হয়। বাংলাদেশ ও বিদেশে অনুষ্ঠিত জনসভাসমূহে এ আবেদনটি ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়। ১৯৮৩ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর স্যার থমাস উইলিয়ামস্, কিউ, সি, এম, পি'র সভাপতিত্বে হাউজ অব কমন্সের একটি কমিটি কক্ষে এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিফ্রি থমাস, কিউ, সি, এম, পি এবং সলিসিটার মিঃ এ্যাব্রো রোজ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে কমিশন গঠন ও তার কর্যপদ্ধতি ঘোষণা করে ঐ দিনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।

কমিশন নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর কমিশনের প্রতিটি সদস্যের কাছে সরবরাহকৃত প্রমাণ সম্বলিত দলিল পত্রাদি পরীক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে; (ক) ১৫ই আগস্টের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের হত্যা এবং ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর চার জাতীয় নেতার হত্যা; (খ) জনসমক্ষে যে সমস্ত ব্যক্তি হত্যার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং (গ) এ সমস্ত বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ। কাগজ পত্র পরীক্ষা থেকে নিম্নোক্ত ঘটনা পরিস্ফুট হয় ঃ

ক. ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের ভোরে ঢাকার ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকায় ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দকে নিজ বাসভবনে হত্যা করা হয় ঃ

(১) শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসা।

(২) শেখ মুজিবুর রহমানের বড় ছেলে শেখ কামাল।

(৩) শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় ছেলে শেখ জামাল।

(৪) শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট ছেলে শেখ রাসেল (৯ বৎসর)।

(৫) শেখ কামালের স্ত্রী মিসেস সুলতানা আহমেদ।

(৬) শেখ জামালের স্ত্রী মিসেস পারভীন জামাল (রোজী) এবং

(৭) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাই শেখ নাসের।

খ. ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে একই সময়ে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদেরও হত্যা করা হয় ঃ

(১) শেখ মুজিবুর রহমানের ভগ্নীপতি জনাব আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (বিদ্যুৎ, সেচ এবং পানি সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী)।

(২) জনাব সেরনিয়াবাতের মেয়ে মিস বেবী (১৩ বৎসর বয়স)।

(৩) ছেলে আরিফ।

(৪) নাতি বাবু (৪ বৎসর বয়স)।

(৫) একজন অভ্যাগত ভাগ্নে।

(৬) তিন জন অতিথি।

(৭) চার জন গৃহভৃত্য।

(৮) বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে ক্ষমতাসীন দলের সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্য শেখ ফজলুল হক মনি।

(৯) মিসেস শেখ ফজলুল হক মনি (শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগনেয়ী এবং সে সময় অন্তঃসত্তা)।

গ. ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখে নিম্নোক্ত জাতীয় নেতাদের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা করা হয় ঃ

(১) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি)।

(২) তাজউদ্দীন আহমেদ (প্রথম প্রধানমন্ত্রী)।

(৩) মনসুর আলী (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী)।

(৪) এ, এইচ, এম কামারুজ্জামান (প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী এবং প্রাক্তন সভাপতি)।

ঘ. এ হত্যাকাণ্ডগুলো অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত কতিপয় সামরিক অফিসারের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হয়।

ঙ. ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর বাংলাদেশ থেকে ব্যাংকক ত্যাগ করার জন্য যে সমস্ত সামরিক বাহিনীর ব্যক্তিরা আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিলেন তাদের

তালিকা থেকে জড়িত অফিসারদের সনাক্ত করা যেতে পারে। তাদের দেশ ত্যাগের পর যে অভ্যুত্থান হয়েছিল তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে ব্যাংককে পলায়নকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল ঃ

(১) লে. কর্নেল ফারুক।

(২) লে. কর্নেল আব্দুর রশিদ।

(৩) মেজর শরিফুল হক (ডালিম)।

চ. আপাতঃদৃষ্টিতে নিম্নোক্তরা অভ্যুত্থানের নেতা ছিল—

(১) লে. কর্নেল ফারুক।

(২) লে. কর্নেল রশিদ।

(৩) মেজর শরিফুল হক (ডালিম)।

ছ. শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবার এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, মনসুর আলী এবং এ, এইচ, এম, কামারুজ্জামানের হত্যার দায়-দায়িত্ব লেঃ কর্নেল ফারুক ব্যাংককে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে স্বীকার করেছে। এ দায়-দায়িত্ব ১৯৭৬ সালের ৩০শে তারিখে "লন্ডন সানডে টাইমস" পত্রিকায় প্রকাশিত সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে এবং ১৯৭৬ সালের ২রা আগস্টে লন্ডনে টিভি, সাক্ষাৎকারে পুনরায় উক্ত ব্যক্তি দাবী করেছে।

জ. "১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের ভোরে ঐতিহাসিক পরিবর্তন এবং সামরিক শাসন জারীর জন্য যে কোন কাজ বা এ সম্পর্কে কৃতকর্ম বা এর পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর শাস্তি হতে অব্যাহিত অধ্যাদেশ, ১৯৭৫" নামে অধ্যাদেশ জারি করে।

ঝ. অধ্যাদেশের অনুকূলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই মর্মে প্রত্যায়ন প্রয়োজন যে, "যে কোন কার্য বা কৃতকর্ম বা এ সম্পর্কে প্রত্যায়ন পত্রে উল্লেখিত যে কোন ব্যক্তির দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপ বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবর্তন এবং ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের ভোরে সামরিক শাসন জারির উদ্দেশ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন বা উহার বাস্তবায়ন বা সেই নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, উক্ত সরকার পরিবর্তন সংক্রান্ত যে কোন কার্য বিষয় বা কৃতকর্ম বা এ সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহণ বা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের যথেষ্ট প্রমাণ হিসেবে ধার হবে।" এ জাতীয় প্রত্যায়নপত্র উহাতে উল্লেখিত ঘটনার চূড়ান্ত সাক্ষ্য বলে বিবেচিত হবে। এ জাতীয় প্রত্যায়ন পত্র দেয়া হয়েছিল কি না তা জানা যায়নি।

ঞ. ১৯৭৫ সালের নভেম্বর ৭৮৬ নং গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার নিম্নোক্ত শর্তে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে।

"৭৮৬ নং আইন সাম্প্রতিককালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চার জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কি অবস্থায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় তারা তাৎক্ষণিক বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য এতদসঙ্গে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হলো। তদন্ত কমিশনের প্রধান হবেন সর্বোচ্চ আদালতের (আপিল বিভাগীয়) বিচারপতি জনাব আহসান উদ্দিন চৌধুরী এবং হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জনাব কে. এম. সোবহান ও বিচারপতি জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন সদস্য হিসেবে থাকবেন।"

ট. ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা সম্পর্কে ১৯৭৫ সালের ৫ই নভেম্বর ঢাকার লালবাগ থানায় একটি মামলা রেজিস্ট্রি করা হয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অল্প বিস্তর তদন্তের পর বিষয়টি সি, আই, ডি, তে পাঠানো হয়।

ঠ. ৬ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন বিধগত ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

ড. তদন্ত কমিশনের একজন সদস্য মিঃ সন ম্যাকব্রাইডের নেতৃত্বে ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মিশন বাংলাদেশ পরিদর্শন করেন এবং রাষ্ট্রপতিসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার সময় জেল হত্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলা হয়েছিল যে, আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া হবে।

ঢ. পরবর্তী সময়ে লক্ষ্য করা যায় যে, ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর বা তার কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশ থেকে ব্যাংককে পলায়নকারী হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের কূটনৈতিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কুটনৈতিক দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন ঃ

(১) লে. কর্নেল শরিফুল হক (প্রাক্তন মেজর) ডালিম)।
(২) মেজর কর্নেল আজিজ পাশা।
(৩) মেজর মহিউদ্দিন।
(৪) মেজর শাহরিয়ার।
(৫) মেজর বজলুল হুদা।
(৬) মেজর রশিদ চৌধুরী।
(৭) মেজর নূর।
(৮) মেজর শফিকুল হোসেন।
(৯) ক্যাপ্টেন কিসমত হোসেন।
(১০) লে. খায়রুজ্জামান।
(১১) লে. আবদুল মজিদ।

ণ. প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটে লক্ষ্য করা যায় যে, ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের কূটনৈতিক মিশনের পদগুলোতে স্থায়ী করা হয়েছে।

ত. উপরোক্ত ঘটনা ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে কমিশন সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রাগুক্ত

হত্যা সম্পর্কে আইন ও বিচারের প্রক্রিয়া স্বীয় গতিতে চলার পথে কি অন্তরায় রয়েছে, সে সম্বন্ধে সরেজমিনে তদন্তের উদ্দেশ্যে কমিশনারের একজন সদস্যর ঢাকার সফর করা আবশ্যক।

থ. এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত যে, কমিশনের সদস্য মিঃ জেফ্রি থমাস, কিউ, সি, একজন সাহায্যকারীসহ সরেজমিনে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৮১ সালের ১৩ই জানুয়ারী ঢাকা গমন করলেন। মিঃ জেফ্রি থমাস ও তাঁর একজন সহযোগী ঢাকা গমনের ভিসা লাভের জন্য তদন্ত কমিশনের সচিব ও সলিসিটার মিঃ এ্যাব্রো রোজ দরখাস্ত পেশ করেন।

দ. সদস্যদের বাংলাদেশ গমনের উদ্দেশ্যে সময়মত ভিসা দেয়া হবে উল্লেখ করে বাংলাদেশ হাই কমিশন বিষয়টি স্থগিত রাখেন।

ধ. ১৯৮১ সালের ১৩ই জানুয়ারী সকালে ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের ঐ দিন সন্ধ্যার ফ্লাইটের সুযোগ গ্রহণ করতে দেয়ার লক্ষ্যে একটি জরুরী অনুরোধ জানালে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশন জানায় যে, পাসপোর্ট ও ভিসা ঐদিনে অপরাহ্নে ফেরত দেয়া হবে। এগুলো চাওয়া হলে কন্স্যুলার বিভাগ বন্ধ বলে জানানো হয়।

ন. পরবর্তীকালে বাংলাদেশ হাই কমিশন সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয় যে তারা মিঃ জেফ্রি থমাস–এর ঢাকা ভ্রমণের জন্য ভিসা দিতে রাজী নয়। তদন্ত কমিশনের সচিব কর্তৃক বহু চিঠি লেখা, টেলিফোন করা ও ব্যক্তিগতভাবে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনে যাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ হাই কমিশন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ভিসা দেয়া হবে না বলে কোন প্রত্যাখ্যান পত্র বা এ জাতীয় কোন কিছু হাই কমিশন থেকে তিনি পাননি বলে উল্লেখ করেন।

উপরে বিবৃত ঘটনাসমূহ থেকে আমরা যে প্রাথমিক উপসংহারে উপনীত হয়েছি তা হল–

(ক) আইন ও বিচারের প্রক্রিয়া স্বীয় গতিতে চলতে দেয়া হয়নি।

(খ) এটাও প্রতীয়মান হয় যে, এ প্রক্রিয়ার বাধা সৃষ্টিতে সরকারই দায়ী।

(গ) এ সমস্ত বাধাগুলো উপড়ে ফেলা কর্তব্য এবং আইন, বিচারকে তাদের স্বীয় গতিতে চলতে দেয়া উচিত।

২০শে মার্চ ১৯৮২

তদন্ত কমিশনের ভাষণ : ১৪–২৮–হাই হলবর্ণ

লন্ডন ডব্লিউ সি–১

## ২৫. পরিশিষ্ট

## তদানীন্তন ডি এফ আই প্রধান ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুর রউফ-এর সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন : ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টই কি শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের উপর প্রথম আঘাত নেমে আসে না তার আগেও এমন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনার কথা আপনারা শুনেছেন বা আপনাদের গোচরে এসেছিল?

উত্তর : না, ১৫ই আগস্ট প্রথম আঘাত তার আগেও; অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে বা ১৯৭৫ সালের প্রথমে বঙ্গবন্ধু সম্ভবত ঢাকায় তার জীবনের শেষ জনসভা করেন, রমনা রেসকোর্সে জনসভা হয়।

একদলীয় সরকার কায়েমের উদ্দেশ্যে জনগণকে অবহিত করার জন্য এই জনসভা হয়। সেই মিটিং-এর আগের দিন আমাকে বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হিসেবে আমার একজন সহকর্মী (তিনি বাংলাদেশ কাউন্টার ইনটেলিজেন্স-এর পরিচালক ছিলেন) আমাকে টেলিফোনে জানান তাঁর সূত্র তাঁকে জানিয়েছে যে, ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের কিছু লোক সম্ভবতঃ ঐ মিটিংকে সামনে রেখে কোন কর্মসূচি নিয়েছে। তখন ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন কর্নেল ফারুক (১৫ই আগস্ট অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত), তিনি এই পরিকল্পনা করেছেন বলে কাউন্টার ইনটেলিজেন্সর ডাইরেক্টর আমাকে জানান। বঙ্গবন্ধুকে (তিনি তখন প্রেসিডেন্ট) হত্যা করা হবে কিনা এ কথা তখনও তিনি নিশ্চিত করে আমাকে জানাতে পারেন নি। তবে একটা শোডাউন তারা করতে চায়—এ ধরনের আশংকা তিনি প্রকাশ করলেন। ফারুক ওয়াজ ভেরী মাচ ইন ইট—এ কথা তিনি আমাকে জানান ব্রিগেডিয়ার মোমেন (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) তখন রেজিমেন্টের প্রধান ছিলেন। ফারুক তখন লেফট্যানেন্ট কর্নেল। পুরো কর্নেল নয়। ফারুক ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। কর্নেল (অব.) সাফায়াত জামিলের সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য। মোমেন ছিলেন রিপ্যাট্রিয়েটেড অফিসার। এ জন্য ফারুকের প্রভাব ছিল মোমেন সাহেবের চেয়ে বেশি। মোমেনকে বস্তুত সে কর্ণার করে রেখেছিল। উনচল্লিশ জন মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ছিলেন। বারোশত জন ছিলেন রিপ্যাটরিয়েটেড অফিসার, তবু যেহেতু মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাই তাদের প্রাধান্য স্বাভাবিকভাবেই ছিল এবং প্রায় সব "কী-পজিশনেই" মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন। সেটাও তখন ১৯৭২ সাল থেকে যে সেট আপ চলে আসছিল সেই সেট আপের কনটিনিউটি হিসেবে চলে আসছিল। অন্যথা হবার কথাও নয়। রিপ্যাট্রায়েটেড

অফিসাররাও অনেকে উল্লেখযোগ্য পোস্টে ছিলেন। ব্রিগেড কমান্ডেও ছিলেন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের অবদানের জন্য তাদের একটা আলাদা গুরুত্ব ছিল। সুতরাং ফারুক এ ব্যাপারে সত্যিই ইনভলবড হলে মোমেনের পক্ষে কতটুকু কি করা সম্ভব হবে, বা আদৌ হবে কি না তা চিন্তার বিষয় ছিল।

যাহোক আমি কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের পরিচালককে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এটা জানলেন কেমন করে—হাউ ডু ইউ নো দ্যাট? হোয়াট অ্যাবাউট দি সিও? কমান্ডিং অফিসার কি করছেন? তিনি বললেন, কমান্ডিং অফিসার খুবই সাদাসিধা এবং সহজ-সরল মানুষ, কোয়ায়াট- সিম্পল ম্যান। আমার বা অস্ত্র গুদামের চাবি ফারুকের কেয়ারেই থাকতো। যে অফিসারের কাছে থাকতো ফারুক লীনিং। সে জন্যই ফারুক দায়িত্ব দেয় তাকে। আজ রাতে ফারুক হয়তো সি, ওর অজ্ঞাতসারেই আলমারীর তালা খুলে ফেলবে। বেশ কতদিন থেকে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের সাথে রাতে আলাপ-আলোচনা করে।

তখন আমি কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের পরিচালককে বললাম, ওকে আপনি কমান্ডিং অফিসার মোমেনের বাসায় যান। তাকে গিয়ে বলেন আমি তার সাথে তার বাসায় কথা বলতে চাই। আমি তাকে কমান্ড করতে পারি না। কারণ আমার সংস্থার অফিসার তিনি নন, তবে আমি তাকে অনুরোধ করে পাঠালাম। আমি তখন খাচ্ছিলাম। এর মধ্যে দেখি মোমেন সাহেবকে কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের পরিচালক নিয়ে এসেছেন। মোমেন সাহেবকে বললাম, তোমার সেকেন্ড ইন কমান্ড সম্বন্ধে আমার ধারণা কি?

মোমেন আমাকে বললেন, দেখুন আমারতো কিছু অসুবিধা আছে। আমি বললাম, আপনার সেকেন্ড ইন কমান্ড যে আগামী কালকের রেসকোর্সের ময়দানে একটা শো-ডাউন করতে চাচ্ছে? তারা এ জন্য আলমারীর চাবি নিয়ে আগামীকাল অস্ত্র শস্ত্র বের করবে? মোমেন আমাকে বললেন, হয়তো হতে পারে বাট নট দ্যাট আই নো অ্যানি থিংস অব ইট। হয়তো তাদের এ রকম প্রয়াস থাকতে পারে। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না। তখন তাকে আমি বললাম, কীপ ওয়াচ আপন ইয়োর সেকেন্ড ইন কমান্ড। তোমার সেকেন্ড ইন কমান্ডের উপরে নজর রাখ। ভাল করে নজর রাখবে যাতে কোন ডিস্টারবেন্স সৃষ্টি করতে না পারে। জুনিয়ার কমিশনড অফিসারদের উপর নজর রাখবেন।

আমি চিন্তা করতে লাগলাম ব্যাপারটিকে কিভাবে বন্ধ করা যায়। দ্যাট মাস্ট বা স্টপড্। তখন উইং কমান্ডার সাহেব যিনি কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের প্রধান তাকে বললাম, আপনিও চিন্তা করেন।

কারণ ওনার ডাইরেকটরকে আমি হুকুম করতে পারি না। আমার সংস্থার অফিসারকে আমি ডেকে পাঠালাম। তার র‍্যাঙ্ক তখন লেফটেনেন্ট কর্নেল। তিনি আগে ইঞ্জিনিয়ার কোর-এর সাথে কাজ করেছেন। তাকে বললাম তুমিতো ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের সাথে ছিলে, বাই ভারচু অফ ইয়োর ওল্ড অ্যাসোসিয়েশান

উইথ দি ইঞ্জিনিয়ারিংস ইউ কীপ কনটাক্ট উইথ দেম টুডে অ্যান্ড আফটার। তোমার পুরান বন্ধু সাব এডিনেটের সাথে যোগাযোগ রাখ। যদি তোমার কাছে মনে হয় যে তাদের সহায়তায় ট্যাঙ্ক বাহিনীর লোকেরা অস্ত্র বারুদ নিয়ে মুভ আউট করতে চায় তবে তুমি যেন তাদের ভ্যানগার্ড; অর্থাৎ তাদের নেতার মত বা অগ্রগামী বাহিনীর মত। তাদের সাথে সাথে বাইরে যাবে, ফাঁক বুঝে আমাকে ইঙ্গিত দেবে। তাঁকে ছাড়াও আমার সেই লেফটেন্যান্ট, কর্নেল অফিসারকে আমি বললাম ইউ আর লুকিং আফটার ঢাকা ডিটাচমেন্ট।

সে সময়ে ব্রিগেড কমান্ডার গোলাম দস্তগীর ঢাকায় ছিলেন। তার পোস্টিং ছিল চট্টগ্রামে। তবে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন একটা কনফারেন্সে যোগদান করার জন্য। তখন দস্তগীর সাহেব ঢাকায় যে বাসায় উঠেছিলেন সেখানে যোগাযোগ করলাম। বিকেল হয়ে গেছে। বাসা থেকে বলল, তিনি চট্টগ্রাম যাবার জন্য এয়ারপোর্ট রওনা হয়ে গেছেন। সো আই সেন্ট ওয়ান অফ মাই অফিসারর্স টুদি এয়ারপোর্ট ফর হিম। তাঁকে ঢাকায় থাকতে বলার জন্য আমি একজন লোক পাঠালাম। পুরাতন এয়ারপোর্টে। আমার অফিসারকে বললাম, যে ভাবেই হোক এয়ারক্রাফট ডিটেইন করে হলেও তার সাথে কথা বলবে। এবং পাস্ দি মেসেজ টু দস্তগীর দ্যাট আই ওয়ান্ট টু টক টু হিম। দস্তগীরকে বলবে আমি তার সাথে কথা বলতে চাই। দস্তগীর ওয়াজ পুলড আউট অফ দি এয়ারক্রাফট, তাঁকে প্লেন থেকে নামিয়ে আনা হয়। দস্তগীর আমার বাসায় এলে তাকে বললাম ঘটনাটি। নাউ দ্যাট সাম জুনিয়র অফিসারস আর ট্রাইং টু গো ফর এ শোডাউন। সো উই জয়েন্টলী ইভলফড এ স্ট্রাটেজী। কিছু কাজ ভাগাভাগি করে নিলাম। আমার অফিসারদের ওয়াচ আউটে থাকতে বললাম। ডিফেন্স সেক্রেটারীকেও ঘটনাটা জানালাম। তার প্রেসিডেন্ট মুজিবকে গিয়ে বললাম–৩২ নাম্বারের বাসায় স্যার এই ব্যাপার ওটা বন্ধ করার জন্য কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাও বললাম, প্রেসিডেন্ট সাহেব আমার কথা শুনে বললেন, এরতো আমি সব কিছু জানি।

প্রেসিডেন্টেরও নিজস্ব একটা এজেন্সি ছিল। তারা এ সম্পর্কে কোন তথ্য প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছিল কিনা তা বলতে পারব না। তবে প্রেসিডেন্ট আমাকে বললেন, আমি এর সবই জানি।

প্রশ্ন : ফারুকের বিরুদ্ধে শাস্তি নেয়া হল না কেন?

উত্তর : আমার কাজটা ছিল তথ্য জানান। এ্যাকশন নেয়ার দায়িত্ব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের। প্রেসিডেন্ট আইন অনুযায়ী শাস্তি দিবেন। আর্মি চিফ বা অন্যান্যদের মতামত নেয়া হবে। তারা আর্মি এ্যাক্ট অনুযায়ী শাস্তি দিবেন।

প্রশ্ন : ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে হত্যাকাণ্ড কিভাবে ঘটে অন্তত আপনার জানামতে কিভাবে সংঘটিত হয়?

উত্তর : আপনাকে আগেই বলেছি ১৯৭৫–এর জুন মাসের কোন এক সময় একটা ট্রেনিং কোর্সের জন্য বিলেত যাই। দুই আড়াই মাস মেয়াদী ছিল কোর্স—

শেষ করে আগস্ট মাসের (৭৫) ১২ বা ১৩ তারিখে ঢাকায় পৌছি। ঢাকায় এসেই প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করি। আমি যে গোয়েন্দা সংস্থার কাজে নিয়োজিত ছিলাম তা সরাসরি প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তাই প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করাই স্বাভাবিক ছিল। আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করি রাত সাড়ে আট নয়টার দিকে নতুন গণভবনে। তখনকার তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুর তখন তার সাথে বসে কথা বলছিলেন ঘরে আর কেউ ছিলেন না।

আমি দেখা করলে প্রেসিডেন্ট আমাকে জানালেন যে, আমার অনুপস্থিতিতে কর্নেল জামিলকে আমার পদে নিয়োজিত করা হয়েছে। আমাকে লজিস্টিকস বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিতে বললেন।

আমি পরদিন কর্নেল জামিলকে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ বুঝিয়ে দেবার জন্য আমি আমার পুরান অফিসে যাই। যদিও কর্নেল জামিল আমার অনুপস্থিতিতে কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন, তবুও কিছু কাগজ পত্র সই করার ব্যাপার ছিল। কাজ বুঝিয়ে দেবার জন্যও সই করা দরকার। তাই আমি সেখানে যাই।

যা হোক, সে আমাকে বলল, সে এখনই বেরিয়ে যাবে। প্রেসিডেন্ট আগামীকাল (১৫ই আগস্ট '৭৫) ঢাকা ইউনিভার্সিটি যাবেন।

সংবাদ শোনা যাচ্ছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের একটা বিশেষ উইং ঢাকায় শো ডাউনের চেষ্টা করবে। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বা সিকিউরিটি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেবার জন্য কর্নেল জামিল তাই তাড়াতাড়ি শেখ কামালের সঙ্গে চলে গেলেন।

আমি তখন আমার অফিসে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। তখনতো আমি আউটগোয়িং অফিসার, হাতে কাজ নেই। এর মধ্যে তখনকার পুলিশের আইজি নূরুল ইসলাম আমাকে টেলিফোন করেন। তিনি আমাকে বললেন, "রউফ সাহেব আপনাকে পেয়ে ভালই হল। আমারতো এখন একটা বিরাট সমস্যা। আমাদের কাছে বলা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মাইন পুঁতে রাখা হতে পারে বা হয়েছে। কালকে প্রেসিডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে তারা একটা সিচুয়েশান সৃষ্টি করতে পারে।"

আমি বললাম, "আমিতো আর এখন (গোয়েন্দা সংস্থার) চাকুরীতে নেই, আমাকে তো লজিস্‌টিক্সের হেড করা হয়েছে। আজ কালের মধ্যেই চার্জ বুঝিয়ে দেব আমি।"

তিনি বললেন, তবুও একটু সাহায্য আপনাকে করতে হবে। আমিতো নতুন ডিজি চিনি না। আবার তাকে পাচ্ছিও না। ইউনিভার্সিটিতে শুনেছি কারা মাইন পুঁতে রেখেছে। আপনাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের সদস্যদের আমাদের সহযোগিতার জন্য পাঠান। আমরাতো মাইন হ্যান্ডল করার টেকনিক জানি না।

ওখানে বেরিড মাইন প্রডিং এবং ক্লীনিং-এর জন্য কিছু লোক দরকার।

আমি বললাম, কাউকম ইউনিভার্সিটি বয়েজ আর প্লান্টিং মাইনস। আই জি বললেন : নো দেয়ার আর রিউমার্স ইন দি সিটি। সুতরাং আমাকেতো ব্যবস্থা

নিতেই হবে। আমি বললাম, হোয়াই আর ইউ টকিং, আপনি এ সব কি বলছেন? এসব মাইন পোঁতার মত কাজ ছাত্ররা কিভাবে করবেন? তারা না হলেও কারা এ সব করতে পারে? কেন করবে?

প্রশ্ন : মাইন পুঁততে কত সময় লাগে? মাইন পোঁতার জন্য কি অভিজ্ঞতার প্রয়োজন?

উত্তর : অভিজ্ঞতা তো দরকার বটেই। তবে পুঁততে বেশি সময় নেয় না যদি ছোট জায়গায় স্যাবোটাজের জন্য হয়। তবে ডিফেন্স স্কীমের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পুঁততে কিছু সময় নেয়। পুরো রাত লাগে; কারণ জায়গাও থাকে বড়।

যা বলছিলাম ছেলেদের কাছে স্বাধীনতার পরে যে কারণেই হোক অস্ত্র এসেছে, হাতবোমা পিস্তলের কথা আমি অনুমান করতে পারি—কিন্তু মাইন? আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্যই মনে হচ্ছিল না, ছেলেদের কাছে মাইন থাকতে পারে। যা হোক তিনি বললেন, ভাই আমার একটা ইনজিনিয়ারিং ব্যাটালিয়ন চাই—এগারটা সেকশন। আমরা আজ ঠিক রাত বারোটায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসব। আমরা সেখানে এগারটা টীমে ভাগ হব। প্রতিটি টীমে ইনজিনিয়ারিং ব্যাটালিয়নের লোক, পুলিশের লোক, স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক ছাড়াও আরও তিনটি গোয়েন্দা সংস্থার লোক উপস্থিত থাকবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইন পুঁতে রাখা হয়েছে কথাটা আমার বিশ্বাস হলো না। আই, জি বারংবার বলার পর আমি বললাম, দেখুন আমারতো বদলির ওয়ার্ডার হয়ে গেছে। তিনি আমাকে বললেন, তবু আপনি যদি জেনারেল সফিউল্লাহকে এ ব্যাপারে বলে দেন। আমি বললাম, আপনাদের কি দরকার বলুনতো? আই, জি নূরুল ইসলাম বললেন, আমরা সকল গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশের লোক মধ্যরাতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মিলিত হব। তাদের সংগে সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়নের লোকও থাকবে। তারা ১১টি শাখায় ভাগ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাটির নিচে মাইন পুঁতে রাখা হয়েছে কিনা বা অন্য কোন অস্ত্র শস্ত্র রাখা হয়েছে কিনা তা দেখবে। ভোর রাত পর্যন্ত এই সার্চ চলবে। তারপর সারা ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার দায়িত্ব পোশাকধারী পুলিশের হাতে দেয়া হবে। আমি বললাম, দেখুন আমিতো এই গোয়েন্দা সংস্থায় নেই। তবু আপনি যখন বলছেন আমি সেনাবাহিনীর শফিউল্লাহ সাহেবকে বলে দেব। আমি তখন সফিউল্লাহ সাহেবকে টেলিফোন করলাম। শফিউল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আই, জি সাহেব আমাকে বলছেন না কেন? আমি বললাম, তিনি এই গোয়েন্দা সংস্থায় টেলিফোন করে আমাকে পান। তিনি অনুরোধ করেন ব্যাপারটা আপনাদের জানাতে। নাউ ইফ ইউ থিংক ইউ শুড ডু সামথিং, ইউ ডু অর ফরগেট অ্যাবাউট ইট, আপনি যদি মনে করেন আপনার কিছু করা উচিত, তাহলে করবেন, যদি মনে করেন কিছু করার নেই আপনি সেই রকম সিদ্ধান্ত নিন। শফিউল্লাহ পরে অবশ্য একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়নকে অর্ডার পাস করে দেন সার্চ পার্টিতে থাকার জন্য।

তিনি আমাকে টেলিফোনে জানান তিনি অর্ডার পাস করে দিয়েছেন। আমি বললাম, তাদের মিডনাইটে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের কাছে পুলিশ কন্ট্রোলরুমে হাজির হতে হবে।

১৫ই আগস্ট ভোররাতে—সময় ঠিক মনে নেই, অনুমান রাত আড়াইটার দিকে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক সেই উইং কমান্ডার ভদ্রলোক আমাকে টেলিফোন করলেন। আমি তখন বলতে পারেন জেন্টলম্যান অ্যাটালার্জ। গোয়েন্দা সংস্থা থেকে বদলি অর্ডার হয়ে গেছে নতুন পোস্টে তখনও যোগদান করিনি। গোয়েন্দা সংস্থা থেকে আমার জন্য একটা ডিনার অ্যারেঞ্জ করেছিল। সেটা হয়ে গেলেই নতুন পোস্টের দায়িত্ব বুঝে নেব—তবে অ্যাট মাই হার্ট অফ হার্ট আমি চাচ্ছিলাম সেনাবাহিনীর চাকুরী ছেড়ে দিতে। তখন শৃঙ্খলার যে অবস্থা ছিল তাতে এর বেশি কিছু আমি মনে করতে পারিনি।

যাহোক যা বলছিলাম—কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ভদ্রলোক আমাকে টেলিফোনে যখন জানান তখন রাত দুটো কিংবা আড়াইটা হবে। ভদ্রলোকের নামটা বলতে চাই না, কারণ তিনি একটা সরকারী চাকুরীতে এখনও আছেন। তিনি স্বাধীনতার প্রথমদিক থেকেই ছিলেন। আমার সঙ্গেও কাজ করেছিলেন। কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক সাহেবের বাসা ছিল জিয়াউর রহমান সাহেবের বাসার কাছেই। তাকে পাচ্ছি না। আপনি আমাদের ইমিডিয়েট পাস্ট পরিচালক তাই আপনাকে ব্যাপারটা জানান উচিত মনে করে এত রাতে টেলিফোন করলাম। আমি বললাম কি ব্যাপার? তিনি বললেন, স্যার লেট মী কোট্ মাই ফিল্ড চীফ। দি ট্যাঙ্কস হ্যাভবীন টেকেন আউট। দে আর মুভিং টোয়ার্ডস দি সিটি-ট্যাঙ্কগুলো বের করা হয়েছে। সেগুলো শহরের দিকে নেয়া হচ্ছে। আমি বললাম, ডু ইউ থিংক দেয়ার ইজ গেয়িং টু বি এনি আপরাজিং, আপনার কি ধারণা কোন অভ্যুত্থান হতে যাচ্ছে? দে আর অন সাম্ আদার বিজিনেস। পরিচালক আমাকে বললেন, স্যার সামথিং ভেরী সিরিয়াস ইজ গোয়িং টু টেক প্লে। মনে হয় একটা ভীষণ কোন ব্যাপার হতে যাচ্ছে। আমি বললাম, তোমার কাছে পজেটিভ কোন ইনফরমেশন, নির্দিষ্ট তথ্য আছে? উইং কমান্ডার বললেন, না ঠিক তা নেই—তবে ট্যাঙ্কগুলো বের হয়ে শহরের দিকে যাচ্ছে—সে কথা সত্য এবং ট্যাঙ্ক আর্মরড কার থেকে অটোমেটিক ফায়ার বার্স্ট-এর শব্দ আসছে। এই বলে আমি আমার রিসিভারে মনোযোগ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করলাম। ওর দিক থেকে পরিষ্কারভাবে অটোমেটিক ফায়ার বার্স্ট-এর শব্দ শুনতে পেলাম।

কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক তখন আমাকে বললেন, আমার যা মনে হচ্ছে ট্যাঙ্ক নিয়ে ওরা ধানমণ্ডি ৩২ নাম্বর রোডে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের দিকে যাচ্ছে।

আমি তখন বললাম, ডু ইউ কন্টাক্ট জামিল-ইয়র নিউ বস? সে বলল, তাকে তো পাচ্ছি না। আমি বললাম, আই অ্যাম, আউট অফ পোস্ট আমি তো ঐ পদে নেই তবু বলছি, হ্যাভ ইউ টোলড দি প্রেসিডেন্ট? উইং কমান্ডার বলল, স্যার আই

ক্যান্ট ডু দ্যাট– এ উইং কমান্ডার ক্যান নট ডু দ্যাট। আই ক্যান ইনফরম মাই বস অনলী। তারপরেও ঘটনাটি টিল নাউ হাফ কনফারমড—ট্যাংকস আর মুভিং আউট অলরাইট বাট দ্যাট দে আর মুভিং টু ধানমন্ডি রোড নাম্বার থারটি টু ইজ মাই গেস। ট্যাঙ্ক বের হয়েছে সত্যি কিন্তু ট্যাঙ্কগুলো যে ৩২ নাম্বারের দিকে যাচ্ছে সেটা আমার অনুমান। ইফ দি ইনফরমেশান ওয়াজ রং আই উইল বী ইন ট্রাবল। খবরটা ভুল হলে আমার উল্টা বিপদ হবে। তখন আমি বললাম তবে, ইউ ওবে মী ইনফরর্মড ইন দি ইভেন্ট ইউ ডোন্ট গেট ইয়োর নিউ বস। তোমার বসকে– না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে জানাতে থাক দেখি কি করা যায়। আমি দুই এক মিনিট চিন্তা করে জেনারেল শফিউল্লাহকে লাল টেলিফোনে ফোন করলাম।

শফিউল্লাহ তখন আর্মির চিফ। তখন আমি জেঃ শফিউল্লাহকে বললাম, হ্যাভ ইউ কমিশনড অ্যানি অফ ইয়োর ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টস টু দি সিটি অর ইফ নট হ্যাভ ইউ বাই নাউ কাম টু নো অপ দি ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট। আপনি কি কোন কাজে আপনার ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টকে বাইরে পাঠিয়েছেন অথবা কেউ কোন এডভেনচারইজমের আশ্রয় নিচ্ছেন এমন কোন সংবাদ আপনার কাছে পৌছেছে।

শফিউল্লাহ সাহেব বললেন, আমি তেমন কিছু জানি না, তবে এই রকম একটা কথাতো শুনেছি। আমি বললাম, হোয়াট ডু ইউ মীন, ইউ হ্যাভ নো পারমিশন হু কুড ডু ইট। জেনারেল শফিউল্লাহ আমাকে বললেন, না তেমনতো কোন ধারণা আমার নেই। আমি কিছুতো বুঝতে পারছি না। আমি বললাম, ঠিক আছে আপনি আপনার ডেপুটি চীফ বা সিজি-এর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে জানুন– হু কুড বী ইন ইট। তাছাড়া ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডারকেও জিজ্ঞাসা করতে পারেন। দি বয় ইজ ইন দি সিটি। আপনারতো ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডারকে জিজ্ঞাসা করা উচিৎ। তিনি শহরেই আছেন। শফিউল্লাহ আমাকে বললেন, ঠিক আছে আমি তাই করব।

প্রশ্ন : ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার তখন কে ছিলেন?

উত্তর : শাফায়াত জামিল। আমি তখন একটু চিন্তা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি লুঙ্গি পরে শফিউল্লাহ সাহেবের বাসায় রওনা হলাম। আমার গার্ড কমান্ডারও আমার পিছনে পিছনে এল। বলল স্যার একা যেতে পারবেন না। আমরা যখন চীফ অফ স্টাফের বাড়ির পঞ্চাশ গজ দূরে তখন আমাদের চিফ অফ স্টাফের বাড়ির গার্ড চ্যালেঞ্জ করল, হু কামস দেয়ার, হল্ট। আমি বললাম, আই অ্যাম ব্রিগেডিয়ার রউফ, ডোন্ট ফায়ার। ওর বাসার দরজা তখন লক করা। আমি বললাম, ভিতরে যাব কেমন করে? বলল, স্যার আপনার হাতটা একটু বাড়িয়ে দেন আমরা আপনাকে হাতের উপর করে দরজার উপর থেকে নিয়ে যাব। ওরা আমাকে বাইরের দিক থেকে হাত বাড়িয়ে উঁচু দেওয়ালের উপর তুললো। এরপর আবার হাত নিচু করে বাড়ির ভেতর নামিয়ে দিল। নামতে গিয়ে আমার পায়ে একটু চোট পেলাম। যাহোক নিচে নেমে চিফ অফ স্টাফের বাড়ির ভেতরে নেমে আমি অবাক হলাম। আই ওয়াজ সারপ্রাইজড টু সী দ্যাট ব্লাক মার্সিডিজ ইজ বাথিং আন্ডার দি

পোর্চ, দ্যাট ব্লাক মার্সিডিজ বিলংগড টু জেনারেল জিয়াউর রহমান। দেয়ার ওয়াজ অনলী ওয়ান ব্লাক মার্সিডিজ ইন দি আর্মি অ্যাট দ্যাট টাইম। জেনারেল জিয়াউর রহমান গাড়িটি ব্যবহার করতেন। তখন আর্মিতে একটাই মার্সিডিজ গাড়ি ছিল। তাই চিনতে পেরেছিলাম। গাড়িটি দেখেই আমার মনে চিন্তা এল তারা দুই জনে এতরাতে এখানে কি চিন্তা করছেন। ডেপুটি চিফ কখন এলেন? কেন এলেন? আমি তখন সাত পাঁচ ভেবে ভেতরে ঢুকলাম। পোর্চের কাছে এসে জিয়াউর রহমান সাহেবের এ-ডি-সি কাইয়ুমের সাথে দেখা হলো। আমি কাইয়ুমকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কখন এসেছ? সে বলল, স্যার কিছুক্ষণ আগে? আমি বললাম, হোয়াট দে (শফিউল্লাহ ও জিয়া) আর ডুয়িং? কাইয়ুম বলল, স্যার আই জাস্ট ডোন্ট নো।

আমি জেনারেল জিয়াউর রহমান সাহেব ও শফিউল্লাহ সাহেবকে ভালোভাবে জানতুম। আমি ড্রইংরুমে গেলাম না। ড্রইং রুমের কাছে একটা প্যাসেজ, সেই প্যাসেজের পর একটা ছোট্ট রুম। আমি গিয়ে দেখি জেনারেল শফিউল্লাহ ইজ সীটিং দেয়ার লুকিং লস্ট। আমি গিয়ে দেখি শফিউল্লাহ সাহেব ঘরে বসে আছেন। তার ইউনিফর্ম পরা। ক্যাপটা মাথায় নয়। হাতে ব্যাটন আছে। আমি গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম জেনারেল হোয়াট ইজ ইয়োর প্রোব্লেম। হোয়ার ইজ দি ডেপুটি চিফ, হোয়ার ইজ জেনারেল জিয়াউর রহমান? হোয়েন ডিড হি কাম টু ইউ? হোয়াই হ্যাজ হি কাম অ্যাট দিস আওয়ার? তিনি কোথায়? আপনার কাছে এতরাতে তিনি কি মনে করে এলেন? শার্ট আর ট্রাউজার পরলাম। আমার বাসা ক্যান্টমেন্ট গলফ কোর্সের কাছে ছিল। ঐ গলফ কোর্সের এক মাথায় শফিউল্লাহর বাসা অন্য মাথায় আমার বাসা। আমি বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে আমার গার্ড কমান্ডার এসে দাঁড়ালো, বলল স্যার আপনি যাচ্ছেন কোথায়? তাকে কিছু বলতে যাব এমন সময় একটা টেলিফোন এলো আমার পরিচিত একটা ছেলের কাছ থেকে। মানিকগঞ্জের তোজাম্মেল আলী সাহেবের, সে আমাকে টেলিফোন করে বলল, ভাইজান আপনি কেমন আছেন? আমি বললাম, আমি কেমন আছি মানে? সে তখন আবার বলল, আমাদের এখানে বোমা পড়ছে। আমি বললাম, আপনি কোথা থেকে বলছেন? তিনি বললেন, আমার বাসা মোহাম্মদপুর এলাকায়। আমি বললাম, আপনাদের ওখনে বোমা পড়ছে মানে! সে বলল, আপনাদের আর্টিলারীর গোলা পড়ছে। দুই তিন জন ক্যাজুয়ালটি হয়ে গেছে। একটা মানুষ রাস্তায় পড়ে আধমরা অবস্থায় চিৎকার করছে। তাকে রেসকিউ করে হাসপাতালে পাঠাবার জন্য একটা এম্বুলেন্সের জন্য কত হাসপাতালে টেলিফোন করলাম। কোথাও এম্বুলেন্স পেলাম না। লোকটা একটু পরোপকারী ছিল। আমার ধারণা হলো এ এলাকায় হয়তো সিরাজ সিকদার বা জাসদের আন্ডার গ্রাউন্ড উইং-এর কোন দল কারোর পরে হামলা করেছে। আমি বললাম, আপনি মোহাম্মদপুর থানায় যান না কেন? তিনি বললেন বাইরে ভীষণ গোলাগুলির শব্দ। ধানমণ্ডির দিক থেকে গোলাগুলি হচ্ছে। আমি

যাহোক তার কাছ থেকে এম্বুলেন্সের নাম্বারটা নিলাম। তারপর এম্বুলেন্সের জন্য টেলিফোন করে মোহাম্মদপুর যে এলাকার ঠিকানা সেখানে যেতে বললাম। তখন এম্বুলেন্সের উপস্থিত ছিল না-আধা ঘন্টা পরে তারা আমাকে টেলিফোন করে জানায় এম্বুলেন্স রওনা হয়ে গেছে। তারপর আমি মোহাম্মদপুর থানার ওসিকে টেলিফোন করে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার হয়েছে আপনাদের ওখানে? সে বলল, স্যার মর্টারের গোলা পড়েছে এখানে, আমি বললাম, কোথা থেকে আসছে এই গোলা? সে বলল, স্যার আমি বলতে পারি না। আমি বললাম, ইউ গো আউট অ্যান্ড সী। সে আমাকে জিনিসটি কয়েক মিনিট পরে জানাল স্যার ধানমণ্ডির দিক থেকে হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। এইভাবে প্রায় আধঘন্টা পৌনে এক ঘন্টা হয়ে গেছে তখন আমি আবার টেলিফোন করলাম জেনারেল শফিউল্লাকে। আমি বললাম, বাট নাও আর ইউ ক্লিয়ার হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? হু ইজ ইন আর হু আর ইন ইট। আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন কি হয়েছে?—কারা বা কে এতে জড়িত। শফিউল্লাহ বললেন, না। এখনও কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। আমি বললাম, ঠিক আছে আমি আপনার বাসায় আসছি। এসে কি তিনি অভ্যুত্থানের কথা কিছু জানিয়েছেন? কি বলেছেন? আমি বললাম হুইজ ডুয়িং ইউ টেল মী।

শফিউল্লাহ আমাকে বললেন, আমি কিছু জানি না। তবে খালেদ মোশাররফকে বলেছি। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ তখন (সি জি এস) টু রাশ টু দি সিটি অ্যান্ড টু টেক দি ফোর্স– ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট উইথ হিম। আমাকে শফিউল্লাহ সাহেব একটা ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে তিনি বিভিন্ন জায়গায় টেলিফোন করতে লাগলেন, কিন্তু টেলিফোনেও তিনি তেমন কাউকে পাচ্ছিলেন না। আমি বললাম, ঠিক আছে আপনি আপনার গাড়িতে বসুন তারপর আর্মি হেড কোয়াটার্সে চলুন। সেখানে থেকে উইল ডু ইয়োর পারট, ইয়োর পারট অফ দি ডিউটি। আই উইল গো টু আওয়ার এজেন্সী এ্যান্ড ফ্রম দেয়ার উই উইল বী অ্যাবল টু সেফ কুইক আন্ডারস্টাডিং অব দি সিচুয়েশান হোয়েন আই গেট সামথিংস আই উইল রাশ টু ইয়োর অফিস। প্লিজ গেট ইয়োর টেপস, অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু গেট ইউ ইন ইউর কার ইন মাই প্রেজেন্স। আমি থাকতে থাকতেই আমি চাই আপনি এখান থেকে বেরিয়ে অফিসে আসুন। এর মধ্যে লাল টেলিফোনটা বেজে উঠেছে। আমি টেলিফোন তুললাম। ফোনে কথা বললেন হোম মিনিস্টার মনসুর আলী। তিনি টেলিফোন করে বললেন, হ্যালো শফিউল্লাহ? আমি বললাম, না, স্যার আমি রউফ বলছি। উনি আমাকে বললেন। রেডিও স্টেশনে কিছু লোক পাঠিয়ে দেন। সাম পিপুল হ্যড ক্যাপচারড ইট। আমি বললাম, স্যার আমারতো কমান্ড নেই– আমি গোয়েন্দা সংস্থার লোক, শফিউল্লাহ সাহেব এলেই আমি আপনার মেসেজ ওনাকে দেব। উই আর এ্যালাইভ টু দি সিচুয়েশন। মনসুর আলী বললেন, দেরী করবেন না। ইমিডিয়েটলী অ্যাকশনে যান। শফিউল্লাহ সাহেবকে নিয়ে পরে আমি আর্মি হেড কোয়ার্টারসে গেলাম। জেনারেল শফিউল্লাহকে ওখানে নামিয়ে দিয়ে আমি শর্ট

কার্ট রাস্তায় গেলাম আমাদের সংস্থার অফিসে।

আমি গোয়েন্দা সংস্থার অফিসে গিয়ে পেলাম মেজর জিয়াউদ্দিনকে। তার কথা আগেই বলেছি ওকে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থায় নেয়া হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের নির্দেশেই। মেজর জলিলের দ্বারা প্রভাবিত হবার জন্যই কোন কোন অফিসার তাঁকে নিয়মিত বাহিনীতে নেবার বিরোধিতা করার জন্যই প্রধানমন্ত্রী ওকে গোয়েন্দা সংস্থায় কাজ করার নির্দেশ দেন। ওর র‍্যাংক এবং নিয়মিত সিনিয়রিটিও বহাল রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এই সংস্থায় ঢুকার সময় সে ছিল ক্যাপটেন। তিন মাস পর ওর সিনিয়রিটি হলে ওকে মেজর করা হয়। ও গোয়েন্দা সংস্থার জন্য ভাল কাজ করে। হি ওয়াজ এ গুড অফিসার ফর দি এজেন্সি। আমি তখন আমাদের সংস্থায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন সে ছাড়া অন্য কোন অফিসার সেখানে ছিল না। সে আমাকে দেখতে পেয়েই বলল, স্যার অই উইল ওয়ার্ন ইউ নট টু সিট ইন দিস অফিস এলোন। ইউ মাস্ট গেট আউট অব দিস অফিস অ্যান্ড মাস্ট জয়েন আদার সিনিয়র অফিসারস হয়ার এভার দেয়ার। স্যার খবরদার এই অফিসে একা থাকবেন না। অন্যান্য সিনিয়ার অফিস্যাররা যেখানে আছেন সেখানে তাদের সাথে গিয়ে আপনি যোগ দেন। এখানে থাকলে আপনার বিপদ হতে পারে। আমি বললাম, হোয়াট? কেন? সে বলল, স্যার আই উইল নট গেট ইনভলভড ইন এনি আরগুমেন্ট উইথ ইউ, পারটিকুলারলি অন দিস ইস্যু! আমি আপনার সাথে কোন তর্ক করতে চাইনে। এ ব্যাপারেতো নয়ই, আমি আপনার সেফটির জন্য বলছি আপনি অন্যান্য সিনিয়র অফিসারদের সাথে থাকুন। একা থাকবেন না। তাহলে বিপদ হতে পারে। আই কনট্যাকটেড ইয়োর হাউস টেক ইউ নট টু কাম ওভার হিয়ার। বাট ইউ আর নট দেয়ার। নাউ দ্যাট আই মিট ইউ হিয়ার, আই রিকোয়েস্ট ইউ নট টু সিট হিয়ার এনি মোর। স্যার আমি আপনার বাসায় যোগাযোগ করে এখানে আসতে নিষেধ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি আপনাকে বাসায় পাইনি। স্যার আপনাকে আবারও বলছি দোহাই এখানে থাকবেন না। আপনার জন্য দুঃশ্চিন্তার কারণ আছে বলে বলছি। আপনি একটা দণ্ড এখানে থাকবেন না। ইট ইজ নট সেফ ফর ইউ। এখানে থাকা আপনার জন্য এক মুহূর্ত নিরাপদ নয়। এই বলেই সে আমাকে গাড়িতে তুলে দিল।

তখন আমি ফিরে এলাম আর্মি হেড কোয়ার্টারসে। আমি এসে দেখলাম শফিউল্লাহ সাহেব, জিয়া সাহেব, এয়ার চীফ এ.কে. খন্দকার, নেভাল চীফ এম এইচ খাঁন, আরও কয়েকজন রেড টেপ সিনিয়র অফিসার; ইট ওয়াজ অ্যারাউন্ড ডন–সোবেহ সাদেকের সময় হবে। ইউ কেম টু নো এ কুঁ হাজ টেকেন প্লেস আমরাও আমাদের অফিসারদের মাধ্যমে তথ্য পেয়েছি। আমি সব সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে বসে বসে চিন্তা করেছিলাম এই ঘটনার পেছনে একজন অন্তত উচ্চপদস্থ অফিসারের হাত হবে। সেই অফিসার কে? আমি প্রথমে শফিউল্লাহ সাহেবের চোখে সোজাসুজি তাকালাম। তার মধ্যে ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম না। তিনিও আমার দিকে আগের মতই তাকিয়ে কথা বললেন। তবে হি লুকড হোপলেস

অ্যান্ড লস্ট। তাকে কেমন যেন অসহায় মনে হতে লাগল। মনে হল এমন অসহায় তাকে আর কখনও দেখিনি। হি ওয়াজ রাদার নার্ভাস। কেমন দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন মনে হল, তাই মনে হল হয়তো এই সব ঘটনার সাথে জড়িত নাও হতে পারেন। এরপরে তাকালাম জেনারেল জিয়াউর রহমান সাহেবের দিকে, কিন্তু তিনি সারাক্ষণ নিচের দিকে তাকিয়েছিলেন। তার চোখের দিকে চেষ্টা করেও তাকান যাচ্ছিল না। আবার তিনি অসহায় এমনও মনে হচ্ছিল না।

যাহোক তারপরে তাকালাম রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খানের দিকে। তারদিকে তাকানোর সাথে সাথে তিনি আমাকে বললেন, ব্রিগেডিয়ার রউফ ইউ অয়ারর দি ইমডিয়েট লাস্ট হেড অফ দি এজেন্সী, মেবী ইউ আর দেয়ার নাউ হোয়াই ডন্ট ইউ ফাইন্ড আউট হু ইজ ডুয়িং হোয়াট। এডমিরাল এম, এইচ খাঁন আমাকে বললেন, রউফ সাহেব কিছুদিন আগে পর্যন্ত আপনি সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন। হয়তো এখন নেই, আপনি কেন খোঁজ–খবর নিচ্ছেন না কারা এই সব কাণ্ড ঘটাল। আপনি বলছেন না কেন ইউ টেল হু ইজ ডুয়িং হোয়াট। আপনি বলুন এইসব ঘটনা কারা ঘটিয়েছে? তারা কারা? তাদের পিছনে কারা আছে? আমি বললাম, এডমিরাল টু বি অনস্ট, আই উইল টেল উইথ ডিউ অ্যাপলজি আই ডোন্ট নো হু ইজ ডুয়িং হোয়াট। আমি বললাম, অ্যাডমিরাল সাহেব, আমাকে মাফ করবেন, সত্যি কথা বলতে কি, আমার কাছে সঠিক তথ্য নেই, এখনও আমার কাছে তেমন কোন তথ্য নেই। ইউ ওয়ান্ট সী টু ব্রীপ অন দি সিচুয়েশন, আই অ্যাম এফরেইড আই ক্যান নট। এই মুহূর্তে যদি আপনি বলেন আপনাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করতে তা পারব না, আমি দুঃখিত। আমি এরপর বিমানবাহিনীর প্রধান এ, কে খন্দকারের মুখের দিকে তাকালাম। তিনিও অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং অসহায় বলে মনে হল।

এর মধ্যে চিফ অফ দি জেনারেল স্টাফ খালেদ মোশারফ দরজা খুলে আর্মি চিফ শফিউল্লাহর ঘরে ঢুকলেন। তাকে অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছিল, শুধু অসহায় বললে কম বলা হবে মনে হচ্ছিল যে সে যেন একেবারেই ভেঙে পড়েছে। হি লুকড টেরিবলী ব্রোকেন অ্যান্ড ওয়ারী অ্যান্ড অ্যাবসলুটলী লস্ট। হি ওয়াজ গারস্কয়িবং। তার ক্লান্ত দেহ ভর্তি ঘামে। তিনি মিশনে গিয়েছিলেন, যে ট্যাংক বহর নিয়ে ৩২ নাম্বার রোডের দিকে গিয়েছিল অভ্যুত্থানকারীরা তাকে পাঠান হয় সে ট্যাংক বহরের প্রতিরোধের জন্য। তিনি তার মিশন থেকে এসে শফিউল্লাহকে বললেন, স্যার আই ওয়েন্ট টু দি সিটি ইউথ ফোর ইস্ট বেঙ্গল। বাট দি সিচুয়েশান ইজ নাউ আউট অব কন্ট্রোল। শফিউল্লাহ আকসড হিম টু সীট ডাউন। খালেদ মোশারফ সাহেব এসে সফিউল্লাহ সাহেবকে বললেন, স্যার আমি চার নাম্বার ইস্ট বেঙ্গল বাহিনীকে নিয়ে শহরে গিয়েছিলাম। (ট্যাংক বহরকে বাধা দেবার জন্য) কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে। শফিউল্লাহ সাহেব তাকে বসতে বললেন।

প্রশ্ন : খালেদ মোশাররফ সাহেব কি অভ্যুত্থানকারীদের বাধা দিতে গিয়েছিলেন?

উত্তর : জ্বী হি ওয়াজ আউট উইথ ফোর ইস্ট বেঙ্গল টু দি সিটি ফর দ্যাট পারপাস। বাট দে স দ্যাট ট্যাঙস ওয়ায়ার ডেমলয়েড। সো দে হার্ট ইউ উড বী ফিউটাইল টু ডু এনিথিং উইথ দি অর্ডিনারী উইপন্স। সো দে কেম ব্যাক। জ্বী হ্যাঁ।

খালেদ মোশাররফ সাহেব অভ্যুত্থানকারীদের বাধা দেবার জন্যই চার নাম্বার বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাবাহিনীকে নিয়ে শহরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারা দেখতে পান যে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বিশেষকরে ৩২ নাম্বার রোডের কাছে বেশ কয়েকটি ট্যাংক মোতায়েন করা আছে। তাদের সাথে যে অস্ত্র ছিল; অর্থাৎ মর্টার বা অন্যান্য সাধারণ অস্ত্র দিয়ে ট্যাংক মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না। আমরা কিন্তু এখনও জানি না শেখ ইজ কিল্ড। আমরা অভ্যুত্থান হয়েছে শুনেছি। তার প্রধান সঙ্গী মারা গেছেন শুনিনি। আমি খালেদ মোশাররফের চোখের দিকেও তাকালাম; কারণ খালেদ মোশাররফও খুব উচ্চাকাংখী ছিল। আমার মনে প্রশ্ন এল কুড হি ডু দ্যাট। তার পক্ষে সম্ভব? কিন্তু তাকে যেমন অসহায় এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হল তার সম্পর্কে আমার সন্দেহ মনে রইল না।

এমন সময় শফিউল্লাহ সাহেবের অফিসের সামনে দরজায় ভীষণ জোরে শব্দ হতে লাগল। দেয়ার ওয়ার ভেরী বিগ ব্যাংগ অন দি ফ্রন্ট ডোর অব দি চীফস অফিস রুম। আর অফিসের দুটো দরজা ছিল। একটা পারম্যানেন্টাল বন্ধ থাকতো। আর একটা দরজা ছিল সেই দরজায় ভীষণ শব্দ হচ্ছে। কে যেনো পাশের দরজাটা খুলে দিল। তখন বাইরের থেকে একটা স্টেনগান নিয়ে ঢুকল ডালিম। সে ভীষণ জোরে চীৎকার করে বলতে লাগলো হোয়ার ইজ দি চীফ অফ স্টাফ? তার সার্টের বোতাম খোলা। হাপ ওয়ে ডাউন। বুকের কিছুটা দেখা যায়। হিজ আইজ ওয়ার রেড। তার চোখ লাল। শফিউল্লাহ সাহেব তার টেবিলেই বসেছিলেন। আমরা সবাই তাকে ঘিরেই বসা। তাকে দেখতে না পারার কিছুই ছিল না। শফিউল্লাহ দরজার দিকে মুখ করেই বসেছিলেন। মনে হয় তাকে কেমন যেন একটা ক্লায়ারডভিজন আক্রান্ত লোক মনে হচ্ছিল; অর্থাৎ যে সব কিছু ধোঁয়াটে দেখে এমন একজন লোক। এমন ধোঁয়াটে যে, চিফ ওয়াজ সীটিং অন হিজ হিউজ চেয়ার জাস্ট ফেসিং ডোর, হি হ্যাড স্ট্যান্ড ইন অ্যান্ড হি ওয়াজ আসকিং হোয়ার ইজ দি চিফ অফ দি স্টাফ?

প্রশ্ন : তার এমন হচ্ছিল কেন বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর : আই জাস্ট ডোন্ট নো। আমি জানি না হোয়াই ওয়াজ ডুয়িং লাইক দ্যাট। বাট হি ওয়াজ এক্সাকটলী ডুয়িং দ্যাট। সে কেন এমন করছিল জানি না— তবে তাইই করছিল। আই রীড বাট হি কুড নাইদার সী নর রিকগনাইজ দি চীফ অফ দি স্টাফ। সে সময়ে আর্মি হেড কোয়ার্টারসে মিলিটারী সেক্রেটারী (এম এস) ছিলেন জেনারেল নাসিম। মিলিটারী সেক্রেটারী অ্যান্ড হিজ ব্রাঞ্চ ওয়ার্কাস ডাইরেকটলী আন্ডার দি চিফ অফ স্টাফ। হি ইজ রেসপ্যানসিবল ফল মেইনটেইনিং দি রেকর্ডস অফ অফিসার্স অ্যানাউনসিং এ্যান্ড দেয়ার ট্রান্সফারস এটসেকটরা। জেনারেল নাসিম বললেন, ডালিম ডোন্ট ইউ সী দি চীফ ইজ সীটিং জাস্ট বীফোর

ইউ। তুমি দেখছ না প্রধান সেনাপতি তোমার সামনেই বসে আছেন। হোয়াট ডোন্ট ইউ কীপ কোয়ায়েট অ্যান্ড সীট হেয়ার ডাউন। আই হ্যাভ দি আপ্রেহে সন বিকজ অফ জিয়াউদ্দিনস ওয়ার্নিং হি মাইট ওপেন ফায়ার ফ্রম বিহাইন্ড মি বাটি ল্যাটার আই আন্ডারস্টুড হি ডিড নট কাম ফ্রম মাই বীহাইন্ড পারপাজলী।

বাট ডালিম স্যাট ডাউন অ্যান্ড দেন স্টারটেড ফাম্বালিং অ্যাড শাউটিং অরটারনেটলী ডালিম সেইড, স্যার আই নীড ইউ ভেরী মাচ। আই ওয়াজ লুকিং ফর ইউ ডেস্‌প্যারেটলী। দি রক্ষীবাহিনী ওয়াজ অ্যাবাউট টু লাঞ্চ এ কাউন্টার অফেনসিভ। সো আই উইল রিকোয়েস্ট ইউ টু লুক ইঁনটু ইট। উড প্লীজ গো টু সাভার।

তখন ডালিমের কথায়তো আর আর্মি চীফ স্যার যেতে পারেন না। তবে হাতে অস্ত্র। ওকে থামানোর জন্য এয়ার চীফ এ, কে খন্দকার বললেন, ডালিম ডোন্ট ইউ ওয়ারী ওভার দ্যাট। দি চীফ হ্যাজ অলরেডী লুকড ইন্টু দ্যাট। দি প্রোবলেম উইল বী ট্যাকলড ওয়েল। খন্দকার সাহেব বললেন, আমার এ বিষয়ে আর ভাবতে হবে না আর্মি চীফ নিজেই ব্যাপারটা দেখছেন। সমস্যার সমাধান তিনি করবেন। অলরেডী এ ব্যাপারটা দেখার জন্য তিনি ব্যবস্থা নিয়েছেন। উনি এমনি বলে দিলেন ডালিমকে শান্ত করার জন্য।

এমন সময় মেজর আমিন আহমেদ চৌধুরী (নিউ ব্রিগেডিয়ার) কেম উইথ এ রেডিও। আমার মনে হয় ডালিম তার বক্তব্য রেডিওতে রেকর্ড করে এসেছিল। রেডিওতে ডালিমের গলা। শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে এবং তার সরকারের পতন ঘটেছে। তখনই প্রথম আমি এবং অন্যরাও শুনলেন যে, দি প্রেসিডেন্ট ইজ কিল্‌ড। প্রথম আমার মনে হয় এটা একটা পাবলিসিটি টান্ট বা প্রচারণার মাধ্যমে সবাইকে হতবাক করে দেবার একটা চেষ্টা এমন সময় মেজর মাহমুদুল হাসান কনফারমড হয়ে জানালেন যে বঙ্গবন্ধু হ্যাজ বীন কিল্‌ড। তিনি চীফের রুমে টেলিফোন করলেন। চীফের নামে আমাকে টেলিফোন দেয়া হয়। তিনি আমাকে বললেন, স্যার ইউ ডু নো দি প্রেসিডেন্ট ইজ কিল্‌ড। ইট ইজ কনফারমড। তিনি তখন আমার গোয়েন্দা সংস্থায় কাজ করতেন। তাই টেলিফোন আমাকে দেয়া হয়। তিনিই আমার কাছে কনফারমড করেন। আমি বললাম, হোয়ার ওয়াজ হি কিলড তিনি কোথায় নিহত হয়েছেন? মাহমুদ সাহেব আমাকে বললেন, তার বাসায়। তিনি বললেন, প্রেসিডেন্টস নেপেউ শেক মনি অ্যান্ড ব্রাদার ইন ল অ্যান্ড মিনিস্টার আব্দুর রব সেরনিয়াবাত হ্যাজ অলসো বী কিলড।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম হু হ্যাড কিল্ড দেম? তিনি তখন কিছু নাম বললেন যারা অভ্যুত্থানকারী বলে পরিচিত সাত জনের মধ্যে আছেন। আর কয়েকটা নাম বললেন সেগুলো আমি অফ দি রেকর্ড রাখতে চাই। অন্তত এখনও তা বলা ঠিক নয়।

## ২৬. পরিশিষ্ট

### বঙ্গবন্ধু ও পরবর্তীকালে মোশতাক মন্ত্রী সভার অন্যতম মন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলীর সাক্ষাৎকার

তখন শ্লোগানের শব্দ আমাদের কানে এলো। শ্লোগানটা আস্তে আস্তে বেশ জোরদার হচ্ছে। তখন বেলা কেবল উঠেছে। আর কোথাও গোলাগুলি শোনা যাচ্ছে না। শ্লোগানটা এগিয়ে আসছে বলে মনে হলো। আমার বাসা ত্রিমোহনার কাছে (বর্তমান শেরাটন হোটেলের কাছে হেয়ার রোড যেখানে মিন্টু রোডের সাথে মিশেছে) তখন দেখলাম একটা জীপ আর দুটো ট্রাক। ট্রাকে অনেকেই শ্লোগান দিচ্ছে—নারা–এ–তকবীর আল্লাহু আকবার। এইটাই শ্লোগান ছিল। জীপটায় যে আছে সে একটা ওয়ারলেস ইউজ করেছে। তখন আমার মনে প্রশ্ন এলো, এরা কারা? ট্রাকে যাদের দেখলাম তাদের অধিকাংশই পরনে লুঙ্গি আর খাকি হাফ সার্ট কেউবা হাফ সার্ট গায়। কারো পরনে হাফ প্যান্টও ছিল। কারো গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি বিভিন্ন রকম পোশাক। ঠিক এক ধাচের নয়। তবে সবারই হাতে কোন না কোন অস্ত্র। ট্রাক আর জীপগুলি ইন্টারকনের দিকে (বর্তমানে হোটেল শেরাটন) গিয়ে আবার ফিরে এলো। জীপটা ব্যাক করে পুরাতন গণভবনের দিকে চলে গেল।

সামনে গিয়ে দরজা খুলে দেখি তখন শপথ গ্রহণ চলছে। দেখলাম সামনে অনেক অফিসার তাদের মধ্যে চিনি কেবল জিয়াউর রহমান আর শফিউল্লাহকে। অন্য কেউ চেনা থাকলেও তখন পর্যন্ত নজরে আসেনি বা আমার মনে পড়ছে না এখন।

তখন শফিউল্লাহ সাহেব আমাকে হাত ইশারা করে কাছে ডাকলেন।

প্রশ্ন : বঙ্গভবনে কোন রুমে শপথ হল?

উত্তর : এখন যেখানে ক্যাবিনেট মিটিং হয় সেই রুমে।

এরপর আমার শপথ হয়ে গেল। যখন শপথ হলো তখন মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়েছে। প্রেসিডেন্টের দুই জন এডিসিই সেই মুহূর্তে উপস্থিত। তাদের একজনকে ডেকে আমি বললাম, আমি নামাজ পড়তে যাব পাশে কোথাও। প্রেসিডেন্ট সাহেব যদি আমার খোঁজ করেন তাহলে জানাবেন। আমি উঠতে যাব এমন সময় দেখি, এডিসি সেই মুহূর্তেই প্রেসিডেন্ট সাহেবের কানে কানে বলছে,—আমার নামাজ পড়ার কথাই বলছে।

কানে কানে বলার সংগে মোশতাক সাহেব আমাকে হাত ইশারা করে বসতে বললেন। তখন তিন চার জনের শপথ গ্রহণ করানো বাকী। শপথ গ্রহণ করানোর পর আমরা নামাজ পড়লাম।

নামাজ পড়ার পর প্রেসিডেন্টের মিলিটারী সেক্রেটারী আমাদের বললেন, প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাদের সাথে কথা বলবেন। বঙ্গভবনের যে রুমে এখন প্রেসিডেন্ট সাহেবের চেয়ার সেই রুমেই মোশতাক সাহেবও বসতেন। তাঁর সীটিং এরেঞ্জমেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে। সব শপথ নেয়া মন্ত্রী সাহেবরা গেলেন। অনেক সিভিল ও ইউনিফর্ম অফিসাররা আছেন। আমরা ওখানে গেলে খন্দকার মোশতাক সাহেব কাকে যেন বললেন, একটু চা খাওয়া যাক। কোন একজন অফিসার তখন সালাম করে চলে গেলেন। তারপর দুই তিন মিনিটের সাইলেন্স। একেবারে সবাই চুপচাপ, কেউ কোন কথা বললেন না। তখন খন্দকার মোশতাক সাহেব বললেন, শফিউল্লাহ যা হবার তা হয়ে গেছে। আর যেন একটাও গুলি ছোড়া না হয়। আর যেন একফোটা রক্ত না ঝরে, অবস্থা নরমাল করার জন্য যা প্রয়োজন তা তোমরা করো। এমনি করে শুরু করে কয়েক মিনিট কথাবার্তা বললেন, এর মধ্যে চা এসে গেল। চা খেলাম। তখন উনি বললেন, আমাদের উঠতে হবে। তার আগে একটা কথা আমাদের খেয়াল নাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর বা মুজিব ভাই কিভাবে তিনি তখন সম্বোধন করেছিলেন। বললেন ওনার ডেড বডি টুঙ্গী পাড়া যাবে। আপনারা কেউ একমপানী করবেন? আমাদের কেউ কোন উত্তর দিলেন না। খন্দকার সাহেব কয়েক মিনিট চুপচাপ ছিলেন আমাদের উত্তরের প্রতীক্ষায়। আমাদের কেউ প্রশ্ন করেননি ঢাকায় দাফন হবে না কেন—কেউ বলেননি আমরা কেউ সংগে যাব। অতঃপর তিনি কাকে যেন ডেকে বললেন, টুঙ্গিপাড়ায় লাশ পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।

বেরিয়ে যাবার আগে বললেন—আপনাদের যার যা পোর্টফলিও ছিল আপাততঃ সেটাই থাকবে। যে যে বাড়িতে আছেন সে সেই বাড়িতেই থাকবেন। আপনারা অফিস করতে থাকুন। পরে দেখা যাবে কি করা যায়।

পরে জানতে পারলাম বঙ্গবন্ধুর বাসার কথা, সেরনিয়াবাতের কথা, শেখ মনির কথা।

প্রশ্ন : খন্দকার মোশতাক সাহেব কখনও ১৫ই আগস্ট ঘটনাবলির কোন ব্যাখ্যা দেননি?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনারা কখনো জিজ্ঞাসা করেননি?

উত্তর : খন্দকার সাহেবের বক্তব্য হলো ঃ ১৫ই আগস্ট সকালে এসে আমাকে নিয়ে গেছে। দেশকে রক্ষার জন্য তিনি সেই সময় বিপদ এবং বদনাম আসবে জেনেও রাজী হয়েছেন। আল্লাই সবকিছুই জানেন।

তবে হেনা ভাই (মন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান) আমাকে জানান বঙ্গবন্ধু

হত্যার আগে হেনা ভাইয়ের তিন নম্বর রোডের (ধানমণ্ডি) বাসায় ডালিম তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। ডালিম তাঁকে ডেকেছে। হেনা ভাই নামেননি। হেনা ভাই বললেন, ডালিম আমার সাথে আগেও যোগাযোগ করেছিল এবং প্রস্তাবও নিয়ে এসেছিল। তাই জানতাম, সে কি কথা বলতে এসেছিল। তাই দরজা খুলিনি। হেনা ভাই আমাকে বললেন, ডালিমরা জানিয়েছিল এ রকম একটা ঘটনা ঘটবে। বঙ্গবন্ধুকে খুন করা হবে তা বলেনি—তবে তাকে বাসা থেকে নিয়ে যাবে এবং আবার হেনা ভাইয়ের নেতৃত্বে পাওয়ার নেয়া হবে। হেনা ভাই আমাকে বললেন, আমি তাতে তখন রাজী হইনি। ১৪ই আগস্ট তারিখে তাই নিচে নামিনি। ডালিম পরে গালাগালি করে যায়। ১৩ কিংবা ১৪ই আগস্ট ১৯৭৫ তারিখেই সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের বাসায় যাই। উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট পুরাতন গণভবনে থাকেন। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। আমি দেখি উনি পাঞ্জাবী পরে পায়চারী করছেন। সালাম দিলাম। কোন উত্তর দিলেন না। খুব গম্ভীর। উনিতো এমনি একটু কম শুনতেন। নজরুল ভাইয়ের বাসায় প্রায় ডেইলী যেতাম। তখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ছিল রোজ বিকেলে গণভবনে গিয়ে ৪৫ মিনিট তাকে নিয়ে পায়চারী করতে হবে। সেখানেও যেতাম। শেষের দিকে তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটা মনে হয় ১৩ তারিখ দিনগত রাত্রে।

চৌদ্দ তারিখ তো-ওনার সংগে আমার দেখা হয়নি। উনি গম্ভীর হয়ে চুপচাপ করে পায়চারী করছেন। আমিও উনার সংগে পায়চারী করছি। কোন কথা বললেন না। কিছুক্ষণ পর উনি আমাকে বেশ একটু উত্তেজিত স্বরে বললেন, ভাবছেন কী? নজরুল ইসলাম সাহেবকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করতাম। বঙ্গবন্ধুও ওনাকে স্যার বলতেন। আপনি করে কথা বলতেন ওনার সংগে। মোশতাক, তাজউদ্দিন, কামরুজ্জামান বা মনসুর আলী সাহেবদের বঙ্গবন্ধু তুমি করে বলতেন, কিন্তু সৈয়দ সাহেবকে তিনি আপনি করে বলতেন, আমরাও স্যার বলতাম।

তিনি খুব লার্নেড লোক ছিলেন, কিন্তু শেষ দিকে খুব মন খারাপ করে অভিমান করে থাকতেন। তার কারণ আর একদিন সময় করে বলব। যখনই তিনি দেখলেন বঙ্গবন্ধু কারও প্রভাবে এমন একটা পথে গেছেন, যে পথ আমাদের কারও জন্য ভাল বা কল্যাণ বয়ে আনবে না, তখনই তিনি অভিমান করে দূরে সরে থাকতেন। সেটা আরও খারাপ হলো আমাদের জন্য। বঙ্গবন্ধুর অন্তরের বন্ধু প্রকৃত পক্ষে সৈয়দ সাহেব ছিলেন। সৈয়দ নজরুল সাহেব কি ভাবছেন? কি করছেন? প্রশ্নের জবাবে বললাম, স্যার কি হয়েছে?

তিনি বললেন, কী হতে বাকি আছে? আমাদের পায়ের তলায় মাটি নেই—নিজেদের ঘর সামলাতে পার না, আমরা আবার কথা বলি। তখন বুঝলাম, উনি তো খুব রেগে আছেন। কারণ জানি না। চিন্তা করার জন্য বললাম, স্যার উপরে চলুন চা খাব। উপরে গেলাম। দুই জনে উপরে এক ঘরে বসলাম। এই দেখেন

আমি আপনকে বলি নাই আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। দিনের পর দিন কি হচ্ছে। কেউ কথা শোনে না আমার, কারও কথা শোনে না। এখন কি অবস্থা হবে?

আমি বললাম কি হয়েছে? কী হবে?

নজরুল সাহেব বললেন, পায়ের তলায় মাটি আছে? আমি বললাম, স্যার কার কথা বলছেন আপনি? সৈয়দ সাহেব বললেন, কার আবার? বঙ্গবন্ধুর কথা বলছেন। আমি বললাম কেন? কি হয়েছে? বললেন, যা দেখছি এতো ভালো মনে হচ্ছে না। আমার কাছে লোক আসছিল আমার কাছে পাওয়ার দেবার প্রস্তাব নিয়ে আসছিল। কেন? কামরুজ্জামান হেনা সাহেবও ঐ দিনই আমাকে বলেছিলেন আজও উনি আমাদেন নেতা। ওনাকে দিয়ে চলবে না। ক্ষমতা আমাকে নিতে হবে এটা কেমন কথা। উনিতো আমার সংগে আলাপ করতে চান না।

আমি বললাম, আপনি ৩২ নম্বর যান সেখানে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলেন। দেখেন কী করতে পারেন।

সৈয়দ সাহেব বললেন, না তিনি যখন সব কথা খুলে বলতে চান না, তখন আর কী করব।

তখন আমি বললাম, তাহলেতো চলবে না। আপনার জন্য আপনি না যান, দেশের জন্য, আমাদের জন্য যান। আজকে যাবেন। তিনি বললেন, না।

তারপর ঠিক হলো পরদিন উনি যাবেন। সে সুযোগ মনে হয় আর হয়নি। হেনা ভাই আর সৈয়দ সাহেবের কথা মনে হয় খন্দকার মোশতাক সাহেব ছাড়াও অন্য যে কাউকে দিয়ে তারা টেকওভার করে ফেলতো।

## ২৭. পরিশিষ্ট

## ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট প্রসঙ্গে তৎকালীন ঢাকা ব্রিগেড কমান্ড কর্ণেল (অবঃ) শাফায়াত জামিলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার–আলাপচারিতা

প্রশ্ন : আপনি বোধ হয় জানেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক এ্যান্থনী মাসক্যারেনহাস 'বাংলাদেশ : এ লিগেসী অব ব্লাড' শীর্ষক একটি বই লিখেছেন। সে বইতে আপনার ভূমিকা বেশ গুরুত্ব পেয়েছে এবং কিছু বিতর্কিত কথাও সেখানে রয়েছে। উক্ত বইয়ের (পৃ. ৫৬) লে. কর্নেল রশীদের জবানীতে বলা হয়েছে ভারতের গানারী স্টাফ কোর্স সমাপ্ত করে আসার পর স্বভাবতই তাকে যশোরের গানারী স্কুলে পোস্টিং করা হয়, কিন্তু রশীদ উক্ত কর্মস্থলে যোগদান না করে ঢাকায় থাকার চেষ্টা চালায়। এরই এক পর্যায়ে সে দাবি করেছে আপনার সংগে দেখা করেছে এবং সে সাক্ষাতের বদৌলতে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় এবং তার পূর্বের পোস্টিং বাতিল হয় এবং ঢাকায় তাকে নতুনভাবে পোস্টিং করা হয় এবং ১৯৭৫ সনের এপ্রিল মাসে সে সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারীর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। লেঃ কর্নেল রশিদের এই বক্তব্য সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে কি?

উত্তর : শাফায়াত জামিল, আব্দুর রশিদ নামে সামরিক এই অফিসারটি মুক্তিযুদ্ধের শেষ পাদে; অর্থাৎ অক্টোবরে এসে যোগদান করে, নভেম্বরে তার কথা জানতে পারি।

দেশ স্বাধীন হবার পর কক্সবাজার ও রংপুরে আমি কর্মরত ছিলাম। রশিদের সংগে আমার কোন সাক্ষাৎ ঘটেনি। ভারত থেকে প্রশিক্ষণ শেষে রশিদ ঢাকায় আসে। চীফ অব স্টাফের অধীনে মিলিটারী সেক্রেটারী ব্রাঞ্চের এক অর্ডারে আমি দেখতে পেলাম তাকে যশোহরে পোস্টিং করা হয়েছে। তখন মিলিটারী সেক্রেটারী ছিলেন এ. এস. এম নাসিম। ১৫ থেকে ২০ দিন পর দেখলাম রশিদের ঐ পূর্বের পোস্টিং ক্যান্সেল করা হয়েছে।

পোস্টিং অর্ডার করার দায়িত্ব ছিল চিফ অফ স্টাফ জনাব শফিউল্লাহর। তার অধীনে সাধারণত মিলিটারী সেক্রেটারী এ সব কাজ করে থাকেন।

রশিদের যশোরের পোস্টিং ক্যান্সেল করার ব্যাপারে আমার কিছুই জানা নেই– করণীয় কিছু ছিল না—রশিদ যা বলছে তা মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ঢাকা ব্রিগেডের কমান্ডার হিসেবে আমার অধীনে ফাস্ট বেঙ্গল, সেকেন্ড বেঙ্গল, ফোর্থ বেঙ্গল, সিক্সটিন বেঙ্গল, সেকেন্ড ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডার অফিসারদের দেখা প্রায় প্রতিদিনই হতো। সি, ও হিসেবে রশিদের সংগে দেখা হত। আর১০/১২ জন ও, সি, ছিলেন তাদের সংগেও সাক্ষাৎ হত। তবে রশিদ যেভাবে সাক্ষাতের কথা বলেছে তা একেবারেই মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। উদ্দেশ্য প্রণোদিত কেন তা পরে বলছি।

এ প্রসংগে আমি অত্যন্ত গুরুত্ব ও জোরের সংগে উল্লেখ করতে চাই, রশিদের যশোরের পোস্টিং কেন চিফ অব স্টাফ শফিউল্লাহ সাহেব ক্যান্সেল করেছিলেন—এ ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হওয়া উচিত। কেননা এই ঘটনাটি বঙ্গবন্ধুর হত্যার সংগে অবশ্যই সম্পর্কিত। জনাব শফিউল্লাহ কেন অথবা কোন্ উর্ধ্বতন ব্যক্তির নির্দেশে অথবা চাপের মুখে রশিদকে ঢাকায় রেখেছিলেন আজ তা প্রকাশ হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : ১৫ই আগস্ট সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন?

উত্তর : শাফায়াত জামিল, ১৪ই আগস্ট রাত বারোটার সময় তদানীন্তন চিফ অব লজিস্টিক ব্রিগেডিয়ার সি, আর দত্ত আমাকে নিয়ে সি, এম এইচ– এ গেলেন। সেখানে দুর্ঘটনাকবলিত ভারতীয় হেলিকপ্টারের ক্রুদের ছিন্নভিন্ন লাশগুলো ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছিল। এ সব ছিন্নভিন্ন লাশের গন্ধে আমি বমি করতে থাকি। অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং রাত দুটোয় বাসায় এসে ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়ি।

সকাল ৬–১০ মিনিটে হন্তদন্ত হয়ে রশিদ আমার ঘরে ঢুকে বলে, উই হ্যাভ কিলড্ শেখ মুজিব—এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠে। আমি টেলিফোন ধরতে শফিউল্লাহ সাহেবের কান্নাভেজা বিমর্ষ কণ্ঠ শুনতে পেলাম। তিনি বললেন, বঙ্গবন্ধু আমাকে বিশ্বাস করলেন না– বিশ্বাস করলেন না; টেলিফোনে তার ধরা গলা শুনতে পারলাম। শফিউল্লাহ সাহেব আমাকে কোন অর্ডার করলেন না– অথবা তৈরি হতে বা প্রতিহত করতে হবে– এমন কিছুই বললেন না।

আমার বাসা থেকে ডেপুটি চিফ জিয়াউর রহমান সাহেবের বাসা প্রায় ১০০ গজের দূরত্ব। আমি জিয়াউর রহমান সাহেবের বাসায় গেলাম। ডাকাডাকি করলাম। তিনি বেরিয়ে এলেন। অর্ধেক শেভ। শফিউল্লাহ সাহেবের কথা বললাম। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বললেন, সো হোয়াট। প্রেসিডেন্ট নেই, ভাইস প্রেসিডেন্টতো আছেন—ইউ এলার্ট ইয়োর ট্রুপস।

ফার্স্ট বেঙ্গলে গেলাম। তাদের অর্গানাইজ করলাম ৮–৩০ মিনিটের দিকে চিফ শফিউল্লাহ, ডেপুটি চিফ জিয়াউর রহমান, বিমান বাহিনীর প্রধান খন্দকার, নৌ-বাহিনীর প্রধান, এম এইচ খাঁন এলেন।

আমি তখন ফার্স্ট বেঙ্গলে।

এদের সঙ্গে ডালিম ছিল।

ডালিমের সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হল, বলতে পারেন ভালো রকম ঝগড়া হয়ে গেল। আমাকে কিছুই বলা হল না। তারা চলে গেলেন।

পরে দেখলাম সবাই খন্দকার মোশতাককে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেনে নিয়ে আনুগত্যের শপথ নিল। ঐ সময়ই সংবাদ পেলাম কুমিল্লা থেকে কিছু ট্রুপস আসছে তারা নাকি ডালিমের লোক। আমি কর্নেল আমজাদের সঙ্গে কথা বলি এ বিষয়ে। তিনি ট্রুপসদের কন্ট্রোল করেন।

সারাদিন রেডি থাকলাম। এই জঘন্য বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রস্তুত থাকলাম। এ সময় হতেই খালেদ মোশাররফ ফার্স্ট বেঙ্গলে থাকতে শুরু করেন। আমার বুঝতে বাকি রইল না বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্য দিয়ে কি ঘটে গেল। মোশতাককে প্রেসিডেন্ট পদে দেখে বুঝতে বাকি রইল না তারা দেশটাকে প্রি-৭১–এর অবস্থায় নিয়ে যেতে চাচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকেই মোশতাককে জানতাম।

প্রশ্ন : পরবর্তী কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছু থাকলে অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

উত্তর : শাফায়াত জামিল, দেখুন তারিখটা মনে নেই। তবে বঙ্গবন্ধু হত্যার এক সপ্তাহের মধ্যেই হবে। আমাদের বলা হল ১৫ই আগস্ট কেন সংঘটিত হল এ সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের পক্ষে আমাদের ব্রীফ দেয়া হবে।

সেনাসদর দপ্তর।

সকাল ১০টা।

সেনাবাহিনী চিফ জেনারেল শফিউল্লাহ, ডেপুটি চিফ জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ, লেঃ কর্নেল নূরুদ্দিন (তখন ডি, এম, ও) কর্নেল মঈনুল হোসেনসহ ঢাকার উপস্থিত সিনিয়র অফিসারবৃন্দ ঐ মিটিং-এ উপস্থিত। আমিও ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে সেখানে আছি। দেখলাম, রশিদ ও ফারুক এলো।

প্রেসিডেন্ট মোশতাকের পক্ষে তারা আমাদের ব্রীফ দেয়ার জন্য এসেছে। রশিদ কথা বলা শুরু করে। দেশে অরাজকতা, বিশৃংখলতা, অর্থনৈতিক ধ্বংসোন্মুখ ইত্যাদি বলার পর সে বলল, শেখ মুজিবকে উৎখাতের বিষয়টি এখানে উপস্থিত সিনিয়র অফিসারদের নিকট পূর্বেই জানানো হয়েছিল। এ কথা বলার সাথে সাথে আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম। বললাম, বঙ্গবন্ধুকে উৎখাত করা হবে এ কথা কবে কাকে কখন জানানো হয়েছে তা আমার জানা নেই। তবে এটা আমার সম্পূর্ণ অজানা।

আমি বললাম, মোশতাক আমার প্রেসিডেন্ট নয়, হি ইজ এ মার্ডারার। আমি প্রথম সুযোগেই তাকে ওভার থ্রো করব। তোমাদের অন্যায় বিদ্রোহ ও জঘন্য কর্মকাণ্ডের জন্য তোমাদের কোর্ট মার্শাল হবে। তোমরা মনে করেছ—ইউ আর ডেস্‌পারেট—বাট দেয়ার আর ডেসপারেট পিপ্‌ল ইন দ্য আর্মি হু উইল ওভার থ্রো ইউ।

এ কথায় রশিদ স্তম্ভিত হয়ে যায়।

আমি বললাম, তোমরা সেনাবাহিনীর চেইন ইন কমান্ড ব্রেক করেছো, শৃঙ্খলা ভেঙ্গেছো এবং সাংবিধানিক আনুগত্য বিনষ্ট করেছো।

প্রশ্ন : আজকাল বঙ্গবন্ধুর অন্যতম হত্যাকারী ফারুক রহমানকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেখানো হচ্ছে। আপনার অভিমত কি?

উত্তর : শাফায়াত জামিল, প্রকৃত প্রস্তাবে ফারুক মুক্তিযোদ্ধা নয়। সে জন্য মুক্তিযোদ্ধারে প্রদত্ত ২ বছরের সিনিয়ারিটি সে পায়নি। এ সময়ে আর্মিতে নিয়ম ছিল ২১শে নভেম্বরের আগে যে সকল সামরিক অফিসার মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল কেবল তারাই দুই বছরের সিনিয়ারিটি পাবে। সে হিসেবে ফারুক সিনিয়ারিটি পায়নি।

প্রশ্ন : সম্প্রতি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের অন্যতম লেঃ কর্নেল শাহরিয়ার বলেছে যে ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি ঐ সময় ঢাকায় সকল উর্ধ্বতন সামরিক অফিসারবৃন্দ জানত। এমনকি ঢাকার ৪৬তম ব্রিগেড কমান্ডারের সংগে আলাপ করে ১৫ই আগস্ট সংঘটিত হয়েছিল? এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর : শাফায়াত জামিল, দেখুন এ ব্যাপারে এ পত্রিকায় আমি একটি প্রতিবাদ পাঠিয়েছি। [তিনি বিবৃতির একটি কপি প্রদান করেন] বিবৃতি নিম্নরূপ

জনাব সম্পাদক সাহেব,

সাপ্তাহিক মেঘনা।

৪ এবং ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত লেঃ কর্নেল (অবঃ) শাহরিয়ারের সাক্ষাতকারটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। এই নিবন্ধে আমার নাম বেশ কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। আমার সম্পর্কে বেশ কিছু অসত্য কাহিনীর অবতারণা করেছেন তিনি।

শাহরিয়ার কিছুদিন আমার অধীনে রংপুরে চাকুরী করেছেন ১৯৭৬ সালে। সম্ভবত ১৯৭৪ সালে অবসর নেন স্বাস্থ্যগত কারণে কুমিল্লায় থাকাকালীন। ৭৩ সাল হতে ৭৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তার সাথে আমার কোন সাক্ষাৎই হয় নাই। এই দীর্ঘ দুই বছর তার সাথে আমার কোন যোগাযোগও ছিল না। এই সময়কাল আমি তাকে দেখিওনি। সুতরাং ৭৫ সালের ১২ আগস্ট তারিখে আমার সাথে আলাপ করার কথা একেবারেই বানোয়াট, মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, দুরভিসন্ধিমূলক এবং বিভ্রান্তিকর। আমি এই উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা বানোয়াট প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ জানাই। ফিল্টার টিপ্‌ড সিগারেট নিয়ে আমার সাথে বর্ণিত বাক্যালাপটি একেবারেই বাল্যসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় হেতু মন্তব্য নিষ্প্রোয়োজন।

১৫ই আগস্টের বিদ্রোহ এবং হত্যাকাণ্ড আমি এবং তৎকালীন সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলাপরায়ণ, বিবেকবান অফিসারেরা কেউই মেনে নিতে পারেনি। ১৫ই আগস্ট

যারা সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ করিয়ে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেছেন তাদেরকে প্রথম সাক্ষাতেই আমি আমার মনোভাব খোলাখুলিভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলাম সেনাসদর দপ্তরে তৎকালীন সেনা প্রধান ও অন্যান্য সিনিয়র অফিসারদের উপস্থিতিতেই। আমি ষড়যন্ত্রে কখনও বিশ্বাসী নই, অতীতে যখন যা করেছি নিঃশঙ্ক চিত্তে, উন্নতশিরে খোলাখুলিভাবে বলে কয়েই করেছি।

আমি একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, দেশ ও জাতি আমার কাছে অনেক বড়। তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেকেই জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির পথে সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়ার কারণে আন্তর্জাতিক শক্তির বিরাগভাজন হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুও সেই একই পথের পথিক। তিনি জীবন দিয়ে দেশবাসীর ভালবাসার ঋণ পরিশোধ করে গিয়েছেন। শাহরিয়ার এবং তার সহযোগীরা যদি মনে করে থাকেন তারা ইতিহাস বিকৃত করতে এবং বঙ্গবন্ধুকে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব রূপে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হবেন, তাহলে তাঁরা অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করছেন।

সত্য শাশ্বত এবং চিরন্তন। অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ হবে না। ইতিহাস নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধুর যথার্থ মূল্যায়ন করে পরম শ্রদ্ধার আসনটি দেবে ভবিষ্যতে। লেঃ কর্নেল শাহরিয়ার ও তার সহযোগীরা তাদের কৃতকর্মের যথার্থ বিচারের অপেক্ষায় থাকতে পারেন।

ধন্যবাদান্ত
কর্নেল শারফাত জামিল (অব.) বীরবিক্রম
১৫/এ পুরানা পল্টন
ঢাকা–২, বাংলাদেশ

## ২৮. পরিশিষ্ট

## তদানীন্তন সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহর সাক্ষাৎকার ঃ

### পনেরই আগস্টের অভ্যুত্থান সম্পর্কে জিয়াউর রহমান সবই জানতেন

মেজর জেনারেল কে, এম, সফিউল্লাহ বর্তমানে বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি এস ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তিনিই হয়েছিলেন এ দেশের প্রথম সেনাধিনায়ক। ১৯৭৫–এ শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হবার সময় তিনি ছিলেন সেনাপতি।

মহিবুল : আপনাকে কেন চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত করা হলো?

কে, এম, সফিউল্লাহ : তা আমি বলতে পারবো না। তবে আমাকে যেদিন নাকি জেনারেল ওসমানী দায়িত্বভার নেয়ার জন্য ডেকেছিলেন সেদিন আমি বলেছিলাম, "আমি কেন? অন্যরা কোথায়?" তখন তিনি আমাকে বললেন, "অন্যরা কারা?" আমি বললাম, কর্নেল রেজা কোথায়? তিনি বললেন, "কর্নেল রেজা রিজাইন করেছে"। তারপর বললাম দত্তর কথা। তিনি বললেন "ডু ইউ থিংক হি ইজ কেপেবল?" এর কোন উত্তর না দিয়ে আমি জিয়ার কথা বললাম। তখন উনি রেগে গিয়ে আমাকে বললেন, "ইউ আর আরগুইং। গেট আউট ফ্রম মাই অফিস"। আমি তখন অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে জেনারেল রবের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করি। তখন তিনি আমাকে বললেন, "এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। ওসমানী সাহেবের কোন সিদ্ধান্ত নয়।" তখন আমি বললাম, তিনিতো নিজেও থাকতে পারেন। জেনারেল রব বললেন, ৭ই এপ্রিল ওসমানী সাহেব সামরিক বাহিনী ছেড়ে জাতীয় সংসদে যোগ দিচ্ছেন।

মহিবুল : আপনি কতদিন পর্যন্ত এই দায়িত্বে ছিলেন?

কে, এম, সফিউল্লাহ : ২৪শে আগস্ট ১৯৭৫ পর্যন্ত।

মহিবুল : আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক নাকি ততটা ভাল ছিল না। ঐ সরকারের নাকি সামরিক বাহিনীর উপর তেমন আস্থা ছিল না, কথাটা কি সত্যি বলে আপনি মনে করেন?

কে, এম, সফিউল্লাহ : আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর

আস্থা ছিল, কিন্তু পুরো সামরিক বাহিনীর উপর তাদের আস্থা ছিল কিনা তাতে সন্দেহ আছে।

মহিবুল : রক্ষীবাহিনী কেন গঠন করা হয়?

কে, এম, সফিউল্লাহ : তা আওয়ামী লীগ সরকারই বলতে পারবেন।

মহিবুল : রক্ষীবাহিনী গঠন করার আগে আওয়ামী লীগ সরকার এ ব্যাপারে কি আপনাদের সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা করেছিলেন?

কে, এম, সফিউল্লাহ : না। তবে গঠন করার পরবর্তীতে আমাকে বলা হয়েছিল যে, রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছে পুলিশ বাহিনীর সহযোগী শক্তি হিসেবে। তাহলে আর আর্ম ফোর্সকে খোলাখুলি ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না। যেখানে পুলিশ দুর্বল সেখানে রক্ষীবাহিনীর সহযোগিতা থাকবে। তবে লোকমুখে আমি শুনেছি যে রক্ষীবাহিনী গঠন করা হচ্ছে আর্ম ফোর্সের জায়গা পূরণের জন্য, কিন্তু এ সকল কথার কোন বাস্তবতা ছিল বলে আমি মনে করি না।

মহিবুল : সামরিক বহিনীর সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর সম্পর্ক কেমন ছিল?

কে, এম, সফিউল্লাহ : সম্পর্ক ভাল ছিল না। তার কতকগুলো কারণ ছিল। তখন গুজব বেরিয়েছিল যে, রক্ষীবাহিনীকে আর্মির জায়গায় বসানো হবে। নতুন বাহিনী হিসেবে রক্ষীবাহিনীকে তখন সব কিছুই নতুন জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো হচ্ছিল। এদিকে আর্মি দেখছে তাদের সেই পুরান অবস্থা। এগুলো দেখে আর্ম ফোর্সের অনেকের মনে আঘাত লাগে এবং এই ব্যাপারগুলোকে কিছু লোক বড় করে তুলে ধরে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। যার ফলে সম্পর্কটা খারাপ রূপ নেয়। তবে এ ব্যাপারে একটা ভুল আমার মনে হয় সরকার করেছিলেন তাহলো রক্ষীবাহিনীকে "পাওয়ার অফ এরেস্ট এন্ড সার্স" দেয়া। এতে সামরিক বাহিনীর অনেকে ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হন এবং শুধু তাই নয় রক্ষীবাহিনী এই সময় সেনাবাহিনীর অনেক অফিসারকে লাঞ্ছনা পর্যন্ত করে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল রক্ষীবাহিনীর ক্ষমতা সেনাবাহিনীর থেকেও বেশি।

মহিবুল : শেখ মুজিবর রহমান সামরিক বাহিনীর উন্নতির পক্ষে ছিলেন না এ কথা কি সত্য?

কে, এম, সফিউল্লা : হ্যাঁ আমি বলবো এ কথা সত্য। আমি এক সময় পাঁচ ডিভিশন সেনাবাহিনীর একটি পরিকল্পনা উনার কাছে অনুমোদনের জন্য দিয়েছিলাম, কিন্তু শেখ মুজিব কেন তা গ্রহণ করলেন না তা বলতে পারি না। আমি যখন আমার পরিকল্পনা দেই তখন প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারী রুহুল কুদ্দুস তা গ্রহণ করেন। শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের অপেক্ষায় তা থাকে। পরদিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করলে তিনি আমাকে বললেন, "এই মুহূর্তে এদিকে নয়" আমি যতটুকু জানি যে, আমার এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধীদের মধ্যে একজন ছিলেন জিয়াউর রহমান।

মহিবুল : আপনি বাকশালে যোগদান করেছিলেন?

কে, এম, সফিউল্লাহ : বাকশালে আমাকে যোগদান করার জন্য বলা হয়নি। তবে আমি আমার নাম খবরের কাগজে দেখি। আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই আমার নাম প্রকাশ করা হয়।

মহিবুল : গাজী গোলাম মোস্তফা ও মেজর ডালিমের সঙ্গে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেজর ডালিম বঙ্গবন্ধুর উপর মনঃক্ষুণ্ন হন। এ ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন?

কে, এম, সফিউল্লাহ : আমি এতটুকু জানি যে মেজর ডালিম তার বউ নিয়ে এক বিয়েতে যায়। সেখানে তার বউকে নাকি অপমান করা হয় এবং তুলে নেয়ার চেষ্টাও করা হয়। এখানে গাজী গোলাম মোস্তফা ডালিমকে বেশ অপমানও নাকি করেন।

মহিবুল : মেজর ডালিমের সাথে এই ঘটনার পর সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ হিসেবে কি কোন কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন?

কে, এম, সফিউল্লাহ : যখন গোলমালের খবর আমি জানতে পারি তখন ডালিমের পক্ষ হয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে যাই এর একটা বিচারের জন্য। বঙ্গবন্ধু আমার উপর রেগে গেলেন। তখন আমি বললাম, "বঙ্গবন্ধু আমি যদি আমার অফিসারদের জন্য না বলি তাহলে কে বলবে? গাজী গোলাম মোস্তফার এই ঘটনা আপনি অনুসন্ধানের মাধ্যমে তদন্ত করে দেখুন। আপনি যদি এই ব্যাপারে সাহায্য চান তাহলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।" যেহেতু ওরা গাজীর বিরুদ্ধে এবং আমিও তাদের পক্ষে তাই গাজীরই বিরুদ্ধে বলেছি। তাই তিনি খুব খুশি হননি। তিনি শুধু বললেন, "সফিউল্লাহ আপনি জানেন কি যে, আপনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলছেন" (ইংরেজি ভাষায়) আমি বললাম, "আমি জানি স্যার। আমি আমার জন্য কথা বলছি না, আমি কথা বলছি আপনার জন্য স্যার। মানুষ আপনাকে আসল সত্য বলেনি।" ঐ সময় জিয়া ও সাফায়াত জামিলও ঐখানে ছিলেন।

মহিবুল : তারপর কি হলো?

কে, এম, সফিউল্লাহ : তারপর আমরা ওখান থেকে কোন বিচার না পেয়ে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে চলে আসি। পরে দেখা গেল সরকার মেজর ডালিমকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করলেন।

মহিবুল : ১৫ই আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের সময় আপনি কি করেছিলেন এবং কোথায় ছিলেন?

কে, এম, সফিউল্লাহ : ১৫ই আগস্টের কথা বলতে গেলে আমাকে আগে দুই একটা কথা বলতে হয়। ১৫ই আগস্ট সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ঢাকা বিশ্ববিদালয়ে যাওয়ার কথা ছিল এবং উনার অনুষ্ঠানের জন্য যে মঞ্চ হয় সেখানে ১৪ আগস্ট কিছু বিস্ফোরণ ঘটে। এ ব্যাপারে আমার কাছে সাহায্য চাইলে আমি

কিছু লোক পাঠাই। ঐ দিন আরেকটা ঘটনা ঘটে। ইন্ডিয়ান আর্মির একটি হেলিকপ্টার (আমাদের ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়েছিল) যা নাকি চিটাগাং ডিভিশনে ছিল সেটা নরমালি সার্ভিসের জন্য কলকাতা যাচ্ছিল। ঐ হেলিকপ্টার যখন যাচ্ছিল তখন নোয়াখালীর উপর কয়েকটা পাখির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হয়। তাই ঐখানকার লোকদের নিয়েও আমরা ব্যস্ত ছিলাম। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গণ্ডগোল অন্যদিকে নোয়াখালীতে দুর্ঘটনা। তবে ঐ সময় কখনো ভাবতে পারিনি যে এমন ধরনের একটা কিছু হতে যাচ্ছে। কিন্তু ১৫ই আগস্ট সকাল ৫–৩০ মিনিটের দিকে আমার ডি, এন, আই, সালাউদ্দিন আমার কাছে এসে বললেন, "স্যার আপনি কি ট্যাঙ্ক ও আর্টিলারীকে শহরে মুভ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন?" আমি বললাম না। তখন তিনি বললেন, "কিন্তু তারা ইতিমধ্যে রেডিও স্টেশন ও শেখ মুজিবের বাসভবন–এর দিকে অগ্রসর হয়েছে।" আমি বললাম, "স্টপ দেম, শাফায়াত জামিল কোথায়?" তিনি কি ঘরে? এই বলে আমি সাথে সাথে ফোন করি শাফায়াত জামিলকে। কারণ তিনি ছিলেন ঢাকার বিগ্রেড কমান্ডার। তাকে বললাম, "আপনি কি জানেন কি হচ্ছে? তিনি বললেন কি ব্যাপার স্যার?" আমি বললাম, "আর্টিলারী নাকি মুভ করেছে।" তিনি বললেন, "আমি জানি না স্যার?" আমি বললাম, "আপনি যখন জানেন না তখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একে বন্ধ করুন। ফার্স্ট, সেকেন্ড এবং ফোর্থ বেঙ্গলকে যাওয়ার জন্য বলুন।" তারপর আমি বঙ্গবন্ধুকে ফোন করি। উনার টেলিফোন এনগেজ পাই। এই সময় আমি নাভাল চিফ খান ও এয়ার চিফ খন্দকার (বর্তমানে মন্ত্রী) সাহেবের সঙ্গে কথা বলি। উনারা এই ব্যাপারে কিছুই জানেন না বললেন। তারপর জিয়াকে ফোন করি। "আপনি জানেন কি কিছু?" তিনি আমার কথা শুনে বললেন, "তাই নাকি?" আমি উনাকে আমার এখানে আসার জন্য বললাম। এর পরই আমি খালেদ মোশাররফকে ফোন করাতে তিনি বললেন, তিনিও কিছু জানেন না। এই সময় আমি আবার শাফায়েত জামিলকে ফোন করলাম, কিন্তু কোন জবাব পাইনি। এমন করতে করতে বেশ কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে টেলিফোন লাইন পাই। তিনি আমাকে বললেন, "সফিউল্লাহ, আমার বাড়ি আক্রমণ করেছে কামালকে মনে হয় মেরেই ফেলেছে। তুমি ফোর্স পাঠাও।" আমি তখন উনাকে শুধু এতটুকুই বলতে পেরেছি "স্যার ক্যান উই গেট আউট, আই এ্যাম ডুইঙ সামথিং।" বাস তখন শুনতে পেলাম টেলিফোনে গুলির আওয়াজ। আর এটাই ছিল উনার সঙ্গে আমার শেষ কথা।

মহিবুল : তারপর কি হলো?

কে, এম, সফিউল্লাহ : পরে আমি রেডিও স্টেশনে গিয়ে দেখি ঘরের ডান দিকে একটি চেয়ারে খন্দকার মোস্তাক আহমদ বসা এবং তার সামনে একটা মইক্রোফোন। উনার বামপার্শ্বে দাঁড়ানো তাহেরউদ্দিন ঠাকুর। আমি ঢুকতেই তিনি আমাকে বললেন, "সফিউল্লাহ, কনগ্র্যাচুলেশন, ইওর টুপ হ্যাজ ডান ওয়ান্ডারফুল

যব্ এ্যান্ড ডু দ্যা রেস্ট।" আমি বললাম হোয়াট রেস্ট। ইন দ্যাট কেইস লিভ ইট টু মি।" তিনি তখন বললেন, "উই সুড নো ইট বেটার।" এই সময় যখন আমি বের হয়ে আসছিলাম তখন তাহেরউদ্দিন ঠাকুর বললেন, "স্যার উনাকে দিয়ে রেডিওতে একটা ঘোষণা করাতে হবে।" পরে আমরা তিন প্রধান একটি লিখিত ঘোষণা রেডিওতে বলি। পরবর্তীতে আমার চাকরি সামরিক বাহিনী থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হয়।*

* সাক্ষাৎকার প্রয়োজনীয় অংশই এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঁচ মিশালীর জন্য সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিলেন মহিবুল ইজদানী খান।

## ২৯. পরিশিষ্ট

## পনেরই আগস্ট কোনো সামরিক অভ্যুত্থান হয়নি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একজন মহান দেশপ্রেমিক মেজর জেনরেল কে, এম, শফিউল্লাহ্

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অফ আর্মি স্টাফ, পরবর্তীকালে রাষ্ট্রদূত, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল কে, এম, শফিউল্লাহ বীরউত্তম বলেন, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানক হত্যা ও অন্যান্য ঘটনাবলি সামরিক অভ্যুত্থান ছিল না, তা ছিল সেনাবাহিনীর ভেতরের ও বাইরের একটি ছোট গ্রুপের একটি সন্ত্রাসী কাজ। তবে স্বীয় দায়িত্ব পালন সম্পর্কে তৎকালীন পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে তিনি বেদনার সঙ্গে স্মরণ করেন যে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনে ব্যারাকে আনন্দ প্রকাশ করতে দেখে তিনি হতাশ ও একাকী হয়ে পড়েছিলেন।

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার জেনারেল শফিউল্লাহর বাসভবনে ভোরের কাগজ-এর জন্য দীর্ঘ এক একান্ত সাক্ষাৎকারে ঐ সময় সামরিক বাহিনীর অবস্থা, রক্ষীবাহিনী, ১৫ আগস্টের ঘটনা, অব্যবহিত পরের পরিস্থিতি, নিজের ভূমিকা, বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি একজন মহান দেশপ্রেমিক বলে অভিহিত করে বলেন, মুক্তিযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর প্রশাসনকে ব্যর্থ বলা যায় না।

**সাক্ষাৎকারে কথোপকথনের বিবরণ :**

প্রশ্ন : পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পর ১৮ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। সে সময়ে আপনি আর্মি চিফ অফ স্টাফ ছিলেন। সেই ঘটনাবলির কথা মনে হলে আপনার কি প্রতিক্রিয়া হয়?

উত্তর : দেখুন, বলতে গেলে ১৫ আগস্টের ঘটনাবলির পর থেকে আমি সতেরো বছর দেশের বাইরে ছিলাম। এই পুরো সময়টা বিদেশের মাটিতে এই দিনটি আমাকে একভাবে নাড়া দিতো। তখন একাই ভেবেছি। দেশে ফিরে আসার পর এই দিনটি আরেকভাবে আমাকে নাড়া দেয়। দেখি, মানুষ যেভাবে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে, অতীত নিয়ে যেভাবে ভাবে, তখন অনেক কিছু মনে পড়ে। আমি ভাবি,

সেদিন যদি একটি সৈন্যদল নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম তাহলে কি হতো? তাহলে হয়তো বঙ্গবন্ধুকে বাঁচানো যেতো। এ সব ভেবে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে একাত্তর সাল থেকেই আমি অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়েছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দুই বার শত্রুর মুখোমুখি হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছি। তখন থেকেই আমি ভাবি যা ঘটবার তা ঘটবেই। তবুও সতর্ক হওয়া উচিত। সকল রকম প্রস্তুতি নেয়া দরকার। পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয়, পনেরোই আগস্টে কি করা যেতো, কিছু করা সম্ভব ছিল কি না। এ সব ভেবে মন খারাপ হয়।

প্রশ্ন : পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনকে কি আপনি সামরিক অভ্যুত্থান বলবেন?

উত্তর : পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের ঘটনাবলিকে আমি সামরিক অভ্যুত্থান বলে উল্লেখ করতে চাই না। যদিও পরবর্তীতে এটি সামরিক অভ্যুত্থান বলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আসলে, সামরিক অফিসারদের একটি ছোট গ্রুপ, সেনাবাহিনীর ভেতরে এবং বাইরে যাদের অবস্থান ছিল, তারা–ই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। সে সময়ে এমন একটা পরিস্থিতি ছিল যেখানে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ ছিল মানুষের মধ্যে। আবার সামরিক বাহিনীর মধ্যেও তা ছিল। এ পটভূমিতে এই যে একটি ঘটনা, পরবর্তীতে মস্ত বড়ো বিপদ ডেকে নিয়ে আসে, সেটা ঘটিয়েছিল একটি ছোট গ্রুপ। এটা সামরিক অভ্যুত্থান নয়। এটা একটা সন্ত্রাসী কাজ, একটি ছোট গ্রুপের কাজ।

প্রশ্ন : সামরিক বাহিনীর ভিতর থেকে কেন এই ঘটনা হতে পারলো?

উত্তর : তখন সরকারের কিছু কার্যকলাপে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। আবার সেনাবাহিনীর মধ্যেও তা ছিল। সরকারী বিরোধী কিছু রাজনৈতিক শক্তি এই অবস্থার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। তারা কিছু অফিসার এবং জোয়ানদের বিভ্রান্ত করতে পেরেছিল। এদের অবস্থান সরকারের ভিতরেও ছিল এবং বাইরেতো ছিলই। এই শক্তিটা সক্রিয় ছিল। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে গ্রুপটি ১৫ আগস্টের দুঃখজনক ঘটনা ঘটায়।

প্রশ্ন : এ রকম ঘটনার সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন?

উত্তর : সামরিক বাহিনীর মধ্যে যে একটা অসন্তুষ্টির মনোভাব ছিল সেটা কিছুটা টের পেয়েছিলাম। এই অসন্তুষ্টির কারণে কিছু 'পকেটে' (গ্যারিসন) সরকার সম্পর্কে সমালোচনা দেখা দিচ্ছিল। আর, এই ঘটনার মাস ৫/৬ আগে আমাদের হাতে একটি লিফলেট আসে, কিছু সিপাই, এনসিও পর্যায়ের লোক সরকারের কার্যকলাপে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এটি বের করেছিল। সেটাসহ একজন এনসিও'কে ধরা হয়েছিল। এটা যখন ধরা পড়ে তখন আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা ভালোভাবে সংগঠিত ছিল না। কার্যতঃ পুরো সামরিক বাহিনীই তখন এ্যাডহক ভিত্তিতে কাজ করছিল। আমরা পুরো বাহিনীকে সংগঠিত করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছিলাম। সেটা সরকারের কাছে ছিল অনুমোদনের জন্য। যেহেতু এটা বিলম্বিত

হচ্ছিল সে জন্য প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী নূরুল ইসলাম চৌধুরীর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করি। বিষয়টি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে জন্য আমি প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে যাই। উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের পুরো পরিকল্পনার মধ্য থেকে অন্ততপক্ষে গোয়েন্দা বিভাগকে সংগঠিত করার সম্মতি দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো; কারণ, এটা ছাড়া আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম। যেটা আমার সামনে অসে, লিফলেট নিয়ে ধরা পড়ার ঘটনা, সেটা পেয়েছিলাম একটি ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের মাধ্যমে।

আমি বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ করার পরও সে অনুমোদন পাইনি। তিনি তখন বলেছিলেন, কেন রউফ তোমাকে সব খবর দেয় না? ব্রিগেডিয়ার রউফ তখন ডিজিএফআই ছিলেন। আমার মনে হলো, আমি যে খবরটা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম, সেটা উনি জানেন। যেহেতু এটা সামরিক বাহিনীর ভিতরের ঘটনা, সেটা ডিজিএফআই'র জানার কথা। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, কেন রউফ তোমাকে বলেনি। আমার বিশ্বাস হয়েছিল, ডিজিএফআই এই খবর বঙ্গবন্ধুকে দিয়েছিল। আমি বলি, রউফ আমাকে এ খবর দেয়নি। আমি পেয়েছি একটি ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের মাধ্যমে। এই যে কিছু জানতাম, কিছু জানতাম না, নিয়ে বলা যায়, কিছু আঁচ পেয়েছিলাম। কিন্তু এটা যে এ রকম রূপ নেবে, সেটা চিন্তা করিনি। আমরা ভেবেছিলাম, যেটা হতে পারে, সেটা সিপাই এসিওদের মধ্য থেকে হতে পারে। অফিসাররাই এমন কিছু একটা করছে, সেটা ধারণার বাইরে ছিল।

প্রশ্ন : সেই সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভেবেছিলেন কি?

উত্তর : তখন বঙ্গবন্ধুর সাথে কথাবলার পর, গ্যারিসন কমান্ডারদেরও এ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা হয়। তবে এটাকে এত বড়ো কিছু মনে করে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। পরে ব্রিগ্রেডিয়ার রউফের সাথে এ নিয়ে আর কোনো কথা হয়নি। হতে পারে সে ইচ্ছে করে আমাকে পুরোটা জানতে দেয়নি। এই অভিযোগ আমি বঙ্গবন্ধুর কাছেও করেছিলাম।

আমি সে সময়ে বঙ্গবন্ধু এবং মুখ্য সচিব রুহুল কুদ্দুসের সাথে কথা বলেছি বার বার। তিনি আমাদের পরিকল্পনা অনুমোদন করবেন করবেন করেও করতে পারেননি। এই কাজে সে সময়ে কিছুটা সাবোটাজও হয়েছিল বলে মনে হয়।

প্রশ্ন : তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটিকে বঙ্গবন্ধু কি হালকাভাবে নিয়েছিলেন?

উত্তর : আমার মনে হয় তিনি ব্যাপারটিকে এত গুরুত্ব দেননি। আমি যখন বলি, আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে, তখন তিনি বলেন, তুমি খবর চাও, আমি তোমাকে খবর দেবো। আমি কিছুটা হতাশ হই। কারণ, আমি যে বিষয়টিতে গুরুত্ব দিচ্ছিলাম, সেটা তিনি দেননি। অধ্যাপক নূরুল ইসলামও বলেছিলেন। আমরা

তখনও ভাবিনি এ থেকে এত বড়ো ঘটনা ঘটে যেতে পারে, এত অফিসাররাও যুক্ত থাকতে পারে।

প্রশ্ন : ১৫ই আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে আপনি কখন জানতে পারলেন?

উত্তর : ১৫ই আগস্ট ভোরে ফজরের নামাজের পরে আমি এ সম্পর্কে কিছুটা জানতে পারি। ১৪ তারিখ সারাদিনই কিছু ঘটনা ঘটে। সেদিন চট্টগ্রামে একটি ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের একটি হেলিকপ্টার ছিল। সেদিন ওটা কলকাতা যাচ্ছিল। সেটা যখন ফেনীর উপর তখন দুর্ঘটনা ঘটে। হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়। আরোহীরা সকলে মারা যায়। এ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম সারাদিন।

পরের দিন (১৫ই আগস্ট) বঙ্গবন্ধুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা। সেদিন (১৪ আগস্ট) বিকালে ঐ মঞ্চে এবং এর আশেপাশে কিছু বিস্ফোরণ ঘটে। আরও বিস্ফোরক আছে কিনা, সেটা দেখার জন্য পুলিশের আইজি নূরুল ইসলাম আমাকে ঐ এলাকাকে বিপদমুক্ত করার অনুরোধ জানান। সে জন্য কিছু বিস্ফোরক উদ্ধার বিশেষজ্ঞদের কয়েকটি দল পাঠাই। এ সব নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকি। এ সব কিছু শেষ হতে হতে অনেক রাত হয়ে যায়। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। সেদিন খুব সকালে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক লে. কর্নেল সালাহউদ্দিন এসে আমাকে খবর দেয়, স্যার, আপনি কি আর্মড এবং আর্টিলারী রেজিমেন্টকে শহরে পাঠিয়েছেন? তারাতো শহরে যাচ্ছে। তারা রেডিও অফিস দখল করেছে। তারা গণভবন, ধানমণ্ডির দিকে যাচ্ছে।

এ কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার মধ্যে বিদ্যুতের মতো প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করি, ঢাকার বিগ্রেড কমান্ডার জানেন? তারপর আমি তাকে বলি, যদি তারা এভাবে গিয়ে থাকে, তাহলে তুমি তাড়াতাড়ি ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলের কাছে যাও, ইনফেন্টি ব্যাটালিয়নকে প্রস্তুত করে প্রতিরোধ করতে বলো।

প্রশ্ন : এই ঘটনা জানার পর বঙ্গবন্ধুর সাথে কি আপনার কোনো যোগাযোগ হয়েছিল?

উত্তর : লে. কর্নেল সালাহউদ্দিনকে এই নির্দেশ দিয়ে, ঘরে গিয়ে লাল টেলিফোনে বঙ্গবন্ধুকে ফোন করি। দেখি, তার টেলিফোন ব্যস্ত। তখন আমার স্ত্রীকে লাল টেলিফোন ঘোরাতে বলি। আর, আমি অন্য টেলিফোনে চেষ্টা করি। এই সময়ের মধ্যে যদি বঙ্গবন্ধুও আমাকে চেষ্টা করে থাকেন, তাহলে তিনি আমাকে পাননি। আমি জানার পরে যদি তিনি চেষ্টা করে থাকেন, তাহলে তো পাওয়ার কথা নয়, আমার টেলিফোনতো তখন ব্যস্ত।

কয়েকটি টেলিফোন করার পর আমি আবার টেলিফোন নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। ৬টা বাজার ৩/৪ মিনিট আগে আমি টেলিফোনে বঙ্গবন্ধুকে পেয়ে যাই। আমার সাথে শুধু কয়েকটি কথা হয়। তিনি বলেন, শফিউল্লাহ তোমার ফোর্স আমার বাড়ি এ্যাটাক করেছে। কামালকে বোধহয় মাইরা

ফেলছে। তুমি জলদি ফোর্স পাঠাও। আমি বলি, Sir, I am doing something. Can you get out of the house? আমি এই কথা বলার পর তার গলা আমি আর শুনতে পাইনি। মনে হলো, টেলিফোনটি টেবিলের উপর রেখে দিয়েছেন। আমি হ্যালো, হ্যালো করছি। সে সময়েই আমি টেলিফোনের মধ্য দিয়ে গুলির আওয়াজ শুনতে পাই। তারপরই টেলিফোনটা অকেজো হয়ে যায়।

প্রশ্ন : আপনি কি কিছু করতে পেরেছিলেন? আপনার চেষ্টার ফল কি হলো?

উত্তর : সিকোয়েন্সটা হলো এ রকম। আমি প্রথমে কথা বলি শাফায়াত জামিলের সাথে। আর মনে হলো, আমি তাকে ঘুম থেকে উঠিয়েছি। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জানেন যে আর্মড এবং আর্টিলারী ইউনিট শহরের দিকে গেছে? তিনি বলেন, জানেন না। তখন আমি তাকে তখন প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে ঐ গ্রুপটিকে প্রতিরোধ করার জন্য নির্দেশ দিই। এই কথা বলে আমি বিমানবাহিনীর প্রধান এ কে খন্দকার এবং নৌবাহিনীর প্রধান এম এইচ খানকে ফোন করি এবং কথা বলি। আমি বুঝলাম, তারাও কিছু জানেন না। এরপর আমি জেনারেল জিয়ার সাথে কথা বলি, আমার মনে হলো, তিনি আমার কাছ থেকেই ঘটনা সম্পর্কে প্রথম শুনলেন। আমি তাকে বলি, আপনি দ্রুত আমার বাসায় চলে আসুন। তারপর ফোন করি খালেদ মোশাররফকে। তাকেও আমার বাসায় আসতে বলি।

এরপর ডিজিএফআইর ব্রিগেডিয়ার রউফকে ফোন করি। তার বাসায় কেউ ফোন ধরেনি। তারপর কর্নেল জামিলকে (নতুন ডিজিএফআই) ফোন করি। তাকে আমি পাই, তিনি বললেন, বঙ্গবন্ধু আমাকে ডেকেছেন। আমি তাঁর বাসায় যাচ্ছি। আমি বলি, আমি বঙ্গবন্ধুকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। তুমি যেহেতু বঙ্গবন্ধুর কাছে যাচ্ছো তাকে বলো, আমি কিছু করার চেষ্টা করছি। আর যদি পারো, তাকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যেয়ো।

এ সব কিছুর পর, আমি বঙ্গবন্ধুকে ফোনে পাই এবং কথা বলি। সে কথা আগেই বলেছি।

তারপর আমি আবার ফোন করি কর্নেল শাফায়াত জামিলকে; কারণ তখন পর্যন্ত কিছুটা সময় ছিল। ১৫/২০ মিনিটের বেশি হয়ে গেছে, কিন্তু আমি কোনো প্রতিক্রিয়া বা কোনো তৎপরতার খবর পাচ্ছিলাম না। এমনটা কেন হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছিলাম না।

আমি তাকে না পেয়ে এক্সচেঞ্জকে বললাম আমাকে ধরিয়ে দিতে। এক্সচেঞ্জ থেকে বলা হয়, মনে হয় টেলিফোনটা তুলে রাখা হয়েছে। আমি ভাবলাম, হয়তো উত্তেজনয় টেলিফোনটা তিনি ঠিক জায়গায় রাখতে পারেননি। অথবা যারা ক্যু করেছে, তারা তাকে আটকে রেখেছে।

এই সময়ের মধ্যে জেনারেল জিয়া চলে আসেন। খালেদও আসে। এই সময়ে

আমার বেটম্যান রেডিও খুলে দেয়। আমি ডালিমের গলা শুনতে পাই।

আমি তাদের বললাম, শাফায়াত কি করছে? আমি বুঝতে পারছি না। আমি বাসায় বসে কিছু করতে পারছি না। আমি অফিসে যাবো। আমি যখন কাপড় বদলাতে ভিতরে যাই, তখন দেখি রউফ আমার পিছনের দেয়াল টপকে ভিতরে এসে পড়েছে। সে তখন লুঙ্গি গেঞ্জি পরা অবস্থায় ছিলো। আমি ওকে বাসায় গিয়ে কাপড় বদলিয়ে আসতে বলি।

আমি প্রস্তুত হয়ে আমার অফিসিয়াল গাড়িতে অফিসে যাই। জিয়া আমার পর পর আমার অফিসে আসে। ইতিমধ্যে খালেদও চলে আসে। আমি ওকে শাফায়াতের ব্রিগেডে যেতে বলি এবং কেন ওরা কিছু করছে না, সেটা জানতে বলি। কোনো তৎপরতা দেখছি না কেন, ইতিমধ্যেতো দ্রুত তৎপরতা শুরু হওয়া উচিত ছিল।

প্রশ্ন : আপনি বঙ্গবন্ধুর হত্যার খবর কখন জানলেন?

উত্তর : এরপর আমার এডিসিকে খবর নিতে এবং আমাকে জানাতে বলি। তারপর আমি ঢাকার বাইরে অন্যান্য ব্রিগেড কমান্ডারদের সাথে টেলিফোনে কথা বলি। ইতিমধ্যে তারা রেডিও থেকে খবর জেনে গেছে। আমি তাদের বলি, যা ঘটেছে, সেটা আমার অজ্ঞাতে হয়েছে। আমি ঢাকার কমান্ডারকে প্রতিরোধের জন্য বলেছি। পরবর্তী নির্দেশের জন্য আমি তাদের অপেক্ষা করতে বলি।

এরপর খালেদ মোশাররফ আমাকে টেলিফোন করে, আমি জিজ্ঞাস করি, কি হচ্ছে? তখন সে বলে, স্যার, ওরা আপনাকে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে চায়। আমি বলি ওরা কারা? সে বলে, আমাকে সব বলতে দিচ্ছে না। আমি বলি, যা হোক তুমি আসো। সে বলে, আমাকে পনের মিনিটের জন্য আসতে দিচ্ছে। আমি ওকে আসতে বলি।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই এডিসি এসে বলে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। এই প্রথম আমি শুনি এবং আমার মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া হয়। এ খবর আমি বিশ্বাস করতে পারিনি এডিসি চলে যাওয়ার পর খালেদ আসে। সে বলে, বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন। পুরো গ্যারিসন মনে করে আপনার নির্দেশে ক্যু হয়েছে। ওরা আনন্দ করছে। কেউ নড়ছে না। যখন খালেদ কথা বলছিল, তখন জেনারেল জিয়া এবং কর্নেল নাসিম আমার অফিস কক্ষে ছিল।

প্রশ্ন : আপনার কাছে ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষ থেকে প্রথম কি প্রস্তাব এসেছিল সে দিন সকালে?

উত্তর : খালেদ মোশাররফ কথা শেষ করার পরপরই আমার অফিসের সামনে দুটি গাড়ি বেশ আওয়াজ করে থামে। বাইরে কিছু হৈ চৈ'র শব্দ শোনা যায়। তারপরই সজোরে ধাক্কা দিয়ে দরোজা খুলে ডালিম এবং তার সাথে প্রায় দশ/বারো জন সশস্ত্র সৈনিক আমার অফিস ঘরে ঢোকে এবং আমার দিকে অস্ত্র তাক করে চিফ

কোথায়, চিফ কোথায়, বলে চীৎকার করতে থাকে। তখন কর্নেল নাসিম উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে, দেখছো না চিফ সামনেই। ডালিমের এই ঔদ্ধতাপনা দেখে আমি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বলি, তুমি যে অস্ত্র আমার দিকে তাক করছো, আদৌ সেটা যদি ব্যবহার করতে চাও করো। আর যদি কথা বলতে এসে থাকো, তাহলে অস্ত্র বাইরে রেখে আসো। এই কথার পর ও অস্ত্র নামিয়ে নিয়ে বলে, স্যার, প্রেসিডেন্ট আপনাদের রেডিও স্টেশনে যেতে বলেছেন।

আমি বললাম, আমি জানি প্রেসিডেন্ট নিহত হয়েছেন। তখন সে বলে, স্যার, আপনার জানা উচিত, খন্দকার মোশতাক আহমদ এখন রাষ্ট্রপ্রধান। আমি বলি খন্দকার মোশতাক তোমার রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে, কিন্তু আমার নয়।

এ কথার পর ডালিম বলে, স্যার আমাকে এমন কিছু করতে বাধ্য করবেন না যেটা আমি চাই না। আমি বলি, তুমি যা কিছু করতে চাও, করতে পারো। আমি তোমার সাথে কোথাও যাচ্ছি না। আমি আমার সৈন্যদের কাছে যাচ্ছি। এ কথা বলে এডিসিকে গাড়ি আনতে বলে আমি উঠে দাঁড়াই। গাড়িতে উঠে সরাসরি ৪৬ ব্রিগেডে যাই। ওখানে গিয়ে দেখি সৈন্যরা সবাই আনন্দ করছে। এমনকি সেখানে বঙ্গবন্ধুর কিছু ছবিও ভাঙ্গা হয়েছে। এ সব দেখে তখন আমার মূক বধির হবার অবস্থা। তখন কয়েকজন অফিসার আমাকে পথনির্দেশ করে পাশের একটি ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে দেখি মেজর হাফিজ এবং মেজর রশীদ। ওরা এসে আমাকে অনুরোধ করে, স্যার আপনি রেডিও স্টেশনে যান। তখন আমি বললাম, আমিতো একা যাবো না। অন্য দুই চিফের সাথে কথা বলবো। তারাই আমাকে দুই বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। দুই প্রধান বলেন, আপেক্ষা করুন, আমরা আসছি।

প্রশ্ন : আপনার সাথে খন্দকার মোশতাকের কখন কোথায় কথা হলো?

উত্তর : আমি যখন ওদের জন্য অপেক্ষা করছি, সে সময়ে আমি ভাবছিলাম, আমার কি করা দরকার? আমার সামনে দুটি প্রশ্ন (এক) বঙ্গবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে আমার কোনো সংশয় থাকতো না। আমি সরাসরি সংঘর্ষে যেতাম। (দুই) যেহেতু বঙ্গবন্ধু বেঁচে নেই তাতে আমি সংঘর্ষে গিয়ে কি লাভ করতে পারবো? পারি, গৃহযুদ্ধের দিকে দেশকে নিয়ে যেতে। এতে আরও রক্তপাত হবে। এটা কি লাভজনক হবে? এই কথা ভাবতে ভাবতে ওরা চলে আসে। কিছু কথা হবার পর সবাই আমরা রেডিও স্টেশনে চলে যাই।

সেখানে যাওয়ার পর আমাদেরকে খন্দকার মোশতাক যে ঘরে বসা ছিল সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে যাওয়ার সাথে সাথে খন্দকার মোশতাক আমাকে বলেন, অভিনন্দন শফিউল্লাহ, তোমার সৈন্যরা একটি বিরাট কাজ করেছে। এখন বাকিটা করো। আমি বললাম, আর বাকি কি আছে? তিনি বলেন, তোমারই সেটা জানার কথা। এটা বলার সাথে সাথে আমি বলি, তাহলে সেটা আমার উপরই

ছেড়ে দিন। এ কথা বলে চলে আসার সময় তাহেরউদ্দিন ঠাকুর খন্দকার মোশতাককে বলেন, স্যার, ওনাকে থামতে বলুন। ওনাকে থাকতে হবে। রেডিওতে একটা ঘোষণা দিতে হবে এবং আমাদের গতিরোধ করা হলো। সে সময়ে তাহের ঠাকুর একটা কাগজে ঘোষণা লিখে দিল। সেটা আমরা একে একে পড়ি। সেটাই পরে রেডিওতে ঘোষিত হয়।

এ সব কিছুর পর খন্দকার মোশতাক বলেন, আমি এখনই বঙ্গভবনে যাচ্ছি। জুম্মার নামাজের আগেই সেখানে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। আমি চাই, আমার সকল প্রধানরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন। এরপর আমরা সবাই ক্যান্টনমেন্টে চলে আসি এবং সকল অফিসারদের একত্রিত করে পুরো ঘটনা বর্ণনা করি। সবাইকে সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য বলি। তারপর বঙ্গভবনের দিকে চলে যাই। তখন প্রায় ১১টা বেজে গেছে। বঙ্গভবনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হলো। প্রধান বিচারপতি অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন।

প্রশ্ন : শপথ গ্রহণের পর কি হলো? আপনি কি করলেন?

উত্তর : শপথ গ্রহণের পর খন্দকার মোশতাক বললেন, আমার চিফদের দরকার। আমরা তিন জনই থেকে গেলাম আলোচনার জন্য। নামাজের পর বৈঠক শুরু হলো। খন্দকার মোশতাক, তিন বাহিনীর প্রধান, জিয়া এবং খালেদও ছিল। আলোচনার বিষয় ছিলো মার্শাল ল' দেয়া হবে কি হবে না। অল্প কিছুক্ষণ বৈঠক হবার পর স্থগিত হয়ে গেলো। বিকেল–সন্ধ্যায় আবার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। সেটার পর আবার বৈঠক। তখন সবাই আর নেই।

দ্বিতীয়বারের শপথের পর কর্নেল মঞ্জুরকে বঙ্গভবনে দেখে আমি বিস্মিত হই। তখন সে দিল্লীতে কর্মরত ছিল। আমি জিজ্ঞেস করি, তুমি কিভাবে আসলে? সে বলে, আমি খবর জেনে রাস্তা দিয়ে ঢাকায় চলে এসেছি। এখনও সে প্রশ্ন, সে ঢাকায় কিভাবে এবং কেন এলো?

এক সময়ে যখন সবাই সম্মেলন কক্ষে তখন রাষ্ট্রপতির ভারপ্রাপ্ত সামরিক সচিব এসে বলেন, স্যার, আপনার একটি টেলিফোন। অন্যদিক থেকে জেনারেল ওসমানির কণ্ঠস্বর শুনলাম। তিনি বলেন, শফিউল্লাহ্ অভিনন্দন নাও। আমি বললাম, স্যার, আপনি কি মনে করেন এটা অভিনন্দনযোগ্য? তিনি বলেন, তুমি কি জানো না যে তুমি দেশকে বাঁচিয়ে দিয়েছো?

এরপর সম্মেলন কক্ষে ঢুকে দেখি, এক কোণায় খন্দকার মোশতাক আর কর্নেল মঞ্জুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছে। তখন আমি আরও ভাবলাম, কে তাকে আসতে বলেছে? আমি তাকে আসতে বলিনি। আমি সেনাপ্রধান। সে তখন দিল্লীতে মিলিটারী এটাসি। খন্দকার মোশতাকতো সেদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ছিলেন না? তাহলে তাদের এই ঘনিষ্ঠতার কি ছিল?

বৈঠক আবার শুরু হলো। এক পর্যায়ে কথা উঠলো, মার্শাল ল' দেয়া হবে

কিনা? আমি বললাম, এ নিয়ে আলোচনার কি আছে? এটাতো ঘোষিত হয়ে গেছে। এখন শুধু এটা আনুষ্ঠানিকতার প্রশ্ন। এতে খন্দকার মোশতাক বলেন, কে এর দায়িত্ব নেবে? আমি বললাম, রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, কেন রাষ্ট্রপতি? তোমার বাহিনী এটা করেছে। তোমাকে দায়িত্ব নিতে হবে। এ কথা বলার সাথে সাথে আমি বলি, আমি দায়িত্ব নিতে ভীত নই, কিন্তু ওরা যদি আমার বাহিনী হতো তাহলে তো আমার নামে ঘোষণা দিতো। তারাতো আপনার নামে ঘোষণা দিয়েছে। তখন তিনি কথা ঘুরিয়ে নেন। তিনি আমাকে বলেন, আমরা আলোচনা করছি সামরিক আইন করা হবে কিনা, তা নিয়ে। এই রকম আলোচনা আরও দুই দিন চললো। এই তিন দিন পুরো সময়টা আমাকে ওরা বঙ্গভবনে ব্যস্ত রাখে। অন্য সমরিক কর্মকর্তরা বার বার বাসায় বা অফিসে ফিরে যাচ্ছিল। ওরা আসা যাওয়ার মধ্যে ছিল।

প্রশ্ন : তাহলে আপনাকে কি ওরা ভয় পাচ্ছিল?

উত্তর : হতে পারে। সে জন্যই তো ২৪ আগস্ট তারিখে আমাকে পদচ্যুত করে। এই তিন দিন সময়কালের মধ্যে এক দিন আমাকে রক্ষী বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাকে সাভার যেতে হয়। তখন তাদের মধ্যে উত্তেজনা ছিল। এবং একজন রক্ষী নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করে। ওদেরকে সামাল দেয়ার জন্য আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ রকম এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে আমি যখন বঙ্গভবনে অবস্থান করছিলাম এমন সময় একদিন (১৭ আগস্ট) খালেদ মোশারফ আমাকে এসে বলেন, স্যার, আপনি কি জানেন, ট্যাঙ্কগুলো কোনো রকম গোলা-বারুদ ছাড়াই এ্যাকশনে গিয়েছিল? তখনও আমি জানতাম না যে, ওদের ট্যাঙ্ক-কামানে গোলা ছিল না। তাৎক্ষণিকভাবে আমার মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল যে, তাহলেতো ওদের নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন কিছু নয়। এ কথা ভেবে আমি খালেদকে বলি, এটা কি সত্যি? খালেদ বলে হ্যাঁ স্যার, আমি তো পরশু দিনই (১৫ই আগস্ট) ওদের গোলা-বারুদ দিয়েছি।

আমি বললাম, তুমি এ সময় ওদের গোলা-বারুদ দিলে আমাকে জিজ্ঞেস করলে না? এরা এমন জঘন্য কাজ করেছে, এখনতো ওরা আমার মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে উঠবে। সে বললো, আমি ভেবেছি সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। আমি বলি, ওরা যদি গোলা-বারুদ ছাড়া এমন কাণ্ড করতে পারে তাহলে ওরাতো এখন আরও অনেক কিছু করতে পারে। খালেদ চলে যাওয়ার পর এক সময় মেজর রশীদ আসে আমার কাছে। আমি প্রশ্ন করি, তোমরা কিভাবে এমন জঘন্য কাজ করতে পারলে? রশীদ বললো, স্যার এটাতো বেশ দীর্ঘ কথা। সে বললো, রোজার ঈদের দিন আপনার বাসায় গিয়েছিলাম।

আমি সস্ত্রীক দেড় ঘণ্টা ছিলাম। সেদিন ইচ্ছে ছিল আপনাকে বলা। তখন আমি জিজ্ঞেস করি, বললে না কেন? সে উত্তর দেয়, সাহস পাইনি। আমি বলি, সাহস না পেয়ে থাকলে, তাহলে করতে গেলে কেন? অন্যরা কি জানতো?

সে বলে, হ্যাঁ, স্যার অনেকে জানতো। সে আরও বলে, আমাদের সাফল্য লাভ করার সম্ভাবনা ছিল মাত্র .০১% তবুও আমরা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলাম। যদি আমরা ব্যর্থ হতাম তাহলে মরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত যদি কোনো সুযোগ পেতাম, তাহলে বলে যেতাম অনেক সিনিয়র অফিসার এর সাথে যুক্ত ছিল। তার এই কথাগুলো শুনে আমি বিমর্ষ হয়ে পড়ি।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখনও আলোচনা চলছে। আমি বঙ্গভবনেই আছি, সে রাতেই শেষ কথা হলো, একটা খসড়া তৈরি করতে হবে। সে রাতে বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধানসহ আমি এবং ব্রিগেডিয়ার খলিল আর ঘুমাইনি। খুব সকালে খন্দকার মোশতাক আমাদের কাছে এসে একটি খসড়া দেয়। সেটাই পরে ঘোষণা করা হয়। তারপর আমরা চা খেয়ে বঙ্গভবন থেকে চলে আসি। আমি অফিসে যাই এবং খালেদকে বলি, আমাদের বৈঠক হওয়া দরকার। রাতেই সেটা হওয়া দরকার।

সে রাতের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিন বাহিনীর প্রধান, পুলিশের আইজি, জেনারেল জিয়া, পিএসও, ব্রিগেডিয়ার রউফ, খালেদ মোশাররফ, ডিএমও কর্নেল মালেক, জিএসও ওয়ান লে. কর্নেল নূরুদ্দিন আহমেদ। ওখানে যখন সম্মেলন করছি, সে রাতে রউফ বলেন, আমরা ওখানে যত কথাই বলি, সব ফাঁস হয়ে যায়। সে জন্য গোপন কথা বলতে হলে আমাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। সেটা করা হলো। সভায় সবাই বললো সেনাবাহিনীর কমান্ড ভেঙ্গে গেছে। অভ্যুত্থানকারীদের শাস্তি হওয়া দরকার। এ রকমই সিদ্ধান্ত হলো যে, যারা বঙ্গভবনে আছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সামরিক বাহিনীর চেইন অফ কমান্ড ফিরিয়ে আনতে একই সঙ্গে ১৯ তারিখে সকল ব্রিগেড কমান্ডারদের নিয়ে বৈঠক ডাকি। সেদিন সকালে বৈঠকের সময় ফারুক আর রশীদকেও হেড কোয়ার্টারে উপস্থিত থাকতে বলা হয়।

সকালে সম্মেলনে গিয়ে আমি সকলকে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাই কি পরিস্থিতিতে পুরো দায়িত্ব নিতে হয়, তা ব্যাখ্যা করি। সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কথা বলি।

প্রশ্ন : ১৯ আগস্টের পর কি হলো?

উত্তর : দেখলাম আমাদের সব কথা জানাজানি হয়ে গেছে। যে সব গোপন সিদ্ধান্ত নিই সেগুলোও বঙ্গভবনে সকলে জানে। এ সময়ে আমি অপেক্ষা করছিলাম ফারুক-রশীদ ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসে কি না। আমি খন্দকার মোশতাকের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, ওরা ভীত। সময় দাও। এভাবে ২৪ তারিখ এসে যায়।

সে দিন দুপুর ১২টার রেডিওর খবরে জানানো হয়, জেনারেল ওসমানীকে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা করা হয়েছে। এর পরপরই খন্দকার মোশতাক আমাকে টেলিফোন করে বলেন, তুমি খবর শুনেছো? বললাম, এটা ভালো খবর। তিনি বললেন, আমি তোমাকে সাড় পাঁচটায় বঙ্গভবনে চাই। আমি বঙ্গভবনে যেতেই

একজন অফিসার বললেন, জেনারেল ওসমানী আমাকে সালাম দিয়েছেন। আমি তাঁর ঘরে গেলাম। তিনি আমাকে বসতে বলে কিছু কথা বললেন। তিনি আমার প্রশংসা করলেন। তারপর উনি বললেন, তুমি দেশের জন্য অনেক করেছ। দেশ তোমাকে চায়। এখন তোমার ভূমিকা বিদেশের মাটিতে দেখতে চাই। তোমাকে বিদেশে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হবে। এটা আমার জন্য বজ্রপাতের মতো শোনালো। আমি বললাম, খন্দকার মোশতাকের সাথে কথা বলতে চাই। আমরা গেলাম, তিনি অনেক কথা বললেন। বললেন, এখন বিদেশে তোমার কাজ দেখতে চাই।

আমি তাকে বলি, আমাকে যখন সেনাবাহিনীর প্রধান করেন বঙ্গবন্ধু, তখন বলেছিলাম বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাকে দায়িত্ব নিতে হলো। এখনও বলি, এবার আমি পরিস্থিতির শিকার হলাম। আগস্টই আমার চাকুরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেষণে পাঠানো হয়।

প্রশ্ন : ১৫ আগস্টের ঘটনা প্রতিরোধ করতে পারলেন না, এটা কি আপনার ব্যর্থতা বলে মনে করেন?

উত্তর : প্রশ্ন হলো এ রকম অবস্থায় একজন সেনাপ্রধান কি করতে পারেন? তিনি তো একজন একক ব্যক্তি। তিনি তার সহকর্মী, অধীনস্থ অফিসারদের দিয়ে কাজ পরিচালনা করেন। সে সময়ে যার সবচেয়ে বড় ভূমিকা নেয়া প্রয়োজন ছিল, তিনি ছিলেন ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার। তাকে নিষ্ক্রিয় দেখে, চিফ অফ জেনারেল স্টাফকে পাঠালাম। তিনিও উৎসাহজনক রিপোর্ট দিলেন না। তখন আমি নিজে যাই এবং ৪৬নং ব্রিগেডে গিয়ে যখন দেখি, আমি একা, তখন আমার কি করণীয় থাকে?

আমার মনে হয়, আমার যদি কোন ব্যর্থতা থেকে থাকে, সেটা হলো আমার নিজের আত্মহুতি প্রদান। এটাই যদি আমার কর্তব্য হয়ে থাকে তাহলে সেখানে আমি আমার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি। সেটা করে কোনো যদি লাভ হতো, তাহলে সেটা আমার ব্যর্থতা।

প্রশ্ন : কেন এই অভ্যুত্থান সফল হলো?

উত্তর : এ জন্য একটু পটভূমি ব্যাখ্যা করা দরকার। সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ এ রকম মনোভাব ছিল যে, তারা কিছুটা অবহেলিত। যদিও ব্যাপারটা পুরোপুরি সত্য ছিল না। তবে কতগুলো কার্যকলাপ; যেমন, রক্ষীবাহিনীর আবির্ভাবটা অসন্তোষের একটা বড়ো কারণ ছিল। বিরোধী পক্ষ এর পুরো সুযোগ নেয়। তারা এটা প্রচার করে অনেকের মধ্যে এটা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় যে, শেষ পর্যন্ত রক্ষীবাহিনী সেনাবাহিনীর জায়গা নিয়ে নেবে। আর, এ জন্য কিছু ঘটনা কাজ করেছে। সেটা হলো, সেনাবাহিনীর প্রায় সব কিছুই ছিল পুরনো বা পূর্ব ব্যবহৃত। এটা নয় যে, এগুলো তাদের দেয়া হয়। এগুলো তাদেরই ছিল। দেশে যা ছিল, সেটা দিয়ে সেনাবাহিনীকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু রক্ষীবাহিনী যখন তৈরি করা হয় তখন তাদের জন্যতো কিছু ছিল না। তাদের অস্ত্র, পোশাক, যানবাহন বা

অন্য কোনো কিছুই ছিল না। সে জন্য সবকিছুই নতুন করতে হয়। তাই ওদের সবকিছু নতুন ছিল। পোশাক, অস্ত্র, যানবাহন, থাকার জায়গা সবই নতুন ছিল। এ সব কিছুই নতুন ছিল। পোশাক, অস্ত্র, যানবাহন, থাকার জায়গা সবই নতুন ছিল। এ সব কিছুই সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে কিছুটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। রক্ষীবাহিনীকে যখন দেখতো, অন্যরা মনে করতো আমরা অবহেলিত। এর উপর আরেকটি বড়ো ব্যাপার ছিল। রক্ষীবাহিনীকে কিছু ক্ষমতা দেয়া হয়, যা দিয়ে তারা যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারতো। যার প্রেক্ষিতে কিছু কিছু দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল দুই বাহিনীর মধ্যে।

প্রশ্ন : তাহলে তো দেখা যায়, এটাই আবার সত্য বলে প্রমাণিত হলো সেনাবাহিনী কখনোই বিকল্প কোন বাহিনীকে মেনে নিতে পারে না?

উত্তর : এটা ঠিক, তারা ভাবে যে, দেশের প্রতিরক্ষা বিষয়টিতো তাদের উপর ন্যস্ত। যদি তাই হয় তাহলে বিকল্পের কি প্রয়োজন।

প্রশ্ন : কেন রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছিল?

উত্তর : এটা করা হয়েছিল মূলত পুলিশকে সাহায্য করার জন্য। পুলিশ তখন কার্যকর ছিল না। তাদের পক্ষে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার মতো অবস্থা ছিল না। এ অবস্থায় হয়তো রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়। পরে এমন প্রচার হচ্ছিল যে, রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষের কাছে চলে গেছে। পরেতো ১৫ আগস্টের পর দেখা গেল তাদের সংখ্যা ছির ১০/১২ হাজারের মতো। বলা হতো, ওদের কামান দেয়া হয়েছে। পরে প্রমাণ হলো, সেটা ছিল না। এগুলোও সেনাবাহিনীর মধ্যে কাজ করেছে।

প্রশ্ন : রক্ষীবাহিনী কি প্রতিরোধের কথা ভেবেছিল?

উত্তর : এটা আমি বলতে পারবো না। তবে মনে হয় সমগ্র পরিস্থিতি তাদেরও অপ্রস্তুত করে ফেলে। তাছাড়া ট্যাঙ্কের উপস্থিতি তাদের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। তবে তাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল কিনা সে সম্পর্কে রক্ষীবাহিনীর তৎকালীন সমর নায়করা বলতে পারবেন।

প্রশ্ন : অভ্যুত্থান সম্পর্কে অনেকে বলে, এটা হয়েছিল ব্যক্তি আক্রোশের কারণে?

উত্তর : না, তবে কিছু সংখ্যক সামরিক অফিসার চাকুরিচ্যুত হয়েছিলেন, সেগুলোতে কিছুটা অন্যায় হয়েছিল। তা নিয়ে কিছু বিক্ষোভ ছিল। এটা হলো একটি গ্রুপের ব্যাপার। অন্যরা যেমন, রশীদ, ফারুক, তারাতো সেনাবাহিনীতেই ছিল। তারা এতে নেতৃত্ব দিয়েছিল বিশেষ রাজনৈতিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে। তারা অন্যদের ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। তখন সরকারের মধ্যেও একটা অংশও বোধহয় ওদের ইন্ধন যোগায়। আর, সরকারের বাইরের কিছু শক্তি এর সাথে যোগসাজশে ছিল।

প্রশ্ন : এই ঘটনার পিছনে কোন বিদেশীদের হাত ছিল বলে মনে করেন?

উত্তর : এ ব্যাপারে আমার কাছে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তবে তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপে বাইরের কোনো কোনো শক্তির হাত ছিল বলে আমি বিশ্বাস করি। এমন হতে পারে, বঙ্গবন্ধুর সরকারের পতনের পর যারা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেয়, স্বাগত জানায়; তা দিয়ে তা তাদের পরোক্ষ সমর্থন ছিল বলে মনে করার কারণ রয়েছে।

প্রশ্ন : সেনাবাহিনীর ভিতরে তখন সামগ্রিক দেশের অবস্থার প্রতিফলন ছিল কি?

উত্তর : দেশের তৎকালীন অবস্থায়, যেমন 'বাকশাল' গঠন ইত্যাদি নিয়েও সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া ছিল। আমার মধ্যে কিছু প্রশ্ন ছিল। সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলেছিলাম।

এ ব্যাপারে আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে প্রশ্ন করি, স্যার, সারাজীবন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছেন। হঠাৎ করে এক পার্টিতে কেন যাচ্ছেন? তিনি বললেন, শফিউল্লাহ তুমি বুঝবে না, যে ব্যক্তি সারাজীবন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছে, সে কি তা ভুলতে পারে? দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আন, আবার গণতন্ত্রে ফিরে আসবো। আমার উপর বিশ্বাস রাখো। তখন বঙ্গবন্ধুর উপরে রাজনীতি নিয়ে কথা বলার ক্ষমতা অন্তত আমার ছিল না। আমিও মেনে নিয়েছিলাম তাঁর ঐ বক্তব্য। যদিও আমরা যারা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছিলাম, এ থেকে সরে যাওয়া মেনে নিতে পারছিলাম না। তবে বঙ্গবন্ধুর ব্যাখা সে অবস্থায় মেনে নিয়েছিলাম। মনে হয় এ সব কিছুর পরও যদি রক্ষীবাহিনী সামনে না আসতো তাহলে হয়তো সেনাবাহিনী সেগুলো মেনে নিত।

প্রশ্ন : সেনাবাহিনীর ব্যাপারে কি বঙ্গবন্ধুর মধ্যেই কোনো সন্দেহ বা অনাস্থা ছিল বলে মনে করেন?

উত্তর : না, সেটা মনে করি না। হলেতো আনোয়ার সাদাতের কাছ থেকে ট্যাঙ্ক, মার্শাল টিটোর কাছ থেকে এক ডিভিশনের অস্ত্র আনাতো না। সে সময়ের প্রেক্ষিতে বলা যায়, সে সময়ে কিছু অসুবিধা ছিল। কোনো অবকাঠামো ছিল না। শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল না। যানবাহন বলতে কিছু ছিল না। বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। বৈদেশিক প্রকল্প চূড়ান্ত করা যাচ্ছিল না তাদের পুরানো ঋণ মেনে না নেয়া পর্যন্ত। এ সব সমস্যা নিয়ে তাঁরা কাজ শুরু করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনীর উন্নয়ন চাচ্ছিলেন, কিন্তু পারছিলেন না। কেননা তখন অগ্রাধিকার তো অন্যত্র ছিল। আমাদের পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করা যাচ্ছিল না। সে জন্যও অর্থের প্রয়োজন ছিল।

প্রশ্ন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আপনি কি ভাবেন—আপনার মূল্যায়ন কি?

উত্তর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন মহান দেশপ্রেমিক।

ছাত্র জীবন থেকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেয়া পর্যন্ত বাঙালী জাতি এবং বাংলাদেশের মুখপাত্র হিসেবে কথা বলে এসেছেন। সে জন্য তাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। তাঁর নিজের কর্মজীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, মিথ্যার কাছে কখন তিনি মাথা নত করেননি। দেশের স্বার্থকেই সব সময়ে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন। নিজের কি হবে না হবে, সেটা কখনো ভাবেননি। সে জন্য একজন প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়ার কথা ছিল সেটাও তিনি কখনো নেননি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বঙ্গবন্ধু মূলত বিরোধী দলীয় রাজনীতি করেন। এ জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল তা হয়তো পুরোটা অর্জন করার সময় পাননি। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি তা জানতেন না বা তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর সাড়ে তিন বছরের রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি সফল, এটাই বলবো। ব্যর্থ বলবো না। সামগ্রিক পরিস্থিতির পটভূমিসহ বলা যায় যে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বিষয়ে সফল হয়েছিলেন। এমনকি বর্তমান সেনাবাহিনীর কাঠামোও তাঁর শাসনামলে তৈরী। ভিত্তিতো সেখান থেকেই। বলতে হবে, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে গড়ে তুলতে তিনি যথেষ্ট সফল হয়েছিলেন।

আমি বঙ্গবন্ধুর কথা সব সময়েই স্মরণ করি। যতদিন পর্যন্ত তিনি বঙ্গবন্ধু হিসেবে স্বীকৃতি না পাবেন ততদিন আমি মানসিকভাবে স্বস্তি পাবো না। তাঁরই আহ্বানে আমি এবং আমার সহকর্মীরা জীবনের সকল ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। ব্যক্তিগতভাবেও আমি তাঁর স্নেহভাজন ছিলাম। এখনও বহু স্মৃতি ভীড় জমায় মনে। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

## ৩০. পরিশিষ্ট

## ব্যর্থতার দায়ভার আমার উপর চাপানো হয়েছে
## মেজর জেনারেল (অব.) সফিউল্লাহ-র সাক্ষাৎকারের জবাবে কর্নেল (অব.) শাফায়াত জামিল

১.১৫ এবং ১৬ আগস্ট তারিখের 'ভোরের কাগজ'–এ মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ সাহেবের বিশেষ সাক্ষাৎকারটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। '৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আমি ঢাকা পদাতিক ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলাম। সাক্ষাৎকারে সাবেক সেনাপ্রধান সুকৌশলে তার সার্বিক ব্যর্থতার দায়ভার আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। জাতীয় সঙ্কট মোকাবিলায় তার ব্যর্থতা ও বিতর্কিত ভূমিকা রহস্যাবৃত করে উদোরপিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি আমার বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন। বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ না করে অহেতুক কালক্ষেপণ করা হয় এবং পরবর্তীকালে চাপের মুখে অগণতান্ত্রিক, অবৈধ এবং সংবিধান লংঘনকারী মোশতাক সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। জনমনে বিভ্রান্তি দূরীকরণ এবং সঠিক ইতিহাসের প্রয়োজনে আমার এই প্রয়াস।

২. আলোচ্য দিনক্ষণে ঢাকায় মোতায়েন তৎকালীন সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর ইউনিটগুলো এবং একমাত্র ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টটি সেনাপ্রধানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। এগুলোর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই ছিল না। তবে অংশগ্রহণকারী গোলন্দাজ রেজিমেন্টটি আমার অধীনস্থ ছিলো।

৩. তৎকালীন সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর বিদ্রোহের আগাম পূর্বাভাষ জানাতে এবং তা উদ্‌ঘাটন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। আমার ব্রিগেডের অধীন কোনো গোয়েন্দা ইউনিট ছিলো না। যে কোনো পরিস্থিতি সম্পর্কে খবরাখবর জানার জন্য সেনাসদরের উপরই নির্ভর করতে হতো। বিদ্রোহ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পরই আমাকে অবহিত করানো থেকে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সর্বস্তরে ষড়যন্ত্রটিকে আড়াল করার একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা বিদ্যমান ছিল। সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর এই বিশাল ব্যর্থতার দায়ভার সাবেক সেনাপ্রধানকে এককভাবে বহন করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

৪. কথার মালা সাজিয়ে অনেক অসত্য কথার অবতারণা করে প্রাক্তন

সেনাপ্রধান আমাকে 'excape goat' বানাতে চাচ্ছেন। প্রকৃত ঘটনা হলো, ১৫ আগস্ট আনুমানিক সকাল ছয়টায় তিনি আমাকে ফোন করেন এবং বলেন, "তুমি কিছু জান নাকি বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে কারা ফায়ার করছে? উনিতো আমাকে বিশ্বাস করলেন না... আমাকে বিশ্বাস করলেন না।" মানসিকভাবে জনাব সফিউল্লাহ বিপর্যস্ত হয়েছিলেন বলে আমার ধারণা। এ কারণে বিরক্তিকরভাবেই একই কথার পুনরাবৃত্তি টেলিফোনে করছিলেন। কোনো নির্দেশ, কোন উপদেশ অথবা দিক-নির্দেশনা তিনি তখন দেননি বা দিতে পারেননি। একবারই ত সঙ্গে আমার কথা হয়েছিলো টেলিফোনে।

৫. লে. কর্নেল সালাহউদ্দিন, তদানীন্তন ডিএমআই, পরবর্তীকালে আমার বিরুদ্ধে এক কোর্ট অব ইনকোয়ারীতে সাক্ষাৎদানকালে তার জবানবন্দীতে দাবী করেন যে, তিন (ডিএমআই) ভোর প্রায় ৪-৩০ মিনিটে সেনাপ্রধানকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন এবং শহরে ট্যাঙ্ক ও সৈন্য চলাচলের বিষয়টি উদ্বেগের সঙ্গে অবহিত করেন। তার ভাষা অনুযায়ী, সেনাপ্রধান তার উপস্থিতিতেই ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত প্রায় সমস্ত ইউনিট কমান্ডারদের সাথে একের পর এক কথা বলেন (এদের মধ্যে আমার অধীনস্থ ইউনিট কমান্ডাররাও ছিলেন) এবং সর্বশেষ কথা বলেন আমার সঙ্গে (অধিনায়ক ৪৬ ব্রিগেড)। সেই দুর্যোগ মুহূর্তে ত্বরিত সিদ্ধান্ত না নিয়ে ঘটনা যাচাই করার নামে কালক্ষেপণের উদ্দেশ্য কি ছিল, জনাব সফিউল্লাহ সাহেবই তার যথার্থ উত্তর দিতে পারবেন।

৬. বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক যথাযথ ব্যবস্থা না নিয়ে এইভাবেই আনুমানিক ১ থেকে দেড় ঘণ্টা মূল্যবান সময়ের অপচয় হয়। ফলে জাতির পিতার জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আমাকে যখন জেনারেল সফিউল্লাহ ফোন করেন তখনতো সবই শেষ। বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারের সকল সদস্যকে অত্যন্ত নির্মম এবং কাপুরুষোচিতভাবে হত্যা করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। চরম দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরই আমাকে অবহিত করা হয়। আমাকে সতর্ক করতে এই দীর্ঘ অহেতুক বিলম্বের জন্যই রাষ্ট্রপতিকে রক্ষার্থে সময়মতো ফোর্স পাঠিয়ে সাহায্য করার কোনো সুযোগই আমার ছিল না। এই চরম ব্যর্থতার দায়ভার আমার নয় কোনোমতেই, দায়ভার তাদেরই যারা নিজেরাতো কিছুই করেনি উপরন্তু আমাকে সতর্ক করতেও অহেতুক বিলম্ব করেছিলেন।

৭. সেনাবাহিনীর প্রধানের ফোন পাওয়ার সামান্য কিছু আগে বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা মেজর রশীদ সশস্ত্র বিদ্রোহী যান্ত্রিক সেনাদলের সঙ্গে আমার বাসায় এসে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন। মেজর রশীদ আমার অধীনস্থ আর্টিলারী রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন এবং তারই ইউনিটের সৈন্যরা ঐ দিন আমার বাসা পাহারায় নিয়োজিত ছিল। মেজর রশীদ দাবী করেন যে, তারা খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছেন, প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব নিহত

হয়েছেন এবং আমি যেন ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো বিরোধিতামূলক পাল্টা ব্যবস্থা না নেই। প্রেসিডেন্ট যেহেতু নিহত হয়েছেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তারা দখল করেছেন, কোনো পাল্টা ব্যবস্থা গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি করবে বলেও হুশিয়ারি উচ্চারিত হলো। তাদের উপস্থিতির সময়েই আমি সেনাপ্রধানের টেলিফোন পাই, যা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

৮. বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে আমি আমার অধীনস্থ ১, ২ এবং ৪ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেই। উল্লেখ্য যে, ব্যারাকে শান্তিকালীন সময় বিশ্রামরত কোনো ইউনিটকে অভিযানে প্রস্তুত করতে কমপক্ষে দুই ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন। এরপর আমি আমার ব্রিগেড সদর দফতরের দিকে রওয়ানা দেই। পথে উপ স্টাফ প্রধান লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসভবনে যাই তার পরামর্শ এবং সঠিক দিকনির্দেশনার জন্য। তিনি তখন অর্ধেক শেভরত অবস্থায় ছিলেন। আমার কাছ থেকে পরিস্থিতি শোনার পর তিনি বললেন, "President is dead so what? Vice President is there, you should uphold the sanctity of the constitution, Get your toops ready immediately." জেনারেল জিয়ার বাসভবন থেকে আমি ফার্স্ট বেঙ্গলের ইউনিট লাইনে তাদের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণের জন্য গেলাম এবং আশ্চর্য হয়ে দেখতে পেলাম, বেশ কয়েকটি ট্যাঙ্ক আমার ব্রিগেড সদর দফতরের ১০০ গজের মধ্যে দুই ইনফ্যান্টি ব্যাটালিয়নের মধ্যবর্তী স্থানে পজিশনে রয়েছে। আমার ব্রিগেড সদর দফতরের সামনে আরও দুটি ট্যাঙ্ক অবস্থান করছে। জানতে পারলাম, প্রয়োজনবোধে আমার ব্রিগেড এলাকায় কামানের গোলা নিক্ষেপের জন্য মীরপুর ফিল্ড রেজিমেন্টের আর্টিলারী গানগুলো প্রস্তুত রয়েছে। ট্যাঙ্কগুলোতে যে কামানের গোলা ছিল না তা আমাদের জানার কথা নয় এবং সেদিন দুপুর পর্যন্ত তা অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছিল। জানতে পারলাম যখন বঙ্গভবনে অবস্থিত সেনাপ্রধানের নির্দেশে সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ দুপুরের দিকে রাজেন্দ্রপুরে অবস্থিত ordnance-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারকে গোলা সরবরাহের নির্দেশ দেন।

৯. আনুমানিক সকাল সাড়ে সাতটায় জিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সেনাপ্রধানের নির্দেশে ফার্স্ট বেঙ্গলে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হলেন। তার আগমনের সাথে সাথে ৪৬তম ব্রিগেডের সকল ইউনিট অধিনায়কগণ সেনাবাহিনীর প্রধানের পক্ষে সিজিএস-এর কাছ থেকে নির্দেশ পেতে শুরু করেন। তখন থেকে সমস্ত কর্মকাণ্ড সিজিএস–এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতে লাগলো।

১০. সংবিধান সমুন্নত রাখতে বিদ্রোহ দমনের সকল প্রস্তুতি আমরা অতি দ্রুততর সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলাম। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ প্রস্তুতি যখন প্রায় শেষ, তখন প্রত্যাশা ছিল যে, বিমানবাহিনীর সহায়তায় বিদ্রোহ দমনে একটি যৌথ আন্তঃ বাহিনী অভিযান সেনাসদরের তত্ত্বাবধানে সঙ্গত কারণেই পরিচালনা করা

হবে। ট্যাঙ্ক বাহিনীর বিরুদ্ধে পদাতিক সেনাদল এককভাবে কখনই আক্রমণাত্মক যুদ্ধ মোকাবিলা করে না। পদাতিক সেনাদলের সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রয়োজন অনুগত বিমান অথবা ট্যাঙ্ক বাহিনীর।

১১. অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বিদ্রোহ দমনের কোনো যৌথ পরিকল্পনা সেনাপ্রধানের তত্ত্বাবধানে সেদিন সকালে করা হলো না। পক্ষান্তরে সারাজাতিকে স্তম্ভিত করে সেনাবাহিনীর প্রধান একটি অবৈধ, অগণতান্ত্রিক, শাসনতন্ত্র বহির্ভূত, খুনী সরকারের প্রতি বেতারে তার সমর্থন ও আনুগত্য ঘোষণা করে বিদ্রোহ দমনে আমাদের সকল প্রস্তুতি সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর ও অচল করে ফেলেন। বেতার ভবনে যাওয়ার পথে তিনবাহিনী প্রধান, উপস্টাফ প্রধান, মেজর ডালিম ও অন্য কয়েকজন অফিসারের এক বিরাট কনভয় ক্ষণিকের জন্য ফার্স্ট বেঙ্গলে আসে এবং সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে সাথে করে নিয়ে যায়।

১২. ১৯ আগস্ট সেনাপ্রধান সেনাসদরে এক কনফারেন্সের জন্য ঢাকায় অবস্থিত সিনিয়র অফিসারদের তলব করেন। সেখানে তিনি মেজর রশীদ ও ফারুককে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট মোশতাকের নির্দেশে রশীদ/ফারুক অভ্যুত্থানের বিশদ ব্যাখ্যা সিনিয়র অফিসারদের কাছে রাখবেন। রশীদ কথা বলা শুরু করেন এবং বলেন, সেনাবাহিনীর সব সিনিয়র অফিসার এই অভ্যুত্থানের কথা আগে থেকেই জানতেন, এমনকি ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডাররাও। তিনি দাবী করলেন যে, প্রত্যেকের সঙ্গে তাদের আলাদা আলাদা সমঝোতা হয়েছে পূর্বেই। তখন উপস্থিত কেউ এর প্রতিবাদ করলেন না। একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না কেউই। ইতিহাস সাক্ষী, আমার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মুখে কনফারেন্সের ইতি সেখানেই টানা হলো। তারা ফিরে গেলেন। সকলের উপস্থিতিই আমি সেদিন তাদের মিথ্যা দাবী নাকচ করে বলেছিলাম, "You are all liars, mutineers and deserters, you are all murders. Tell your Moshtaque that he is an unsurper and a consipirator. He is not my president. In my first opportunity I shall dislodge him and you all will be tried for your crimes." জীবন বাজি রেখে আমি আমার কথা পরবর্তীকালে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। সে আর এক অধ্যায়।

১৩. ২৪ আগস্ট '৭৫ জনাব সফিউল্লাহ সাহেবকে প্রেষণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হলো। রেডিওতে ঘোষণা শুনে তাকে বলেছিলাম, অবৈধ সরকারের অবৈধ আদেশ মানতে তিনি বাধ্য নন। তাকে এই আদেশ অমান্য করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি রাজি হলেন না বরং বললেন, "আমার কথা কি কেউ শুনবে?"

১৪. অপ্রাসঙ্গিক হলেও আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই সকলের অবগতির জন্য। লে. কর্নেল হামিদ তার বইয়ে অনেক মিথ্যাচারের মাধ্যমে

বঙ্গবন্ধুর হত্যার সঙ্গে তদানীন্তন সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদকারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন এবং মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের প্রতি বিরূপ প্রক্রিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এ কাজটি তিনি করেছেন। হামিদ সাহেব জনাব সফিউল্লাহর কোর্স মেট। মুক্তিযুদ্ধের পরই তিনি পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরে আসেন। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের প্রতি তার বৈরী মনোভাব এবং ঈর্ষান্বিত আচরণের জন্য তখন তিনি যথেষ্ট সমালোচিতও হয়েছিলেন। '৭৫-এর পট পরিবর্তনের সাথে সাথে তার পদ ও পদমর্যাদা দুটোই বৃদ্ধি পায়। খন্দকার মোশতাকের প্রতি তার আনুগত্যের আতিশয্যে তিনি আমাকে 'Firing Squad'-এ পাঠানোর নিস্ফল প্রয়াস চালান। কর্নেল হামিদের এহেন মানসিকতার নমুনা কিছুটা হলেও পাওয়া যাবে আমার বিরুদ্ধে তার স্বাক্ষরিত চার্জশীট থেকে। লক্ষণীয় যে, প্রথম ৪টি চার্জ সামরিক বিধান অনুযায়ী কোর্ট মার্শালে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ।

১৫. হামিদ সাহেবের বানোয়াট ও মিথ্যাচারের আরেকটি নমুনা। রক্ষীবাহিনীর কর্নেল সাবিউদ্দিন ও ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের কথিত টেলিফোন সংলাপ একটি নির্জলা মিথ্যা এবং কল্পিত মনগড়া কাহিনী। খালেদ মোশাররফকে হেয় করার উদ্দেশ্যেই তিনি এটার জন্ম নিজেই দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সাবিউদ্দিনকে ১৫ তারিখ সকালে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তিনি তখন উত্তর বঙ্গে অবস্থান করছিলেন। সাবিউদ্দিনের অবর্তমানে জনৈক মেজর অবদুল হাসান ঐ দিন বাকি প্রধানদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর পক্ষে মোশতাকের প্রতি রেডিওতে আনুগত্যের ঘোষণা দেন।

১৬. আমার ধারণা, আমার এই বক্তব্যে দেশবাসীর সকল প্রশ্নের উত্তর পেতে সহায়ক হবে। ভাবাবেগ পরিহার করে জেনারেল সফিউল্লাহ সত্য ও যুক্তির আশ্রয় নেবেন, অনর্থক অন্যের প্রতি কালিমা লেপন করা থেকে বিরত থাকবেন—এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

## ৩১. পরিশিষ্ট

## নিজের দায়িত্বের ব্যর্থতা কারো ঘাড়ে চাপাইনি
## কর্নেল (অব.) শাফায়াত জামিলের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে
## মেজর জেনারেল (অব.) সফিউল্লাহ

গত ১৫ ও ১৬ আগস্ট ভোরের কাগজে প্রকাশিত আমার সাক্ষাৎকারটির কিছু মন্তব্য প্রসঙ্গে কর্নেল শাফায়াত জামিল কিছু বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর বক্তব্যের সূত্র ধরেই আমি কিছু মন্তব্য করতে চাই।

কর্নেল (অব.) শাফায়াত জামিল ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫–এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সব ব্যাপারে তিনি আপত্তি বা ভিন্ন তথ্য উত্থাপন করেছেন এবং আমাকে দোষারূপ করেছেন সেগুলো নিম্নরূপ

১. ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সকল দায়ভার সেনাপ্রধান তার (কর্নেল জামিলের) ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন।

২. সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ বিদ্রোহের আগাম পূর্বভাষ জানাতে ব্যর্থ হয়েছে। তার সকল দায়-দায়িত্ব সেনাপ্রধানকেই নিতে হবে।

৩. ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট সেনাপ্রধানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো এবং গোলন্দাজ রেজিমেন্ট ঢাকা ব্রিগেডের অধীনস্থ ছিল।

৪. তৎকালীন ডিএমআই লেঃ কর্নেল সালাহউদ্দিন ১৫ আগস্ট '৭৫–এর ভোর ৪–৩০ মিনিটে সেনাপ্রধানকে খবর দিয়েছিলেন।

৫. সেনাপ্রধান সেদিন দেড় ঘণ্টা সময় অপচয় করে তারপর বিদ্রোহের কথা তাকে (কর্নেল জামিল) জানায়।

৬. সেনাপ্রধানের টেলিফোন পাওয়ার আগেই নাকি বিদ্রোহীদের নেতা মেজর রশিদ এসে তাকে জানান যে, প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব নিহত হয়েছেন।

৭. বিদ্রোহ প্রতিরোধে সেনাপ্রধান সময়োচিত পদক্ষেপ নেননি।

৮. বিদ্রোহ মোকাবিলার জন্য ১,২ এবং ৪ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে তিনি (কর্নেল জামিল) নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৯. কর্নেল জামিল তার দফতরের সামনে দুটি ট্যাঙ্ক দেখতে পান এবং জানতে পারেন যে মিরপুর থেকে গোলন্দাজ বাহিনী তার এলাকায় গোলাবর্ষণ করতে প্রস্তুত।

১০. চাপের মুখে অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক সরকারের আনুগত্য স্বীকার করেছেন তৎকালীন সেনাপ্রধান।

১১. সেনাপ্রধান এখন তাকে 'escape goat' বানাতে চাইছেন। আগস্টের বিদ্রোহ দমনে সেদিন তিনি তাকে কোনো নির্দেশ দেননি।

১২. ট্যাঙ্কগুলোর মধ্যে গোলা ছিল না। ১৫ আগস্টের দিন তাদের গোলা সরবরাহ করা হয়। চীফ অফ জেনারেল স্টাফ খালেদ মোশাররফ সেনাপ্রধানের নির্দেশেই ঐদিন গোলা সরবরাহ করেছিলেন।

১৩. সেনাপ্রধান সেদিন কোনো যৌথ পরিকল্পনা নিতে পারেননি। বরং অবৈধ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

১৪. ১৯ আগস্ট সেনাসদরে সম্মেলনে কর্নেল জামিলের প্রতিবাদ।

১৫. ২৪ আগস্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেষণে আমাকে যেতে তিনি নিষেধ করেছিলেন।

১৬. পরিশেষে লেঃ কর্নেল হামিদের বই সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য।

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোতে কর্নেল শাফায়াত জামিলের বক্তব্যের উপর আমার মন্তব্য হলো ঃ

১। আমার নিজের দায়িত্বের ব্যর্থতা শাফায়াত জামিল বা অন্য কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার হীন মনোবৃত্তি আমার কখনো ছিল না এবং এখনো নেই। তবে শাফায়াত জামিল তার নাতিদীর্ঘ বক্তব্যের অনেক জায়গায় আমাকে দুর্বলচিত্ত ও কাপুরুষ প্রতীয়মান করার চেষ্টা করেছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যে জঘন্য ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনার দায়িত্ব আমি কখনো এড়াতে চাইনি এবং তা কখনো এড়াতে পারবো না। কারণ সেদিন যারা এই জঘন্য ও নির্মম ঘটনা ঘটিয়েছিল তারা সেনাবাহিনীর সদস্য ছিল এবং আমি, তখন সেনাপ্রধান। সেদিনের ঐ ঘটনার দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছি বলে শাফায়াত জামিল যে বক্তব্য রেখেছেন তা সত্য নয়। কর্নেল শাফায়াত তার বক্তব্যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমাকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন।

২। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সামরিক গোয়ন্দা বিভাগ কিভাবে পরিচালিত হতো সে সম্পর্কে কিছু মন্তব্য আমার সাক্ষাৎকারের প্রথমাংশে রয়েছে। তবুও সকলের জ্ঞাতার্থে এতটুকুই বলবো যে, শুধু গোয়েন্দা বিভাগ নয়, পুরো সেনাবাহিনীই তখন পরিচালিত হচ্ছিলো এ্যাডহক ভিত্তিতে। তৎকালীন সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ সমগ্র পরিস্থিতি বিশেষকরে, গভীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পুরো তথ্য উদ্‌ঘাটনে যে সক্ষম ছিল না, সেটা তৎকালীন সরকারের অজানা ছিল না। এই সংস্থাকে আরো শক্তিশালী ও দক্ষ করার প্রচেষ্টা আমি গ্রহণ করেছিলাম, যার সাক্ষ্য দিতে পারেন তৎকালীন প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী। যেহেতু এই সংস্থা সামরিক বাহিনীর অধীনে এবং তারা সময়মতো ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে ও

জানাতে পারেনি। তাই এর দায়ভার আমার নিতে কোনো দ্বিধা নেই। সেজন্য এর ভিতরের যে দুর্বল দিকটি ছিল, আমি সেই দিকটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। আমি আবার বলতে চাই যে, সামগ্রিকভাবে সামরিক বাহিনী বিশেষকরে, গোয়েন্দা বিভাগকে আরো সংগঠিত করার যে প্রচেষ্টা আমি নিয়েছিলাম সেটা হলে ১৫ আগস্টের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অগ্রিম তথ্য এবং কিছু ব্যবস্থা নেয়া হয়তো সম্ভব হতো। তারপরও ডিজিএফআই বিগেঃ রউফ (যিনি সরাসরি প্রেসিডেন্টের অধীনস্ত ছিলেন) যতটুকু অবহিত হয়েছিল, সেটাও আমাকে জানাননি তিনি। এই পরিস্থিতিতে আমার অবস্থা হয়েছিল একজন মুষ্টিযোদ্ধাকে চোখ, কান বন্ধ করে বক্সিং রিং-এ ছেড়ে দেয়ার মতোই।

৩। ট্যাঙ্ক এবং গোলন্দাজ রেজিমেন্ট সম্পর্কে কর্নেল শাফায়াত জামিল যে বক্তব্য রেখেছেন সে সম্পর্কে আমি শুধু বলবো, তখন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে একটি মাত্র ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট ছিল। এই রেজিমেন্ট প্রশিক্ষণের জন্য চীফ অফ জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অধীনে ছিল। প্রশাসনিক দিক থেকে লজিস্টিক এরিয়ার অধীনে ছিল। আর, গোলন্দাজ রেজিমেন্টটি ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডের অধীনে ছিল। সমগ্র সেনাবাহিনী সেনাপ্রধানের অধীনে ঠিকই কিন্তু এই দুটি রেজিমেন্ট ছিল সরাসরি দুই কমান্ডারের অধীনে। এ দুটি রেজিমেন্ট মাসে দুবার বৃহস্পতি/শুক্রবার নৈশকালীন প্রশিক্ষণে বাইরে যেতো। সে অনুমতি তাদের ছিল। এবং তাদের কার্যকলাপ সেনাপ্রধানের জানার পূর্বে এই দুই কমান্ডারের জানার কথা। এদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের দায়িত্বভার সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে আমার উপরে যতটুকু বর্তায় তার চেয়ে কম দায়ভাগ দুই কমান্ডারের ছিল না। বরং বেশিই ছিলো; কারণ তারাই ছিলেন সরাসরি দায়িত্বে নিয়োজিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৪/১৫ আগস্ট রাতে ছিল সেই বৃহস্পতিবার/শুক্রবার রাত। তাই এই রাতে এই দুই রেজিমেন্টের গতিবিধি সম্পর্কে কোনো সন্দেহ দেখা দেয়নি কারো মধ্যে। সবাই ধরে নিয়েছিল এ রাতেও তারা ট্রেনিং-এ বেরিয়েছে।

৪। লে. কর্নেল সালাউদ্দিন আহমেদ আমাকে অভ্যুত্থানের খবর ভোর সাড়ে চারটার সময় দেয় বলে কর্নেল জামিল যা বলেছেন, সেটা সঠিক নয়। কেননা তিনি আমাকে ফজরের নামাজের পর ঘুম থেকে উঠিয়ে এ খবর দিয়েছেন। অন্যদিকে ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম নেতা মেজর ফারুকের এক সাক্ষাৎকার (বাংলাবাজার পত্রিকা, ১৫ আগস্ট ১৯৯২) থেকে জানা যায় যে, ট্যাঙ্কগুলো যখন বের হয় তখন ক্যান্টমেন্টের সেন্ট্রাল মসজিদে ফজরের আজান হয়ে গেছে। যদিও ট্যাঙ্ক বাহিনীর প্রতি নির্দেশ ছিল সাড়ে চারটায় বের হওয়ার। এই বক্তব্য যদি সত্য হয় তাহলে ডিএমআই প্রধানতো কোনোভাবেই সাড়ে চারটায় আমাকে খবর দিতে পারেন না।

৫। ডিএমআই আমাকে খবর দেয়ার পর প্রথম যার সাথে আমি কথা বলি, তিনি ছিলেন ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল। সে সময়ে যদিও

আমি ঘড়ি দেখিনি, তবুও বলবো, তখন সময় ছিল খুব সম্ভবতঃ ৫টা বেজে ৩০ বা ৪০ মিনিট। আমি তার সঙ্গে যখন কথা বলছি, তখন আমার মনে হচ্ছিলো আমি যেন তাকে ঘুম থেকে উঠিয়েছি। কর্নেল শাফায়াত জামিলের বক্তব্যে আমি দেড় ঘন্টা সময় অপচয় করেছি বলে যে কথা বলা হয়েছে, সেটা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর এবং দুঃখজনক।

৬। কর্নেল শাফায়াতের দেয়া বক্তব্য থেকে জানা গেলো যে, সেনাপ্রধানের টেলিফোন পাওয়ার আগেই ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম মেজর রশীদ এসে তাকে বঙ্গবন্ধুর নিহত হওয়া এবং খন্দকার মোশতাকের ক্ষমতা গ্রহণের খবর জানায়। যদিও এর আগের একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন যে, মেজর রশীদ এসে তার ঘরে ঢুকে বলে, "We have Killed Shekh Mujib"। এখানে প্রশ্ন হলো, কর্নেল শাফায়াত এই খবর যদি আগেই জেনে থাকেন তাহলে তা সেনাপ্রধানকে জানাননি কেন এবং তিনি দ্রুত এর বিরুদ্ধে কোনো রকম ব্যবস্থা নেননি কেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যার খবর পেয়েও এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া কি একজন দায়িত্বশীল কমান্ডারের কর্তব্য ছিল না? এ কথা শোনার পরও কি কোনো নির্দেশের প্রয়োজন ছিল? (যদিও আমি সর্বপ্রথম তাকেই যোগাযোগ করি এবং প্রতিরোধের নির্দেশ দিই)। সেদিন অতি প্রত্যুষে যদি আমি কোনো নির্দেশ না দিয়ে থাকি, তাহলে সে সময়ে আমি তাকে কেন টেলিফোন করেছিলাম?

৭। সেনাবাহিনীর প্রধান নিষ্ক্রিয় ছিলেন বা সময়োচিত পদক্ষেপ নেননি বলে কর্নেল জামিল উল্লেখ করেছেন। আসলে সেনাপ্রধান হিসেবে আমি সেদিন সকালে কি প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম সে সম্পর্কে 'ভোরের কাগজ'–এ দেয়া আমার সাক্ষাৎকারে বিস্তারিত বলেছি। তবুও সংক্ষেপে আবার বলা যায় যে, আমি প্রথমে কর্নেল শাফায়াত জামিলকে বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেই। তাকে নিষ্ক্রিয় দেখে সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে ৪৬ ব্রিগেডকে সক্রিয় করতে পাঠাই ও পরে নিজেও সেখানে যাই এবং গিয়ে দেখি পুরো গ্যারিসন আনন্দে মেতে উঠেছে। দেখে আমার মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া হয় এবং তখন অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে।

৮। বিদ্রোহ মোকাবিলায় কর্নেল জামিল যদি ১ম, ২য় এবং ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে তারা সে নির্দেশ পালন করেনি কেন? তাহলে কি এটা বলা যায় না যে, তারই অধীনস্থ সৈন্যরা তার নির্দেশ মানেনি। শুধু তাই নয়, তারা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল।

৯। এই তথ্য কি এটা প্রমাণ করে না যে, সে কারণে কোনো রকম ব্যবস্থা নেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি বা নিতে তিনি সাহস পাননি।

১০। আমার সাত নাম্বার বিষয়ে আলোচনা এবং পূর্বের সাক্ষাৎকার থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেদিন আমাকে কোন অবস্থায় সমগ্র পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছিল। আজকে সেদিনের ঘটনাবলি নিয়ে বহু পর্যালোচনা বা বিতর্ক করা যায়।

কিন্তু সেদিন সকালের সকল ঘটনা, বিশেষকরে, সামরিক বাহিনীর ভেতরের যে অবস্থা ছিল, তাতে অন্য কোনো বিকল্প আমার মাথায় আসেনি। তাছাড়া, বঙ্গবন্ধু তখন নিহত, জীবিত অন্য কেউ বা কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্বও প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে এগিয়ে আসেননি সেদিন। ঢাকা গ্যারিসনের অবস্থা ছিল প্রতিকূল, তারা বিদ্রোহীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছিল। সে অবস্থায় অন্য কি বিকল্প ছিল? যে কোনো রকম প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা কি দেশকে আরো রক্তপাত বা গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতো না? এটা কি দেশের জন্য কোনো মঙ্গল বয়ে আনতো? সর্বোপরি সে সময় দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে এ ধরনের যে কোনো উদ্যোগ কি ফলপ্রসূ হতো? তাহলে ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান সফল হলো না কেন? পরে ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলি আমাদের জন্য কি অভিজ্ঞতা বয়ে নিয়ে এলো?

১১। আমার সাক্ষাৎকারে সেনাপ্রধান হিসেবে আমি সেদিনের ঘটনা ও পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছি। আমি ব্যক্তিগত আক্রোশবশতঃ কোনো মন্তব্য করিনি। তাকে escape goat করার কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই আর কর্নেল জামিলের বিরুদ্ধেও আমার কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই। আমার সাক্ষাৎকার তার ব্যাপারে শুধু নিষ্ক্রিতার কথা বলেছি। সেদিন তাকে যেভবে দেখেছি সেভাবেই আমি মন্তব্য করেছি। সে ব্যাপারে তিনি ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। সে সময় সেনাবাহিনীর ভিতরে যে অবস্থা ছিল তাতে তার পক্ষে অন্য কোনো ভূমিকা নেয়া কি সম্ভব ছিল বলে তিনি মনে করেন?

১২। চীফ অফ জেনারেল স্টাফ খালেদ মোশাররফ সেনাপ্রধানের নির্দেশে বিদ্রোহীদের শূন্য ট্যাঙ্কে গোলা সরবরাহ করেছেন বলে কর্নেল জামিল যা বলেছেন সেটা সত্য নয়। আসলে খালেদ মোশাররফ আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলেই ১৫ আগস্ট ট্যাঙ্কের জন্য গোলা সরবরাহ করেন এবং ১৭ আগস্ট আমাকে তা জানান।

১৩। সেদিন যৌথ পরিকল্পনা করিনি বলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন কর্নেল জামিল। প্রশ্ন হলো, কাকে নিয়ে যৌথ পরিকল্পনা করবো? কর্নেল জামিল নিষ্ক্রিয় থাকলেন (যে কোনো কারণেই হোক) অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও কিংকর্তব্যবিমূঢ়) ঢাকা গ্যারিসনের মধ্যে আনন্দ-উল্লাস, সে অবস্থায় কাকে নিয়ে যৌথ পরিকল্পনা করবো? তারপরও আমি সেদিন সকালে কর্নেল জামিলসহ সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। নির্দেশ দিয়েছি, কিন্তু উদ্যোগও নিয়েছিলাম, কিন্তু কোনো কিছুই করা যায়নি।

১৪। সেদিন সেনাসদরে বৈঠকের ব্যাপারে কর্নেল জামিল যা বলেছেন তা আংশিক সত্য। সেদিনের বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনীতে 'চেইন অফ কমান্ড' ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে একটি যৌথ সিদ্ধান্তে পৌছানো। বৈঠকে এ ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের পরই মেজর রশীদ ও ফারুককে ঐ বৈঠকে ডাকা

হয়েছিল তাদের এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়ার জন্য। তাদের বৈঠকে আসার জন্য সিজিএস খালেদ মোশাররফের মাধ্যমে খবর দেই তাদেরকে বৈঠকে নিয়ে ঢুকি বলে কর্নেল জামিল যা বলেছেন সেটা সঠিক নয়। তাদেরকে বৈঠকের বাইরে অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের প্রাথমিক ব্রীফিং দেয়া পর্যন্ত। তাদেরকে বৈঠকে ডাকার উদ্দেশ্য ছিল সকলের সামনে সেনাক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে সম্মত করানো। তাদের সামনে আলোচনা শেষে যুক্তিসঙ্গত আলোচনার মাধ্যমে যখন সেনাবাহিনীতে 'চেইন অফ কমান্ড' পুনঃ প্রতিষ্ঠার আলোচনার সময় কর্নেল জামিল তাদের বিরুদ্ধে ঐ কথাগুলো বলেন, যা তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন তার ফলে সেদিনের বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায় বলে তখনই আমি উপলব্ধি করি। তারপর তারা আর ফিরে আসেনি।

১৫। এ ব্যাপারে সত্য ঘটনা হলো যে, সেনাপ্রধানের পদ থেকে আমাকে অপসারণ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেষণে প্রেরণের সিদ্ধান্ত আমি জানার পর সেনাভবনে ফিরে এসে এ বিষয়টি প্রথম কর্নেল জামিলকে অবহিত করি। সমগ্র পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করি। তিনি সব শুনে বললেন, এ ব্যাপারে এখন আমাদের কিছু করার নেই। তিনি আমাকে অবৈধ সরকারের অবৈধ আদেশ মানতে বাধ্য নন' বলে যে কথার উল্লেখ করেছেন সেটা আদৌ সত্য নয়।

১৬। ১৫ আগস্ট প্রসঙ্গে লে. কর্নেল হামিদ কি লিখেছেন, সেটাতো আমার জানার বিষয় নয়। আমার সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গেও সে কথা আসে না।

সব শেষে আমি এ কথা বলতে চাই যে, '৭৫-এর ১৫ আগস্ট যে ঘটনা ঘটেছে, সে ব্যাপারে সেনাপ্রধান হিসেবে আমার দায়িত্ব এড়াতে পারি না। আজকে সেদিনের ঘটনা বর্ণনা বা পর্যালোচনায় অনেকেই অনেক কথা বলতে পারেন, কিন্তু তৎকালীন ঘটনাকে বিবেচনায় নিতে হবে। আর একটি কথা হলো, কারো, বিরুদ্ধেই আমার কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ বা বিদ্বেষ নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। আমি চাই যে, অন্যরাও যাতে আমার বিরুদ্ধে অসত্য বলে জনসমক্ষে আমাকে নিন্দনীয় বা হেয় না করে তোলেন। ১৫ আগস্টের ঘটনাবলি, বিশেষকরে বঙ্গবন্ধুর সপরিবারের নিহত হবার মতো নৃশংস ঘটনা যতোদিন আমি বেঁচে থাকবো তা আমাকে তাড়িত করবে। জীবনে আমি কখনো শান্তি পাবো না। অত্যন্ত দুঃখজনক সেই ঘটনাকে আমি ভুলতে পারবো না।

## ৩২. পরিশিষ্ট

### তদানীন্তন বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) খলিলুর রহমানের সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন : আপনি কখন শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু খবর পান?

উত্তর : ১৯৭৫ সালে আমি বি ডি আর এ ছিলাম মহাপরিচালক হিসেবে। ঐ দিন (১৫ আগস্ট, '৭৫) খুব ভোরে গোলাগুলির আওয়াজ আসে। আমার বাসা পিলখানা বি, ডি, আর হেড কোয়ার্টারসে। তখন হোম মিনিস্টার ছিলেন মনসুর আলী সাহেব। তিনি আমার ঘুম ভেঙে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই টেলিফোন করেন। টেলিফোনে তিনি আমাকে জানান যে, কিছু বিভ্রান্ত পোশাকধারী লোক রেডিও হাউস দখল করেছে বা করার চেষ্টা করছে। আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

তারপর আমি আমার লোকদের রেডিও, হাউস যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেবার কথা বলি। তবে সেদিকে যাবার আগে বিরাজমান অবস্থা জানা প্রয়োজন তাই যাবার আগে আমার কাছে আবার জিজ্ঞাসা করতে বলে দিয়েছিলাম আমার লোকদের। তবে তখনও বুঝতে পারিনি যে, বঙ্গবন্ধু ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছেন। তখনও সকাল হয় নাই। বেলা উঠল আমি শেভ–টেভ করে অফিসে গেলাম। আমি অবস্থা বোঝার জন্য খবর নিতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে টেলিফোন এল (তখন ব্রিগেডিয়ার) দস্তগীর সাহেবের বাসা থেকে তিনি তখন চিটাগাংয়ের ব্রিগেড কমান্ডার। তার স্ত্রী বললেন যে, দস্তগীর সাহেব শুনেছেন যে বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন। পোশাকধারী কিছু লোক তার বাসায় গিয়ে গোলাগুলি করেন। দস্তগীর সাহেব নাকি বেতারে গিয়ে ঘোষণা করতে চান তাঁরা (তৎকালীন) সরকার ও সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। দস্তগীর সাহেব টেলিফোনে আমার মতামত জানতে চান। তাঁকে আমি বললাম ঢাকার খবর একটু ভাল করে নিয়ে আমি আমার মতামত জানাব। আমি তখন ৩২ নাম্বার রোড বঙ্গবন্ধু হত্যার খবর কনফার্ম করার জন্য আমার ফোর্সকে বলি। জানা গেল বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার খবর সাময়িকভাবে আমাদের অভিভূত করে ফেলল। আমি ব্যক্তিগতভাবে অতটা ভাবিনি। এরপর অতদূর যাবে চিন্তা করিনি। এরপর আবার দস্তগীর সাহেব টেলিফোন করেন। আমি বললাম, বঙ্গবন্ধু সত্যিই মারা গেছেন। পরবর্তী চিন্তা–ভাবনা করেই নেয়া দরকার। আমরা আরও একটু চিন্তা-ভাবনা করি।

প্রশ্ন : প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিন জন প্রধান এরপর মোশতাক সরকারের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেন। আপনি মোশতাক সাহেবের ক্ষমতায় যাবার কথা কখন শোনেন? শপথ নেন কখন?

উত্তর : একটু পরে খবর পেলাম যে, তিন জন চিফ রেডিও স্টেশনে গেছেন। শুনলাম ডালিম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শফিউল্লাহ সাহেবের সেনাসদরের অফিসে ঢুকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে আসতে চায়। তখন সেনাবাহিনী প্রধান শফিউল্লাহ, নৌবাহিনীর প্রধান এম, এইচ, খাঁন এবং বিমান বাহিনীর প্রধান এ কে খন্দকার এক সাথে হন। অনেকটা নাকি মেজর ডালিমের ইচ্ছানুসারে তারা রেডিও হাউসে এসে মোশতাক সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এই সময় একজন অফিসার বি, ডি, আর-এর সদর দফতরে আমার সংগে দেখা করতে চান। তাকে প্রধান গেটে আমার লোকেরা নিরস্ত্র (ডিসআর্মড) করে। খালি হাতেই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেন। সেই অফিসারই (নাম বলেননি) আমাকে প্রথমে বললেন যে মোশতাক সাহেব এখন রাষ্ট্রপতি। তিনি বললেন, খন্দকার মোশতাক সাহেব আমাকে অনুরোধ করেছেন আমিও যেন বেতার ভবনে গিয়ে নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য করি। আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমার উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করলাম।

প্রশ্ন : উপদেষ্টা বলতে কি সিনিয়র অফিসারদের বোঝাচ্ছেন?

উত্তর : জ্বী। সিনিয়র অফিসার ছাড়াও আমি টেলিফোনে সমস্ত সেক্টর কমান্ডারদের সাথে পরামর্শ করি। সবাই আমাকে বললেন, সশস্ত্র বাহিনীদের সাথে মনোমালিন্য থাকা উচিত নয়। তিন প্রধান যখন নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন তখন আমাদেরও উচিত তাই করা।

প্রশ্ন : আপনাদের এই আলাপ-আলোচনার সময়ও কি আগন্তুক অফিসার ওখানে ছিলেন।

উত্তর : জ্বী না। তাকে আমি বলেছিলাম কিছুক্ষণ পরেই আমি আমার উত্তর জানাব।

প্রশ্ন : রেডিওতে কখন গেলেন?

উত্তর : দুপুরের দিকে সম্ভবত বারোটার কিছু আগেই হবে। রেডিওতে গিয়ে দেখি যিনি রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান ছিলেন তিনিও উপস্থিত। পুলিশের আইজিও ছিলেন। আমরা একে একে নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি।

তারপর আমরা সবাই মিলে সেনাসদরে গিয়ে বসি। সেখানে গিয়ে আলোচনা করি আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম কি হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গে। সেখানে শফিউল্লাহ, জিয়াউর রহমান, এম, এইচ, খাঁন, এ, কে, খন্দকার এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। খালেদ মোশাররফ সাহেবও ছিলেন। জিয়াউর রহমান সাহেব সেখানে মতামত প্রকাশ করেন, এখনই শাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি সামরিক বাহিনীর অধীনে নিয়ে নেয়া উচিত।

কিন্তু বাকী সবাই তাৎক্ষণিকভাবে মত প্রকাশ করল সেটা ঠিক হবে না। তাহলে সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা ভবিষ্যতেও বর্তমান সংকটের মত সংকটের মুখোমুখি হবে। কাজেকাজেই যা হবার তা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছে, কিন্তু এখনও বেসামরিক রাজনীতিবিদরাই দেশ চালান উচিৎ বলে আমরা মত প্রকাশ করি।

তারপরে গণতন্ত্র ও সংবিধানের বিধান অনুযায়ী নতুন নির্বাচন করা হবে। সরকার তখন সংবিধান সম্মত হবে। মনে হল জিয়াউর রহমানের সাথে আমাদের ঠিক মতের মিল নেই। তবে তিনিও শেষ পর্যন্ত আমাদের যুক্তির কাছে নতুন যুক্তি দাঁড় করালেন না। আমাদের আলোচনা শেষ করে আমরা সবাই মিলে এক সঙ্গে বঙ্গভবনে যাই খন্দকার মোশতাক সাহেবকে জানাতে যে, আপনি বেসামরিক নেতৃবর্গ রাজনীতিবিদদের নিয়ে মন্ত্রীসভা তৈরি করুন।

সেখানে গিয়ে আমি দেখলাম খন্দকার মোশতাক সাহেবও একই রকম চিন্তা-ভাবনা করছেন। তারপরতো মন্ত্রীসভা গঠন করা হলো—

প্রশ্ন : বঙ্গভবনে গিয়ে কি দেখলেন? খন্দকার মোশতাক সাহেব কেন ক্ষমতায় আসেন এ কথা আপনাদের ব্যাখ্যা করেন?

উত্তর : গিয়ে দেখলাম কিছু বিভ্রান্ত পোশাকধারী অফিসাররা তাদের নেতা ছিলেন ফারুক। তার সাথে অন্যান্য অফিসারদের মধ্যে ছিল ডালিম শাহরিয়ার ইত্যাদি। তারা কিভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন কেনই বা ক্ষমতা গ্রহণ করেন এ খবর নেবার মত মানসিক অবস্থা ছিল না। আমাদের কাছে তখন জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব স্থিতিশীলতার প্রশ্নই বড় ছিল। সে দিন ঘটনা কে ঘটিয়েছে এ প্রশ্নের চেয়ে জাতির কাছে রক্তপাত হানাহানি বন্দের প্রশ্নটাই বড় ছিল।

সেদিন আমরা বেতার ভবনে গিয়ে খন্দকার সাহেবকে শুধু একটাই অনুরোধ করি কোনমতেই যেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না হয়, অথবা কোনভাবেই যেন আইন-শৃঙ্খলার অবনতি না হয়—এর জন্য সরকার যেন সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখেন এবং এ ধরনের ঘটনা হলে তড়িৎ তা বন্ধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন : মোশতাক সাহেব কি বলেননি তিনি ক্ষমতায় এলেন কেন? বা যারা হত্যাকাণ্ড ঘটালেন তারাও কি বললেন না কেন তারা এমন কাজে গেলেন?

উত্তর : না, মোশতাক সাহেব কিছু বলেননি। তবে যারা ঘটনা ঘটান তাদের নেতা খুব অহংকার করে বললেন, তারা জাতিকে এক মহাসংকট থেকে বাঁচিয়েছেন।

## ৩৩. পরিশিষ্ট

# বঙ্গবন্ধুর ঘাতক মহিউদ্দিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেফতার

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার অন্যতম মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামি একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেফতার হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইসিই) অপারেশন বিভাগ লস অ্যাঞ্জেলেসের এক বাড়িতে গত মঙ্গলবার অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশের সাবেক সেনা কর্মকর্থা মহিউদ্দিনকে গ্রেফতার করে। স্বরাষ্ট্র সচিব জানিয়েছেন, আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে কিছুই জানায়নি।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স এবং এএফপি পরিবেশিত খবরে বলা হয়, লস অ্যাঞ্জেলেসের অভিবাসন। বিভাগের কর্মকর্তা ব্রায়ান ডিমোর গত বুধবার জানান, ৬০ বছর বয়সী মহিউদ্দিন একজন সন্দেহভাজন বিদেশি। আর এ ধরনের ব্যক্তিদের গ্রেফতার অভিযান তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।

পর্যটক হিসেবে মহিউদ্দিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। পরে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের আবেদন করেন। ২০০২ সালে মার্কিন অভিবাসন আদালত তাকে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু ঐ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন। গত মাসে সানফ্রান্সিকোর এক আদালত তার আবেদন নাকচ করে দেন। গত মঙ্গলবার লস এ্যাঞ্জেলেসের নিজ বাড়ি থেকে মহিউদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়। মহিউদ্দিনকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেয়ার জন্য মার্কিন কর্তৃপক্ষ প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলে জানা গেছে। আইসিইর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) অফিসাররা গত মঙ্গলবার বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা ও ১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থানে জড়িত পলাতক আসামি সেনাবাহিনীর এক সাবেক মেজরকে গ্রেফতার করেছে।

আইসিইর ফিউজিটিভ অপারেশন্স টিমের সদস্যরা মঙ্গলবার সকালে লস অ্যাঞ্জেলেসের ইংলিউড বুলভারের ৩৯০০ নম্বর ব্লকের বাড়ি থেকে একে এম মহিউদ্দিন আহমেদকে (৬০) আটক করে। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের আদালত অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে মহিউদ্দিন আহমেদকে তার অনুপস্থিতিতে বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মহিউদ্দিন আহমেদ ১৯৯৬ সালে প্রথম ভিজিটর ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। ২০০২ সালে একজন ইমিগ্রেশন জজের দেয়া প্রত্যাপণ

আদেশের বিরুদ্ধে তিনি আপিল করেন। গত মাসের শেষ দিকে সানফ্রান্সিসকোতে আপিলের নাইনথ সার্কিট কোর্ট মহিউদ্দিনের আবেদন খারিজ করে দেন। এতে আগের প্রত্যাপণ করার নির্দেশটি বহাল থাকে। মুজিব হত্যার পর দুই দশক ধরে মহিউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিদেশে বিভিন্ন কূটনৈতিক পদে বহাল ছিলেন। জুলাইয়ে তাকে দেশে ফিরে ষড়যন্ত্রের অপরাধে বিচারের সম্মুখীন হতে তলব করা হলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে মহিউদ্দিন আহমেদ এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন।

## কে এই মহিউদ্দিন

৩২ নম্বরে ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের নৃশংস হত্যার ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের অন্যতম পলাতক একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ সে সময় ছিলেন ১ম বেঙ্গল লান্সারের স্কোয়াড্রন কমান্ডার। হত্যাকাণ্ডের আগের রাতে বালুর মাঠে নাইট ট্রেনিংয়ের নামে যে প্রস্তুতি চলে তার ভারপ্রাপ্ত কমান্ডিং অফিসার ছিলেন মেজর ফারুক এবং এই মেজর মহিউদ্দিন। পটুয়াখালীর গলাচিপা থানার রাংগাবালী গ্রামের আবুল হোসেন তালুকদারের ছেলে একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন হন। ১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। '৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে '৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানের বন্দিশিবিরের আটক থাকার পর দেশে ফিরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হন। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড-পরবর্তী চড়াই উৎরাইয়ের ধারাবাহিকতায় তিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন ১৯৭৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। '৭৬ সালের ১ জুলাই তার চাকরি পররাষ্ট্র দফতরে ন্যস্ত করে আলজিরিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

## ৩৪. পরিশিষ্ট

# বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত মহিউদ্দিনের খোলা চিঠি

My name is Mohiuddin AKA Ahmed. As I prepare for this next stage in my life, I look back on the road, which has brought me to this point. By way of background, I joined the Pakistan Military in 1996, and was commissioned as second lietutenant in 1967. After the war of liberation with Pakistan, I was held in confinement in a Pakistani concentration camp from 1972 to 1974. I was then repatriated to Bangladesh in 1974. I then honorably served in the Bangladesh militry from 1974 to 1975. Thereafter, served in the diplomatic service until 1996.

The events leading up to the coup in 1975 are well known to all of the Bangladeshi people, and the events cannot be denied. In 1974, Sheikh Mujibur declared a democratic activities, and opponents. Freedom of speech was taken away from Bangladeshi citizens, and all fundamental rights were suspened. In January 1975, one-party rule under BAKSAL was introduced, and Sheikh Mujibur became Prime Minister/President.

By all reasonable and accurate accounts, Bangladesh was then suffering through a period of famine, poverty, and political instability. Those familiar with this period in Bangladesh's history remember that Bangladesh was a dictatorship. One need only open a Bangladesh newspaper from 1972 to 1975 to appreciate that Bangladesh my country was then a dictatorship. People of Bangladesh cannot deny the difficulties of that period in our history, Nor can they rewrite that period, and transform it into a renaissance of freedom and democracy. Those who attempt to do so are not being historically accurate.

It was during those times that I served honorably as Major in the Bangladeshi army-First Bengal Lancers regiment. I, like many other young officers, was not immune to the suffering that Bangladesh experienced during that time.

With this as a backdrop, the 1975 Coup occurred. At that time, I was a relatively junior officer who had limited responsibilities, but a healthy respect for the military chain of command. On the night of the Coup in 1975,

I was on normal night maneuvers, when I was notified by superior officers that a paceful coup would occur within hours. Myself and others believed that the orders we received were lawful, and that they were transmitted through the appropriate chain of command. As Major in the Military, my orders were clear, and the results of refusing a lawful order were equally clear, including military arrest, and facing a firing squed.

Of course, the political history of Southeast Asia and Pakistan suggested to all of us that peaceful coups were possible, and that the pe ·ful transition from dictatorship to multi party rule was possible without bloodshed. At that time, there were no reasons for me to believe that the coup would be anything other than peaceful.

Again, those of us who followed orders that evening were under the impression that a peaceful coup was in motion to remove the existing government, and set up a new national government with honest and efficient politicians whose first interest was that of the people of Bangladesh. The hope was that a peaceful transition to a multi-party democratic system would occur.

Regarding my orders, I was to position my troops at a crossorad, which I understood to be located more than a mile from one of the Presidential homes. I was to supervise my troops, and await further orders. At no time was I, or my troops, involved in any violence. the statements that I was present in the Prime Minister's house at the time of his death are utterly false.

It is an unfortunate and regrettable fact that Sheikh Mujibur Rahman and some members of his family and political party were killed during the 1975 coup. I do not believe that the loss of life was contemplated that night, nor justified.

Many other countries including China and Saudi Arabia recognized the new government of Bangladesh. Moreover, the entire political outlook of Bangladesh switched from a one party authoritarian rule to a multi-party the West After the Coup, the new government, through an ordinace, indemnified all military officers for their actions. The ordinance provided that no member of the military would face criminal prosecution or liability before any Court in Bangladesh. This ordinance was later ratified by more thana 2/3 majority of members of the Bangladesh parliament, thus making this clause a part of the Bangladeshi constitution.

After the Coup, I served the interest of Bangladesh in the Diplomatic corps, and in highly responsible positions. It was my great honor to represent the Bangladesh people in Jordan, Iraq, Saudi Arabia, Algeria, and Thailand.

For those who may not know, Sheikh Mujibur Rahman's surving daughter, Sheikh Hasina, later rose to leadership in the Awami League, and

eventually ran for Prime Minister, seeking to overturn the constitution, which protected members of the military who served in 1975. In 1991 Sheikh Hasina lost an election bid due to the fact that public opinion was against what was widely perceived as a platform of revenge. In subsequent years, from 1991 to 1996, Sheikh Hasina modified her objective and rhetoric. Sheikh Hasina changed her colors and claimed to be seeking reconciliation, and offered forgivdeness.

With her new platform of reconciliation and forgiveness, Sheikh Hasina became Prime Minister in 1996. Those statements of reconciliation and forgiveness, however, as one of her first official acts as prime minister of Bangladesh was to overturn the constitutitonal protections provided to myself and others. She accomplished this by leading the repal of the indemnity act in parliament without the constitutionally required 2/3 majority. Sheikh Hasina then speargheaded the prosecution of all of the military officers who served in 1975 and who were serving abroad as diplomats. Of course, officers who served in 1975 and who joined the Awami league were free from prosecution. Clearly, the condition to avoid prosecution was to acquiesce to Shikh Hasina party and political goals.

Presently. I have exhausted my legal remedies before the US Court of Apeals, and I have been detained by the U.S. Department of Homeland Security pending my removal to Bangladesh.

With my removal imminent, I am now preparing to face my accusers in Bangladesh, and fight the in absentia verdict which calls for my execution. By many accounts, the Court in Bangladesh, which was convened to judge myself and others was NOT free of political influence. This is evident from numerous newspaper reports of the time. In fact, the lawyer appointed to defend my right before the Bangladeshi Court was chosen by Sheikh Hasina's party! A review of the Court transcripts shows that the lawyer did not object to any evidence presented against me, nor did he provide any exculpatory evidence, Even other lawyers defending the other defendants were openly harassed and threatened with dire consequences including one lawyer who was stripped and beaten by a partisan crowd within the Court premises itself.

Now, over the years, the Supreme Court in Bangladesh has repeatedly refused itself from hearing the appeals arising out of that trial. To use their term, the Supreme Court in Bangladesh, after the departure of "Embarrassment" regarding the verdict. At one point even the chief justice of the Bangladesh Supreme Court presiding at the time questioned why the Bangladeshi government wanted to figuratively shoot the gun on the Court's shoulders.

It is my intention, upon return to Bangladesh, to challenge the verdict in my case, and reopen the proceedings to confront witnesses against me, as well as to present evidence that shows that I was not involved in the killing of Sheikh Mujibur. I further intend to show that the original trial court was unduly influenced by Sheikh Hasina in her quest for revenge.

Today, we are preparing the appropriate legal documents to start our defense in Bangladesh, and to one again open the record for a full and fair hearing. In light of the composition of the caretaker government, and its relative freedom from the Awami league forces, now is the time for such a review.

Those who support me, my colleagues, and the Bangladesh constitution must know that this is not the end. Rather, it will be the beginning of legal proceedings in bangladesh which will once and for all expose the misdeeds of Sheikh Hasina and the trial which has split Bangladesh down its middle.

My attorney in American is Mr. Joseph Sandoval and he will be working with my attorneys in Bangladesh.

I can be reached at robenmohiuddin@yahoo.com

Mohiuddin AKM Ahmed 03/19/07.

## ৩৫. পরিশিষ্ট

[জাতীয় সংসদে উত্থাপিত]

এবং

(বিশেষ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত)

**The Indemnity Ordinance, 1975** এর রহিতকরণকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু The Indemnity Ordinance, 1975 (Ordinance L of 1975) রহিত করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম। এই আইন The Indemnity (Repcal) Act, 1996 নামে অভিহিত হইবে।

২। Ord. L of 1975 এর রহিতকরণ।– (১) The Indemnity Ordinanance, 1975 (L of 1975, যাহা XLX of 1975 নম্বরে মুদ্রিত), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লেখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে যে কোন সময় উক্ত Ordinance এর অধীনকৃত কোন কার্য, গৃহীত কোন ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোন সার্টিফিকেট বা আদেশ-নির্দেশ অথবা অর্জিত কোন অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা, অথবা সরকার বা কোন কর্তৃপক্ষের জন্য সৃষ্ট কোন দায়-দায়িত্ব, যদি থাকে, এর ক্ষেত্রে General Clauses Act, 1897 (X of 1897) এর Section 6-এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না এবং উক্তরূপে কৃত কার্য, গৃহীত ব্যবস্থা, প্রদত্ত সার্টিফিকেট বা আদেশ-নির্দেশ বা অর্জিত অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা বা সৃষ্ট দায়-দায়িত্ব উপ-ধারা (১) দ্বারা উক্ত Ordinance রহিতকরণের সঙ্গে সঙ্গে অকার্যকর ও বাতিল হইয়া যাইবে।

**উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি**

১৯৭৫ সালের ইনডেমনিটি অধ্যাদেশটি মৌলিক মানবাধিকার এবং সংবিধানে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকার ও আইনের শাসনের পরিপন্থী। আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার সংরক্ষণ তথা দেশে আইনের শাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত অধ্যাদেশটি বাতিল করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বিধায় অত্র বিল আনীত হইয়াছে।

আবদুল মতিন খসরু
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

# বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

The Indemnity Ordinance, 1975 এর রহিতকরণকল্পে
আনীত বিল; এবং সম্বলিত অংশ।

[জনাব আবদুল মতিন খসরু]

বাঃসঃমুঃ-৯৬/৯৭-৩৭৮৫জি-১৫০০-১১-১১-৯৬।

## বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

### গত ২৩শে জুলাই, ১৯৯৬ তারিখে সংসদ কর্তৃক গঠিত 'বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ সম্পর্কিত বিশেষ কমিটি'র সপ্তম রিপোর্ট

বিগত অধিবেশনের ২৩শে জুলাই, ১৯৯৬ তারিখের বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে সংসদে উত্থাপিত বিলসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংসদে রিপোর্ট পেশ করার নিমিত্তে আমাকে সভাপতি করে ১৫জন সদস্যের সমন্বয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি হিসেবে আমি এ যাবৎ ছয়টি রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপন করেছি।

২। গত ৬-১১-৯৬ ও ১০-১১-৯৬ তারিখে সংসদে উত্থাপিত দুইটি বিল (১) বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (সংশোধন) বিল, ১৯৯৬ এবং (২) The Indemnity (Repeal) Bill, 1996 পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিমিত্তে সংসদ কর্তৃক উক্ত বিশেষ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। দ্বিতীয় বিলটি সম্পর্কে সংসদে রিপোর্টদানের জন্য কমিটিকে মাত্র ৭ (সাত) দিন সময় দেয়া হয়। The Indemnity (Repeal) Bill, 1996 সম্পর্কে কমিটি আজ ১১-১১-৯৬ তারিখে বৈঠকে মিলিত হয়ে ঐ বিলটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক The Indemnity (Repeal) Bill, 1996 বিলটি যেভাবে সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে, সেইভাবেই পাসের জন্য সংসদের নিকট সুপারিশ করেন। অপর বিলটি "বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (সংশোধন) বিল, ১৯৯৬" সম্পর্কে কমিটির রিপোর্ট পরে পেশ করা হবে।

৩। আমি কমিটির সভাপতি হিসেবে, কার্যপ্রণালী-বিধির ২১১ বিধির (১) উপ-বিধি অনুযায়ী বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ সম্পর্কিত বিশেষ কমিটির সপ্তম রিপোর্ট এই সংসদে উপস্থাপন করলাম।

**এ্যাডভোকেট মো: রহমত আলী**<br>
সভাপতি<br>
বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ সম্পর্কিত<br>
বিশেষ কমিটি।

## বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

### ঢাকা, ১৪ই নভেম্বর ১৯৯৬ (৩০শে কার্তিক, ১৪০৩)

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৪ই নভেম্বর, ১৯৯৬ (৩০শে কার্তিক, ১৪০৩) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :–

### ১৯৯৬ সনের ২৯ নং আইন

**The Indemnity Ordinance, 1975 এর রহিতকরণকল্পে প্রণীত আইন**

যেহেতু The Indemnity Ordinance, 1975 (Ordinance L of 1975) রহিত করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :–

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম–এই আইন The Indemnity (Repeal) Act, 1996 নামে অভিহিত হইবে।

২। Ord. L of 1975 এর রহিতকরণ।–(১) The Indemnity Ordinance, 1975 (L of 1975, যাহা XLX of 1975 নম্বরে মুদ্রিত), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে যে কোন সময় উক্ত Ordinance এর অধীনকৃত কোন কার্য, গৃহীত কোন ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোন সার্টিফিকেট বা আদেশ-নির্দেশ অথবা অর্জিত কোন অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা, অথবা সরকার বা কোন কর্তৃপক্ষের জন্য সৃষ্ট কোন দায়-দায়িত্ব, যদি থাকে, এর ক্ষেত্রে General Claues, Act, 1897 (X of 1897) এর Section 6 এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না এবং উক্ত কৃতকার্য, গৃহীত ব্যবস্থা, প্রদত্ত সার্টিফিকেট বা আদেশ-নির্দেশ বা অর্জিত অধিকার বা সুযোগ সুবিধা বা সৃষ্ট দায়-দায়িত্ব উপ-ধারা (১) দ্বারা উক্ত Ordinance রহিতকরণের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপে অকার্যকর, বাতিল ও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে যেন উক্ত Ordinance জারী করা হয় নাই এবং উক্ত Ordinance এর কোন অস্তিত্ব ছিল না ও নাই।

আবুল হাশেম
সচিব

# টীকা ও ব্যাখ্যা

## প্রথম অধ্যায়
## এই দেশেতে জন্ম আমার ...

১. পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সরকার ১৯৬৮ সনের ৬ই জানুয়ারি এক প্রেস নোটে ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারির যোগসাজশে রাষ্ট্র বিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অপরাধে ১৮ জন সামরিক, বেসামরিক ব্যক্তিকে গ্রেফতারের সংবাদ জনসমক্ষে প্রকাশ করেন এবং ১৮ই জানুয়ারি অন্য এক প্রেস নোটে ঘোষণা করা হয় যে, রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ১৭ই জানুয়ারি দিবাগত গভীর রাতে শেখ মুজিবকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হতে বের করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তরিত করা হয়। ২১শে এপ্রিল প্রেসিডেন্ট এক অর্ডিন্যান্স জারী করে পাকিস্তান পেনাল কোডের ১২১ ও ১৩১ ধারায় দোষীদের বিচার করার জন্য বিশেষ আদালত গঠন করেন। পাকিস্তানী সরকার এক আদেশ বলে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস, এ, রহমান, পূর্ব পাকিস্তান কোর্টের বিচারপতি মুজিবর রহমান ও বিচারপতি মকসুদুল হাকিমের সমন্বয়ে বিশেষ আদালত গঠন করেন। ৬ই জুন গেজেটে ঘোষণা করা হয় ১৯শে জুন হতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট সিগন্যাল মেস প্রাঙ্গণে বিচার শুরু হবে। পূর্ব ঘোষণা অনুয়ায়ী ১৯শে জুন হতে ৩৫ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ হয়।
পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে শেখ মুজিবকে ১নং অসামী করে এই মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলা আগরতলা মামলা নামে খ্যাত।

২. ... "I wish to make it absolute clear to you that have no ambition other than the creation of conditons conductive to the establishment of a consitutinal Government."
BANGLADESH DOCUMENTS VOL. 1, Page, 39.

৩. "Some how" Ayub Khan has pitched me to a highest of popularity where nobody can say 'no' to what I want. Even Yahya Khan cannot refuse my demands.'
Witness to surrender-Siddiq Salek.

৪. এল, এফ, ও'র বিস্তারিত বিবরণ দেখুন—
Bangladesh Documents vol-1, page 49.

৫. এ, এল, এফ এর প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ পাওয়া যাবে ঐ সময়ের দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদের পাতায়।

৬. "A clue was provided by another tape prepared by Yahya Khan's intelligence agencies. The subject was the Legal Frame Work Order (L.F.O.) issued by the Government on 30th March 1970. Practically it was on outline condition which denied free hand to Mujib to implement his famous six point. He confident his views on L.F.O. to his senior colleagues without realizing that these words were bing taped for Yahya's consamption. On the recording, Mujib said, "My aim is to establish Bangladesh. I shall tear L.F.O. into pieces as soon as the elections are overs. Who could challenge me one the electon are over." -Witness to Surrender ibid, page 1.

৭. "I will fix him, if he betrays me'-Witness to surrender, ibid.

৮. Last Days of United Pakistan-G.W. Chawdhury.

C. Hurst and company, London, page, 98.

এবং

The Great Tragedy, Zulfiker Ali Bhatto, Karachi 1971.

এই বইতে এ সব ধারণাকে প্রমাণিত করে।

৯. ঐ পৃঃ ৬৯।

১০. Statesman, New, Delhi, 19 August 1970.

এই সংখ্যায় ন্যাপের প্রধান আব্দুল ওয়ালী খানের আফগান পত্রিকার সংবাদদাতাকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারের প্রকাশিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১১. A. M. A. Muhith, Bangladesh Emergence of a Nation, (Dhaka 1978) page 148.

জনাব মুহিত জানিয়েছেন যে, ১৯৭০-এর অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানের ইউ, এন, ও ডেলিগেশনের নেতৃত্ব দানকালে পাকিস্তানের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার আবদুর রব নিশতার এক সাক্ষাৎকারে তাকে এ কথা বলেছেন।

১২. এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস, বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা-মাযহারুল ইসলাম অনুদিত, ঢাকা।

১৯৭৩ পৃঃ ৬৫।

১৩. ঐ পৃঃ ৬৬-৬৭।

১৪. জামাতে ইসলাম, মুসলিম লীগের বিভিন্ন গ্রুপ, পিডিপি, নেজামে ইসলাম ইত্যাদি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলো 'ইসলাম পছন্দ' দল বলে নিজেদের জাহির করে এবং ঐক্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এরা সামরিক সরকার কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে বাংলাদেশের মসজিদে মসজিদে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক প্রচার চালায়। বলাবাহুল্য তথ্য ও জাতীয় বিষয়ক দফতরে মন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল নওয়াবজাদা শের আলী খাঁন এই নামটি চালু করেন।

১৫. পাকিস্তানী বেতার থেকে প্রচার করা হয়েছিল যে, বত্রিশগাছে ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ৩০০ জন পাকিস্তানীকে হত্যা করেছে এবং ৭০০ জনকে আহত করেছে। পরবর্তীকালে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সব ছিল সামরিক জান্তার নির্বাচনী কৌশল-যাতে ধর্মীয় বোধের প্রবাল্যে ইসলাম পছন্দ দলগুলো বেশি ভোট পায়।

১৬. সিদ্দিক সালিক-এর বক্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "The Government ran special trains to Tangail and arranged power supply at the site to make the rally a success. Some political owls in the Government House wanted the N.A.P. (B) of stay and develop as a political counter weight to the Awami Leagne.

-Witness to Surrender, Ibid, page 6.

১৭. বিভিন্ন দলের প্রার্থী সংখ্যা ও নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকগণ Bangladesh Documents vol. I (Published by Ministry of External Afairs, New Delhi) Page 130, দেখতে পারেন।

১৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য Radical politics and the Emergence of Bangladesh-Talukder Moniruzzaman. Bangladesh Books International Ltd. page 40-41.

১৯. Bangldesh : Constitutional Quest For Autonmy, 1933-1971 (Dhaka 1979)-Moudud Ahmed, p. 206.

উল্লেখ্য যে, জাতীয় পরিষদের নির্বাচনী ফলাফলে সামরিক জেনারেলদের বিভিন্ন অংশের উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে জি, এইচ কিউতে কয়েক দফা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

২০. ২৮শে নভেম্বর-এর দৈনিকসমূহ দ্রষ্টব্য।

২১. Pakistan Crisis, David Loshak (London 1971) page 54-55.

২২. পিন্ডির ষড়যন্ত্র ও বাংলাদেশ, গোলাম মহিউদ্দিন পৃঃ ৬৯ দ্রষ্টব্য।

২৩. নির্বাচনের রায় অনুযায়ী মেজরিটি পার্টিকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে দেয়া হবে কিনা অথবা সেনাবাহিনী গুটিয়ে নেয়া হবে কিনা? পাক সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল ইয়াহিয়ার বিশ্বস্ত ও অনুগত এক জেনারেল ঢাকা এলে এ সম্পর্কে বলেন—

"The answer to these question was provided by a General in Yahya's confidence who came to Dhaka in the December. After a sumptuos dinner a Government House, he declared during an informal chat, 'Don't worry...We will not allow these black bastards to rule over us.

Witness to Surrender, Ibid, page 29.

২৪. নিয়াজীর জবানবন্দী বইটি দ্রষ্টব্য এবং একই সংগে পিন্ডির ষড়যন্ত্র ও বাংলাদেশ পৃঃ ৮১–৮২ এবং লাঞ্ছিতা বাংলাদেশ দেখুন।

২৫. Bangladesh Documents vol. 1, Page 132-133.

২৬. ১৬, ১৭ই ফেব্রুয়ারি-দৈনিক সংবাদ পত্রসমূহ দ্রষ্টব্য।

২৭. দৈনিক পাকিস্তান, ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।

২৮. ঐ ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।

২৯. Pakistan Crisis-David Loshak page 59.

৩০. ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের দৈনিক সংবাদপত্রসমূহ দ্রষ্টব্য ১৯৪১।

৩১. দৈনিক সংবাদপত্রসমূহ তারিখ ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।

৩২. ঐ; ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।

৩৩. Pakistan Observer 18 Feb. 1971.

৩৪. Witness to Surrender, Page 39.

৩৫. Bangladesh Documents vol, 1, page 114.

৩৬. Morning News, Dhaka, March 1, 1971.

৩৭. Bangladesh Documents vol, 1, Page 4th, Page 293.

৩৮. "Negotiation for Bangladesh-A Participants view-Reman Sobhan South Asia review vol. 4, july 1971, London p. 318.

৩৯. Witness to surrender Ibid, Page 43-44, সালিক সিদ্দিক লিখেছেন, "The announcement was brodcast on 1 March at 13.05 hours. Anticipation and emotion kept us glued to our radio sets. I sat in the morning action so that I did not miss a word. To our surprise and horror, the annuncement said nothing of new date. Many ugly scenes began the hower before my eyes.

What surprised me, besides the commission of the date, was the absence of the President's voice which had jarred our ears several times before to announce relatively on important developments, did this least, is what Professor G.W. Chowdhury wants us believe. He says, (Yahya) was only a signatory to it. "Who then was the author? When I checked up details of this important development with Major General "I" who was on Yahya's personal staff, he said, "The president was in Karachi then. We were all down stairs. Major General "I" and Major General "O" were going up and down.They painted such a picture to the President that he had to agree to the draft already prepared, Is this a sufficient defence for General Yahya Khan?"

৪০. ঐ পৃঃ ৪৪।

৪১. "The top brass in Dhaka put their heads together the same night and tried to speak to President Yahya Khan on the telephone. But they could only get to Peerzada who refused to lend an ear to the Dhaka tune. Then they tried to locate General Hamid listened to the crisis talk and promised to speak General Yahya Khan. But nothing came of it. Later that night, General Peerzada rang up Genreal Yakub and asked him to take over from Admiral Ahsan".

Witness to Surrender, Ibid p. 45.

৪২. জেনারেলস্ ইন পলিটিকস্-আসগর খান।

৪৩. Witness to Surrender, Ibid, পৃঃ ৪৫।

৪৪. The Pakistan Observer, Dhaka, 3, March 1971.

৪৫. He (General Yakub) spoke to Mujib for forty minutes past midnight.

He used all his fact, persuasive eloquence and diplomacy to convince Mujib but without avail. The General would say 'Sheik Sahib, aupkhud siyany hain, (You are yourself a sensible person) you know situation is very tense. A statement like this will only worsen in it. Mujib argued back. No, there is nothing inflammatory in it. It is just another political statement. So the debate continued. Mujib refused to oblize."

_Witness to Surrender. Ibid, page 47.

৪৬. ঐ পৃ: ৪৭।

৪৭. এ টেলিফোনের কথিত বিষয়বস্তু টেলিপ্রিন্টারে ঢাকার মার্শাল ল হেড কোয়ার্টারে আসে এবং ভোরে মুজিবকে একজন ব্রিগেডিয়ার তার বাসায় পৌছে দেন। মেসেজটি ছিল এ রকম :

"Please do not take any hasty dicision. I will soon come to Dhaka and discuss the details with you. I assure you that you asperations and commitment to the people can be fully honoured. I have a scheme in mind which will more than satisfy your six point. I urge you not to take a hasty decision."

Witness to Surender, Ibid, Page 52.

৪৮. The last days of United Pakistan—

G.W. Cowdhury p. 120.

৪৯. BD Documents vol 1. Page 226.

৫০. Witness to Surrender, Page 57-58.

৫১. "The bastard is not behaving, you get ready".

৫২. ঐ পৃঃ ৬২

ঐ পৃঃ ৬৩

ঐ পৃঃ ৬৮

Bhutto met the President the same day. Both of them agreed perhaps not for the first time, that the Awami League had prograssively raised its stakes from provincial Autonomy to the constitutional break up of Pakistan."

৫৪. "When the first shot had been fired, the voice of Sheik Mujibur Rahman came faintly through on a wavelength close to that of the official Pakistan Radio. In what must have been and sounded like, a pre-recorded message, the Sheik procliamed East Pakistan to be the People Republic of Bangladesh" David Loshak, Pakistan crisis, London pp 98-99.

৫৫. Witness to Sarrender, page 75-76.

৫৬. The Dawn, Karachi, March 27, 1971.

৫৭. Der Spiegel Boon, August. 30, 1971.

৫৮. সাক্ষাৎকার : ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের মধ্যরাতে পাকিস্তানের ফৌজ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বন্দি হন। তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানের লায়ালপুরে সুরক্ষিত কারাগারে আটক রাখা হয়। ১১ই আগস্ট থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এবং তাঁর বিচারের জন্য বিশেষ সামরিক আদালত গঠন করা হয়। বিচারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ঘটনার পট দ্রুত পরিবর্তনের ফলে তার দণ্ডাদেশ কার্যকরী করার সময় ইয়াহিয়া খান পায়নি। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১০ জানুয়ারি স্বদেশে ফিরে আসেন। ১০ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন টেলিভিশন ভাষ্যকার ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুর একটি টিভি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সনের ৮ জানুয়ারি সেই সাক্ষাৎকারটি নিউইয়র্ক টেলিভিশনে "ডেভিড ফ্রস্ট শো" নামে প্রচারিত হয়। এখানে সাক্ষাৎকারটির প্রয়োজনীয় অংশ উদধৃত করা হয়েছে মাত্র।
সাক্ষাৎকারটি চিত্রবাংলায় প্রকাশিত ১৯৮২ সালের বিজয় দিবস সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত।

## দ্বিতীয় অধ্যায়
## বঙ্গবন্ধু : বাংলাদেশ : এক অন্তহীন আক্রোশ ...

১. বাংলাদেশের গণহত্যা–ফজলুর রহমান, ৬৭–৬৯ পৃষ্ঠা থেকে সংক্ষিপ্ত। মুক্তধারা প্রকাশনী, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।

২. Uncertain Greatness, Roggers Morris, Page-214.

৩. Kissinger : The Incomplete Diplomat, Appendix (Bacground brifing with Herry A. Kissinger) Page 357. "We are opposed to use military force in this crisis and we do not believe that it was necessary to engage in military action."

৪. Inid page 151.

৫. Ibid, 142-143.

৬. Ibid, Page 144.

৭. উদয়ন বিশেষ সংখ্যা ১৯৭২ পৃঃ ৩৩।

৮. তৎকালীন ঢাকাস্থ মার্কিন কন্সুলেট ২৮শে মার্চ এক টেলিগ্রাম পাঠায় সেখানে নাটকীয়তার সঙ্গে বলা হয় "We here in Dhaka are mute and horrified witnesses to a reign of terror by the Pakistan military. The regime was practicing nothing less than "Selective Genocide."

Uncertain Greatness, G page 416.

৯. Ibid, Page 216-217.

১০. The white House years : Henry Kissinger, Ibid, Page No. 853.

১১. Uncertain Greatness, Ibid Page 220.

১২. নিপুন জুন ১৯৮৫ সংখ্যা বাংলাদেশ গণহত্যা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২০–২১।

১৩. Memoris P. 256.

১৪. This Policy in south Asia P. 354.

১৫. White House Year, Ibid p.p. 91-113.

১৬. Memoris p. 428.

১৭. No way But Surrender-voice Admiral. N. Krishinan, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. India.

১৮. দৈনিক বাংলা, ১০ মার্চ, ১৯৭২।

১৯. মূল ইংরেজি অনুলিপি দেখতে পাবেন, বাংলাদেশ গণহত্যা, ঐ পৃঃ ৭৩।

২০. The Whit‹ House Years, Dr. Henery Kissinger.

২১. লরেন্স লিফশুলজ-বাংলাদেশ ঃ দি আনফিনিশ রেভ্যুলেশন বইয়ে The Canegie Papers নামে একটি পরিশিষ্ট যোগ করেছেন। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের সংকট নিয়ে আন্তর্জাতিক শান্তি কমিশন অনুসন্ধান ও গবেষণা চালায়। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ, যা বাংলাদেশের জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা। কারণ—সেখানে মার্কিন নীতি ব্যর্থ হয়েছিল কেমন করে এবং এই নীতি গণহত্যার স্বপক্ষে ঝুঁকে পড়েছিল কিনা? এই রিপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে কারানেজীর (Carnegie) গবেষণকবৃন্দ স্টেট ডিপার্টমেন্টের ১০০-অধিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সি. আই. এ. প্রতিরক্ষা বিভাগ, হোয়াইট হাউজের জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিলসহ বহু প্রতিষ্ঠানে অনুসন্ধান ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এই দলিল হাজার হাজার পৃষ্ঠার।

২২. The Unfinished Revolution. Ibid, Page 165.

২৩. "The Contacts were highly sensative, becouse.... they by passed the dominat leadership of the Provisional Government, in the person of the Prime Minister Tajuddin Ahmed, Tajuddin like nearly the entire rank and file of the Bangladesh movement was irrevocably committed to full independence for the country after masacre of the 25th March, and would breach no compromise on this issue. Therefore, absolute discretion and secrecy was the key to spliting the Bengal leadership and supporting that faction which would compromise with Pakistan and not demand full Independence. Some sources have suggested that the moment chosen was to be October 1971. When Mustaque, as foreign Misinter, was expected to arrive in New York to present the Bangladesh case before the U.N. General Asembly. Had he suddenly, in New York, utilaterally and without warning announced a compromise solution short of Independence-a position that constituted a sell out and a betrayal in the view of Tajuddin and the rest of the Leadership-Mustaque might at the stage have pulled off a full coup against the rest of the Awami Leadership back it calcutta, and the history of Bangladesh might have been very different."

Bangladesh : The Unfinished Revolution : Ibid, Page 166.

২৪. মুক্তিযুদ্ধে মুজিব নগর-শামসুল হুদা চৌধুরী, পৃঃ ২৬০।

২৫. The Kissenger Years-T.N. Kaul page 88.

২৬. Ibid. Page 40.

২৭. "The shah of Iran told me that he was under impression that Yahya Khan had finally clamed down considerably. Actually, I told Yahya Khan that it was not a problem of India and Pakistan, but and internal matter of Pakistan; that is to say political and economic question between West and East Pakistan."

C.B.S. interview, no 26 Oct. 1971.

এবং দেখুন Bangladesh Document, Vol. I Page 169.

২৮. The Kissenger Years-T.N. Kau Page 83.

২৯. চৌ এন [illegible]াই-এর পত্রের জন্য দেখুন South Asian Crisis, Appendix 5. P. 173.

৩০. Bangladesh Crisis P.P. 382-48, পাদটীকা ৯০।

৩১. Indian Express, 13 December, 1971 P. 372.

৩২. Who Killed Majib-P. 169.

৩৩. সৌদি আরব ১৯৭৫ সালের ১৬ই আগস্ট, সুদান ১৬ই আগস্ট এবং চীন ৩১শে আগস্ট বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

## তৃতীয় অধ্যায়
## বঙ্গবন্ধু হত্যার পটভূমি : রাজনৈতিক দল

১. Moulana Bhasani said, "The People of Bangladesh can never forget this generous lady (Indira Gandhi) and the People of India... He expressed the hope that Bangladesh would also be developed a secular, democratic and socialist country like India under present administration. -P.T.I. report, 22 January, 1972.

২. BD. Documents, page 300 Vol. I.

৩. The Statesman, Calcutta. 15 May, 1973.

৪. Morning News, Dhaka, 8 October, 1972.

৫. দৈনিক বাংলা, ২৪শে আগস্ট ১৯৭২।

৬. ১৯৭৫ সালের ১৫ই নভেম্বর দেশবাসীর প্রতি মেজর জলিল ও আ. স. ম. রবের আহবান। এই প্রচারপত্রে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা জাসদ প্রেসিডেন্ট–সেক্রেটারী প্রিয় দেশবাসীর সামনে "আস্সালামু আলাইকুম" বলে হাজির হয়েছেন এবং সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে "খোদা হাফেজ" দিয়ে শেষ করেছেন। এ সম্পর্কে পরিশিষ্ট দেখুন।

৭. বিপ্লবী দৈনিক সংস্থার সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য। পরিশিষ্ট দেখুন।

৮. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এম, মনসুর আলী পার্লামেন্টকে জানান যে, মওলানা ভাসানী চিঠি লিখেছেন যে, উগ্রপন্থীরা তাকে হত্যা করতে চায়, অবিলম্বে তাকে পুলিশ পাহারায় নেয়া হোক। পার্লামেন্ট প্রসিডিংস দ্রষ্টব্য।

৯. The Statesman, Weekly, 21 Dec-1974.

১০. Explosion In Sub Continent : India, Pakistan, Bangladesh and Ceylon,-Edited by Robin Blackburn, Penguin Books. (1975) Page 316. Also see, Bangladesh : The Unfinished Revolution- Lawrence Lifschutlz, P. 22.

১১. Group Interest and Politial changes in Bangladesh- Talukder Maniruzzaman, Page 147.

১২. ঐ সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক পার্লামেন্টে ভাষণ দ্রষ্টব্য।

১৩. Who Killed Mujib, Ibid-Page 20.

১৪. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য, ১লা ডিসেম্বরের পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

১৫. After the Dark Night-S.M. Ali, Thomson Press, India.

১৬. ১৯৭৫ সনের ১ম সংখ্যা ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে লড়াই পত্রিকার একটি উপ-শিরোনাম ছিল এরূপ—

"কোরবান আলীর ঘাতক বাহিনী"

"মুজিবের নয়া মন্ত্রীসভার তথ্যমন্ত্রী কোরবান আলী তার এলাকায় একটা ঘাতক বাহিনী তৈরি করেছে। এলাকার দাগী আসামী, খুনী চোর ডাকাতদের দিয়ে গঠন করা হয়েছে এই বাহিনী। .. শুধু কোরবান আলী নয়, ঢাকার গাজী গোলাম মোস্তফা থেকে শুরু করে বরিশালের হাসনাত পর্যন্ত সমস্ত আওয়ামী ও যুবলীগারদের নিজস্ব বাহিনী আছে।"

১৭. কনফিডেনসিয়াল ডায়েরি, বিক্রমাদিত্য, পৃঃ ৭।

## চতুর্থ অধ্যায়
## মুজিব হত্যার হাতিয়ার : লজ্জাহীন মিথ্যাচার–১

১. বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ—মোঃ আব্দুল মোহাইমেন পৃঃ ৯–১০।

২. শেখ মুজিব তোমায় শ্রদ্ধাঞ্জলী, পৃঃ ৯৪।

৩. History of the Freedom Movement in Bangldesh-J. Sen Gupta P. 465 এবং পরিশিষ্ট দেখুন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের মধ্যে মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি দ্রষ্টব্য।

৪. ১৯৭৪ সনের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে চতুর্থ ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপনী দিবস উপলক্ষে প্রাকশিত এক বুলেটিনে A Brief History of Jatiya Rakkhi Bahani-এর তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— "Thus on 2nd February 1972 the Jatiya Rakkhi Bahini come into existence. The Jatiya Rakkhi Bahini has been formed to enable the irregular freedom fighters to associate themselves as an Intregrated and disiplined force alongwith defence and other force of the country in the noble ask of the defence of the motherland. A substantial mamber of these freedom fighters from all the sectors of Bangladesh joined the Bahini. The core of the Jatiya Rakkhi Bahini is make of these gallant sons of the soil who eastablished the finest raditions of fighting without the formal training of a solder. Jatiya Rakkhi Bahni is also for these dedicated young men to channelise their energy, aninusiasm, patriotism and initiative in the urgent ask of facilitaing speedy reconstraction of the country by ensuring internal law and order as the establishment of peacefil conditions within the country is indispensable for pursuing the good of national economic development".

**খাদ্য সংকট : চক্রান্ত–২**

১. বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংকট (বাংলাদেশের অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধাবলি), রেহমান সোবহান, এই বইটিতে ৩৬ পৃষ্ঠা থেকে ৬৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে 'খাদ্য ও দুর্ভিক্ষের রাজনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধটিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে যে সকল চক্রান্ত করেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন।

**মিথ্যাচারের বাহন-৩**

১. কনফিডেনসিয়াল ডায়েরি–বিক্রমাদিত্য, কলকাতা পৃঃ ৬৯।

২. Witness to Surrender-Ibid page 5.

৩. বঙ্গবন্ধু পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'রক্তমাখা বুক জুড়ে স্বদেশের ছবি' পুস্তকটিতে বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট–অধ্যাপক আবু সাইয়িদ পৃঃ ৪০।

৪. "May I take this opportunity to state that Mr. Aslam was an employee of Holiday, and whatever he is reported to have done is his own option," Holiday, September 30, 1973.

৫. "শেখ মুজিবুর রহমান কি কারণে এনায়েতউল্লাহকে গ্রেফতার করেছিলেন এ কথা আমার অজানা ছিল না, আমি জানতাম যে এনায়েতউল্লাহ বন্দি হবার পর তার স্ত্রী গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ধর্না দেয়।"

কনফিডিন্সিয়াল ডায়েরি– বিক্রমাদিত্য পৃঃ ৪১।

৬. এনায়েত উল্লাহ খানের সাক্ষাৎকার, তারকালোক ১৫–৩০ এপ্রিল ২৫ সংখ্যা।

৭. ১৯৭৫ সনের ১৬ই জুন এই দিবসটি স্বাধীনতা বিরোধী তথাকথিত উগ্র বামপন্থী সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টগন কালদিবস বলে উল্লেখ করে থাকে।

৮. বিচিত্রা, ১৯৭৫ সনের বঙ্গবন্ধু হত্যার পরবর্তী সংখ্যা তিনি যে প্রবন্ধটি লেখেন এই বইয়ের পরিশিষ্টে তা হুবহু মুদ্রিত।

৯. "A Constitutional provision to be made to incorporate the defence priorities by having a supreme revolutionary council with the chiefs of our armed force at its command. This council may exercise discreationary powers with regard to difence needs of the country to overrale any deed or act centravening the security of our nation and there by Protect our nascent body politics from the infitration and machinations of agent provocateurs as well as usual and defeats the old order.

After natively, a constitutional provision may be made for the presidency to remain above the parliamentary process".

Weekly Holiday, D. 27, January, 1972 see article strategy of state craft.

১০. জেনেভায় বঙ্গবন্ধু আবদুল মতিন দ্রষ্টব্য, গোলাম রসুল সম্পর্কে আরো দ্রষ্টব্য পৃঃ ৬৪-৬৭।

১১. গার্ডিয়ান পত্রিকা ১৯৭৫ সনের প্রারম্ভে দুর্ভিক্ষের হেতু সম্পর্কে বলতে গিয়ে উদ্ধৃত এই গাজাখুরী কাহিনী ফেঁদেছে।

## পঞ্চম অধ্যায়
## দিনপঞ্জী : কতিপয় ঘটনা

১. সাক্ষাৎকারটি ১৯৮৩ সনের ১৫ই আগস্টে প্রকাশিত। কর্নেল রশিদ ফারুকের লেখা মুক্তির বই দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৭১–৭২।

২. পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো—যিনি বাংলাদেশের গণহত্যার অন্যতম নায়ক ছিলেন।

৩. বঙ্গবন্ধু এ দেশে গরিব কৃষক সাধারণ মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় দল বাকশাল গঠন করেন। প্রচলিত গণতন্ত্রের পরিবর্তে তিনি শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ঘোষণা করেন। তিনি বললেন, ঘুনেধরা সমাজ ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়তে হবে। এই লক্ষ্যে কৃষক শ্রমিকের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থে কতিপয় বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

৪. 'ঐ সময়ে প্রকাশিত দৈনিকসমূহ দ্রষ্টব্য।

৫. Bangladesh-The Unfinished Revoluation-Lawrence Liftschultz, Page 142.

৬. বিস্তারিত তথ্যাদি মিথ্যাচারের বাহন অধ্যায়ে বর্ণিত।

৭. Who Killed Majib, Ibid, Page 187.

৮. ঐ পৃঃ ১৯।

৯. দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৭৫ সনের সেপ্টেম্বর দ্রষ্টব্য।

১০. Who Killed Mujib, Ibid, Page 19.

ধূমায়িত চক্র ঃ প্রশাসনের পাঠপীঠে

পুলিশ প্রশাসন

১. House select committee on Intelligence.The Pike Committee Report, 19, Jauary 1676.

২. কনফিডেনসিয়াল ডায়েরী, ঐ, পৃঃ ৪৮।

৩. ঐ পৃঃ ৪৮।

৪. Bangladesh : The Unfnished Revolution, Ibid, Page 189.

৫. কনফিডেনসিয়াল ডায়েরি পৃঃ ৪৫।

৬. সাপ্তাহিক ছুটি, শুক্রবার, ২২শে মার্চ, ১৯৮৫, পৃঃ ৭।

জাওয়াদুল করিম–মুক্তিযোদ্ধাদের না বলা কথা, দ্রষ্টব্য।

৭. Who Killed Mujib, Ibid, Page 36.
৮. কনফিডেনসিয়াল ডায়েরি পৃঃ ৫৪।
৯. ঐ পৃঃ ৫৩।
১০. Bangladesh : The Unfinished Revolution, Ibid, Page 126.
১১. ঐ ১২৬।
১২. ঐ ১২৫–২৭।
১৩. ব্রিগেডিয়ার আব্দুর রউফের সাক্ষাৎকার (পরিশিষ্ট দেখুন)।

বে-সামরিক প্রশাসন
১. সি, এস, পি, অফিসারদের নাম– হোসেন তৌফিক ইমাম, নূরুল কাদের খাঁন, খন্দকার আসাদুজ্জামান, খসরুজ্জামান চৌধুরী, মাহবুব আলম চাষী, কামাল সিদ্দিকী, ওলিউল ইসলাম, তওফিক এলাহী চৌধুরী, সাদাত হোসেন, এম, এ, সামাদ, আকবর আলী খাঁন, রুহুল কুদ্দুস, সৈয়দ আবুস সামাদ, কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ প্রমুখ।
২. পুলিশ অফিসারদের নাম—
জনাব এম, এ, খালেক, এস, কে চৌধুরী, আর আই চৌধুরী প্রমুখ।
৩. Group Interests And Political Changes in Bangladesh ... Talukder Maniruzzaman, Page 203.
সামরিক বাহিনী
১. Group Interests And Political Changes in Bangladesh, Ibid : Page 236-237.
২. Ibid P. 173.
৩. Ibid P. 175.
৪. Ibid P. 202.
৪. কর্নেল শ্যাফায়াত জামিল লেখকের সঙ্গে আলোচনা কালে জিয়াউর রহমানের এরূপ চালাকির বেশ কিছু নজীর তুলে ধরেন।
৫. কারাগারের ডায়েরি; কর্নেল (অব. শওকত আলী) পৃঃ ৬৬–৭১ তদানীন্তন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল সফিউল্লাহর সাক্ষাৎকার এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। পরিশিষ্ট দেখুন।
৬. ঐ।

ফুলে থাকা শিল্পপতি
১. See, Industrial Concentration and Economic Power in Pakistan.
Lawernce, J. White.
২. Public Enterprise in at Intermediate Regime.
Rahman Sobhan, Muzaffer Ahmed P. 58.
৩. সাপ্তাহিক বিচিত্রায় (১৯৮৪) প্রকাশিত জাসদের সাধারণ সম্পাদক আ, স, ম রবের সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য।

## ষষ্ঠ অধ্যায়
## আমি আলেন্দে হবো...

১. লরেন্স লিফশুলজ-এর প্রশ্নের উত্তরে মরিস বলেছেন—

"In early 1975 I was interviewing for my book, a man who was the one of Kissingers closest aides and most senior confidents. I have Known him well. In after seriousness and not at all as a criticism of Kissinger's policy he said there had been three nameses of American foreign policy in the enemies list. He said, they were Allende, Thiew and Mujib."

-Bangladesh : The Unfinished Revolution, Lawrence Lifschulz, Page 169.

২. "But Mujib comes to power as a defince, as a real defeat for Amrica and America's clent (Pakistan), and as a great embrassment for the administrations.

-ঐ পৃঃ ১৩৮।

৩. ঐ পৃঃ ১৫৯।

৪. 'He took the Bangladesh event as a personal defeat'.

ঐ পৃঃ ১৭০

৫. মূলধারা ৭১, মাঈদুল হাসান দ্রষ্টব্য।

৬. "Something is going to happen (in Bangladesh)" Mrs. Gandhi warned the late Sheikh, Mujibur Rahman who replied No. they're all my children."

-The Illustrated weekly of India, 15 Sept. 1979.

৭. Bangladesh : The Unfinished Revolution. ঐ পৃঃ ১৪০.

৮. ঐ পৃঃ ১৭৩।

৯. Who Killed Mujib, Ibid.

১০. Bangladesh : The Unfinished revolution, Ibid, page 103.

১১. Interview with Lt. ccls. Farooq and Rashid was broadcast by the ITV on 2 August 1976, পরিশিষ্ট দেখুন।

১২. সেনাবাহিনী আইনের একত্রিশ ধারা; এই আইনের এখতিয়ারভুক্ত কোনো ব্যক্তি নিম্নলিখিত কোনো অপরাধ করলে অর্থাৎ–

(১) বাংলাদেশের স্থল, নৌ অথবা বিমান বাহিনীতে কিংবা তাদের সঙ্গে সহযোগিতাকারী যে কোনো বাহিনীতে কোনো বিদ্রোহ করতে অথবা বিদ্রোহে যোগ দিতে শুরু করা, উৎসাহিত করা, বিদ্রোহ করা কিংবা বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করা; অথবা

(২) এ ধরনের কোনো বিদ্রোহে উপস্থিত থাকা এ ধরনের বিদ্রোহ দমনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা না করা; অথবা

(৩) এ ধরনের কোনো বিদ্রোহের অস্তিত্ব অথবা এ ধরনের বিদ্রোহের কোনো অভিলাষ কিংবা এ ধরনের কোনো ষড়যন্ত্রের কথা জানা সত্ত্বেও আছে বলে মনে করার কারণ সত্ত্বেও বস্তুত: বিলম্ব না করে তার কমান্ডিং অফিসারকে অথবা অপর কোনো উর্ধ্বতন অফিসারকে খবর না দিলে;...

কোর্ট মার্শালের বিচারে তার প্রাণদণ্ড দেয়া হবে।

১৩. লেখককে লেখা জিয়াউর রহমানের পত্র (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

১৪. আদালতের কাঠগড়ায় কর্নেল তাহেরের জবানবন্দী, দ্রষ্টব্য।

Economic and Political weekly, (Bombay) special Number August 1971.

১৫. Unfinished Revolution, Ibid, Page 165.

১৬. Ibid, Page, 102.

১৭. Who Killed Mujib, A.L. Khatib, Vikas Publishing House. Pvt. Ltd. Page. 34.

১৮. লেখকের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় বাস্তকলাবিদ মাজহারুল ইসলাম এ কথা আমাকে জানিয়েছেন। তাঁর লেখা সমাজতন্ত্র উত্তরণে বাকশালের কর্মসূচি দ্রষ্টব্য।

১৯. পরিশিষ্ট দেখুন।

২০. লেখকের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বনামধন্য লেখক খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস এ তথ্যটি প্রদান করেন।

২১. ব্রিগেডিয়ার রউফের সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য।

২২. ঐ।

সাপ্তাহিক মেঘনা দ্রষ্টব্য।

২৩. প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদউল্লাহর সাক্ষাৎকার।

২৪. অধ্যাপক ইউসুফ আলীর সাক্ষাৎকার, পরিশিষ্ট দেখুন।

২৫. ঐ।

## সপ্তম অধ্যায়
## ব্যক্তি আক্রোশের ডুগডুগি

১. সানডে টাইমস, লন্ডন ১৭ই আগস্ট ১৯৭৫।

২. ঐ।

৩. ঐ।

৪. অমিত রায়, সানডে টেলিগ্রাফ, লন্ডন ১৭ই আগস্ট ১৯৭৫।

৫. Who Killed Mujib, A.L. Khauib. Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi.

৬. ঐ পৃঃ ৪৫–৪৬।

৭. ঐ পৃঃ ৪৬–৪৭।

৮. কনফিডেনসিয়াল ডায়েরি–বিক্রমাদিত্য; পৃ ৭৩। মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা।

৯. ঐ পৃ ঃ ৪৩–৪৪।

১০. টাজেস আর্জগার, জুরিখ ২৯শে আগস্ট, ১৯৭৫।

১১. স্ট্যান কার্টার, ডেইলী নিউজ, নিউইয়র্ক ১লা নভেম্বর, ১৯৭৪।

১২. The Washigton Post, Saturday, August 23, 1975.

১৩. পরিশিষ্ট দেখুন।

## অষ্টম অধ্যায়
## হত্যার কালরাত ...

১. ITV. Interview with the Cols. Farooq and Rashid by Anthony Mascarcenhas, on 2 August 1976 [পরিশিষ্ট দেখুন]

২. ঐ দেখুন এবং একই সঙ্গে এ্যান্থনী মাসকারেনহাসের লিখিত বই Bangladesh "A Legecy of Blood দ্রষ্টব্য।

৩. ঐ।

৪. ঐ।

৫. ঐ দ্রষ্টব্য।

৬. দেখুন ITV সাক্ষাৎকারটি, পরিশিষ্টে প্রদত্ত।

৭. ঐ।

৮. ঐ।

৯. ঐ।

১০. ঐ।

১১. ঐ।

১২. ঐ।

১৩. পলাশী থেকে ধানমণ্ডি–সম্পাদনায় : মোহাম্মদ শাহজাহান, পৃঃ ৬৭–৬৮।

১৪. Who Killed Mujib, Ibid, Page 8।

১৫. লেখকের সঙ্গে কথোপকথন।

১৬. রক্ষীবাহিনীর প্রাক্তন সিগন্যালম্যান সুকুমার বিশ্বাসের সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারের সময় অধ্যাপক সুজিত চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

১৭. ড. মিজানুল হক কর্তৃক বর্ণিত এই তথ্য।

১৮. কর্নেল ফারুকের সাক্ষাৎকার, ঐ।

১৯. ঐদিন পরিকল্পিতভাবে সেকেন্ড ফিল্ড রেজিমেন্টের উপর বঙ্গবন্ধুর বাড়ি পাহারার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল।

২০. ক্যাপটেন জাহাঙ্গীর প্রদত্ত তথ্য।

২১. কর্ণেল ফারুকের সাক্ষাৎকার, ঐ।

২২. সচিত্র সন্ধানী, ১৬ই আগস্ট, ১৯৮১।

২৩. কর্নেল ফারুকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ঐ।

২৪. কর্নেল (অব.) জামিলের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, রোববার ২৮শে জুন, ১৯৮১।

২৫. ঐ, এবং এর সঙ্গে Who Killed Mujib, Page 49 দ্রষ্টব্য।

২৬. ব্রিগেডিয়ার (অব.) রউফের সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট দেখুন।

২৭. ঐ।

২৮. ফারুকের সাথে সাক্ষাৎকার, ঐ।

২৯. Who Killed Mujib Ibid, Page 38.

৩০. ঐ।

৩১. ঐ।

৩২. মৌলভী শেখ আব্দুল হালিমের সাক্ষাৎকার। বাংলার বাণী, আগস্ট, '৮৩।

৩৩. ITV ইন্টারভিউ এবং একই সঙ্গে এ্যান্থনী মাসকারেনহাসের 'বাংলাদেশ : এ লিগেসী অব ব্লাড' দ্রষ্টব্য।

৩৪. গণবাহিনীর সদস্যদের সাংবাদিক সম্মেলন, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

## নবম অধ্যায়
## রক্তমাখা বুক জুড়ে স্বদেশের ছবি...

১. কর্নেল তাহের-এর জবানবন্দী দ্রষ্টব্য।

২. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ওসমান, ক্যাপটেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং খালেদ মোশাররফ এ. ডি. সি–এর সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার। তিনি ১৫ই আগস্টে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ছিলেন।

৩. বেগম জোহরা তাজউদ্দিনের সাক্ষাৎকার।

৪. কর্নেল শাফায়াত জামিলের সঙ্গে আলাপচারিতা, পরিশিষ্ট দেখুন।

৫. সেদিন সমগ্র রাত মার্কিন দূতাবাস সতর্ক অবস্থায় ছিল তার প্রমাণ বিদ্যমান।

৬. মধ্যরাতের হত্যাকাণ্ড, সাঈদ তারেক পৃঃ ৫৯।

৭. Who Killed Mujib, Ibid, Page 21.

৮. The Washi;ton post, Date 16.8.75 & 23. 8. 75. পরিশিষ্ট দেখুন।

৯. The New York Time, Date 25.8.75.

১০. কর্নেল (অব.) তাহেরের জবানবন্দী, দ্রষ্টব্য।

১১. Who Killed Mujib, দ্রষ্টব্য।

**প্রসংগত আরো কিছু তথ্য**

১. এ্যন্থনী মাসকারেনহাস : বাংলাদেশ : এ লিগেসি অব ব্লাড, বইটি দ্রষ্টব্য।

২. ঐ দ্রষ্টব্য।

৩. ঐ।

৪. ঐ।

৫. ঐ।

৬. লরেন্স লিফশুলজ : বাংলাদেশ : দি আনফিনিশড রেভ্যুলেশন, বইটি প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৭. ঐ।

৮. ঐ।

৯. ঐ।

১০. এ্যন্থনি মাসকারেনহাস, ঐ দ্রষ্টব্য।

১১. লে. কর্নেল ফারুক রহমানের সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য।

১২. এ্যন্থনি মাসকারেনহাস, ঐ দ্রষ্টব্য।

১৩. ঐ।

১৪. ঐ।

১৫. দৈনিক দেশ পত্রিকায় জানুয়ারি মাসে ১৯৮৬ দ্রষ্টব্য।

১৬. লরেন্স লিফশুলজ, ঐ দ্রষ্টব্য।

১৭. এশিয়া উইক, ১৩ই মার্চ ১৯৮৬ সন দ্রষ্টব্য।

১৮. লরেন্স লিফশুলজ, ঐ দ্রষ্টব্য।

১৯. ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর কথিত তথ্য।

২০. লরেন্স লিফশুলজ, ঐ দ্রষ্টব্য।

২১. এ্যান্থনী মাসকারেনহাস, ঐ দ্রষ্টব্য।

২২. মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর– শামছুল হুদা চৌধুরী পৃঃ ২৬১–১৬২।

২৩. তদানীন্তন মন্ত্রী সোহরাব হোসেনের সাক্ষাৎকার, মেঘনা ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫
পৃঃ ২৬।

২৪. ঐ ২৭–২৮।

২৫. ঐ ২৭।

২৬. লেখকের সঙ্গে বাকশাল চেয়ারম্যান জনাব মহিউদ্দিন আহমদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

২৭. অধ্যাপক ইউসুফ আলীর সাক্ষাৎকার—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২৮. ১৯৮৫ সনের ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম এ তথ্য প্রদান করেন।

## দশম অধ্যায়
## প্রসংগত আরো কিছু তথ্য

১. এ্যন্থনী মাসকারেনহাস : বাংলাদেশ : এ লিগেসী অব ব্লাড, বইটি দ্রষ্টব্য
২. ঐ দ্রষ্টব্য
৩. ঐ দ্রষ্টব্য
৪. ঐ
৫. ঐ
৬. লরেন্স লিসুলজ : বাংলাদেশ : দি আনফিনিশড রেভ্যুলেশন, বইটি এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য
৭. ঐ
৮. ঐ
৯. ঐ
১০. এ্যন্থনী মাসকারেনহাস, ঐ দ্রষ্টব্য
১১. লে. কর্নেল ফারুক রহমানের সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য
১২. এ্যন্তনী মাসকারেনহাস, ঐ দ্রষ্টব্য
১৩. ঐ
১৪. ঐ
১৫. দৈনিক দেশ, পত্রিকায় জানুয়ারি ১৯৮৬ সালে প্রদত্ত খন্দকার মোশতাকের সাক্ষাৎকারটি দ্রষ্টব্য
১৬. এশিয়া উইক, ১৩ই মার্চ ১৯৮৬ সন দ্রষ্টব্য
১৭. ঐ
১৮. লরেন্স লিফস্যুলজ, ঐ দ্রষ্টব্য
১৯. ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর কথিত তথ্য
২০. লরেন্স লিফসুলজ, ঐ দ্রষ্টব্য
২১. এ্যন্থনী মাসকারেনহাস, ঐ দ্রষ্টব্য
২২. মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর-শামছুল হুদা চৌধুরী পৃ. ২৬১-২৬২
২৩. তদানীন্তন মন্ত্রী সোহরাব হোসেনের সাক্ষাৎকার, মেঘনা ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ পৃ. ২৬
২৪. ঐ ২৭-২৮
২৫ ঐ ২৭
২৬. লেখকের সঙ্গে বাকশাল চেয়ারম্যান জনাব মহিউদ্দিন আহমদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার
২৭. অধ্যাপক ইউসুফ আলীর সাক্ষাৎকার-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য
২৮. ১৯৮৫ সনের ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম এ তথ্য প্রদান করেন

## একাদশ অধ্যায়
## চক্রান্তের আর্বতে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়


১. জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ রহিতকরণ বিল দ্রষ্টব্য

২. বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড : বিচারের প্রেক্ষিতে ও ঐতিহাসিক রায় : অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

৩. বঙ্গবন্ধু হত্যা বিচারের রায় দ্রষ্টব্য

৪. দৈনিক সমকাল ১৬ মার্চ, ২০০৭

৫. দৈনিক ইনকিলাব ১৬ মার্চ, ২০০৭